পরিবর্তন

৯ – ১৫ মার্চ ১৯৮৮



রাজীবের তিন বছর

রেড ক্রসে সেবা ও
দুর্নীতির সহাবস্থান

দূরদর্শন দূরত্ব বাড়াচ্ছে

দেবদাসীঃ রতিরঙ্গবিলাসিনী



পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ও স্ক্যান ঃ স্নেহময় বিশ্বাস

এডিট ঃ স্নেহময় বিশ্বাস

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com

জীবন অক্ষয়



বয়োজ্যেষ্ঠ নাগরিকদের জন্য স্বতপ্রবৃত্ত পেনসন প্রকল্প

হালে এল আই সি প্রস্তুত ক'রেছে জীবন ধারা—যুবা আর মধ্যবয়স্ক ব্যক্তিরা নির্দ্দিষ্ট সময়ের ওপরেও যাতে তাঁদের অবসরপ্রাপ্ত জীবনের আয় বাড়িয়ে তুলতে পারেন সেইরকম একটি পেনসন প্রকল্প। এবার এল আই সি প্রস্তুত ক'রছে জীবন অক্ষয় ৫০ বছর এবং তার বেশী বয়স্ক ব্যক্তির জন্য।

যাঁরা চাকুরিজীবি, চাষী আর শ্রমিক কিংবা ডাক্তারী, ইঞ্জিনীয়ারিং, শিল্প, ব্যবসা অথবা বাণিজ্য এই সমস্ত পেশায় আছেন

জীবন অক্ষয়

তাঁদের জন্য উপযুক্ত।

সক্রিয় কর্মজীবন থেকে অবসর নেওয়ার পর প্রত্যেকের-ই প্রয়োজন আর্থিক অবলম্বন বিশেষত উন্নত দীর্ঘ আয়ুর জন্য। **জীবন অক্ষয়** একক পেমেন্ট দ্বারা কেনা যায় এমন একটি বাৎসরিক আয় (এ্যানুয়িটি) যেটা থেকে পুরোপুরি সমস্ত প্রয়োজন মেটানো যায়। আকর্ষণীয় নিরাপদ আর নিয়মিত আয়ের জন্য অবসর গ্রহণের সুবিধেগুলো যেমন প্রভিডেন্ট ফাণ্ড আর গ্র্যাচুয়িটি, জীবন বীমা পলিসির ম্যাচিওরিটি প্রসীড **জীবন অক্ষয়**-তে আদর্শমূলক বিনিয়োগ করা যায়।

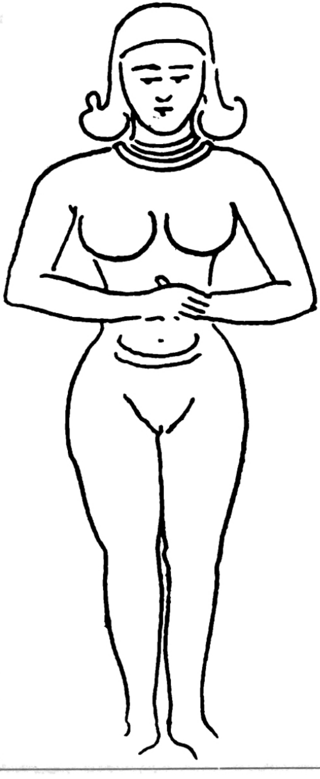
১০,০০০ টাকার একক প্রিমিয়াম থেকে মাসিক পেনসন ১০০ টাকা আয় করা যায়। এছাড়াও, পেনসন পাওয়া ব্যক্তির মৃত্যু ঘ'টলে জি আই এস (গ্রস ইনসিওরেন্স সাম) তার সঙ্গে সর্বশেষ জীবন অক্ষয় বোনাস নমিনিকে দেওয়া হবে।

বুড়ো বয়সটা যাতে আনন্দে আর নির্ঝঞ্ঝাটে কাটে তার জন্যই এই জীবন অক্ষয় প্রকল্প বিস্তারিত বিবরণের জন্য নিকটস্থ এল আই সি-র শাখা অফিস অথবা এজেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

লাইফ ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া

এল আই সি—জনগণের সেবায়

EP/LIC-90/88 BEN



পরিবর্তন

৯ – ১৫ মার্চ ১৯৮৮ বর্ষ ১০, সংখ্যা ১৭

প্রতি সংখ্যা ৪.৫০ টাকা

বিমান মাসুল : পূর্বাঞ্চলে ২০ পয়সা, ভারতের অন্যত্র ২৫ পয়সা

এই সংখ্যায়

প্রচ্ছদ : গৌতম দাশগুপ্ত

সম্পাদক : অশোক চৌধুরী

প্রচলিত রীতিকে বয়কট করতে চাই

দূরদর্শনের অন্যান্য প্রসংগ বাদ দিয়ে শুধু স্বশাসিত করা যায় কিনা এই নিয়ে যুক্তি তর্ক। যে কারণে এই প্রসংগের জন্ম সেই বিষয়ে সকলে নিশ্চয় অবগত আছেন। সত্যিই কি এর মাধ্যমে রাজ্যের কৃষ্টি, সংহতি, ঐতিহ্য রক্ষা হচ্ছে? নাকি তাকে জিইয়ে রেখে রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ব হচ্ছে। মনে হয়, এমন নগ্নভাবে সরাসরি দূরদর্শন মারফৎ রাজনৈতিক তথা দলীয় ইস্তাহার প্রচার না করা হলে এমন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হত না। এবং ঐ উদ্দেশ্যটিকে বজায় রাখার জন্য ভার্গিজ কমিশন ও আই জে এ-র রায়কে অবৈধভাবে উপেক্ষা করে স্বশাসিত প্রস্তাব বানচাল করা হয়। উপেক্ষা দিয়েই প্রমাণ হয়, এই সম্পত্তি যাদের হাতে ন্যস্ত এটি তাদের ইচ্ছাধীন যন্ত্রমাত্র। সদ্য প্রমাণ মেলে – দ্বিতীয় চ্যানেল উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সাত্তার ও পাঁজা বাবুর ভাষণে, তারা ক্ষমতা প্রয়োগ করে সম্পত্তি ভোগের নিদর্শন স্বরূপ স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বিনোদনের আখড়ায় বিরোধী কথাবার্তা বলে বিস্ময় সৃষ্টি করেছেন। ঠিক ঐ দিনেই ঐ কথাগুলি না বললে বোধহয় নিয়মভংগ হত! এমত অবস্থায় অযোগ্যতার খাতিরে অবশ্যই নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়া উচিত। এমনকি এর কর্ণধার তথ্যবাবু নিজেও জানেন না যার উদ্বোধন করতে গেছেন তার টার্গেট অডিয়েন্স কতটা। ক্ষমতা রাখতে লোক হাসানো মিথ্যে ধোঁয়া তুললেন।

এটা ঠিক যে আমরা ধার করা সভ্যতায় পুষ্ট। তবে দূরদর্শন নিয়ে এটা কি ভাবতে পারি না যে, পৃথিবীর কোথাও এমন কুরুচিপূর্ণ রাজনৈতিক ফয়দা তোলা হয় না। ব্যতিক্রম বি বি সি। সেখানে বিরোধী পক্ষ ও সরকার পক্ষ সমানভাবে বক্তব্য রাখতে পারে। তবে আমরা কোনটা অনুসরণ করব? যেটা জন্মলগ্ন থেকে পেয়ে চলেছি, সেটা নিশ্চয়ই নয়। আবার নিশ্চিন্ত হয়েই বা কি করে বলব যে রাজ্য সরকার? তারাও তো রাজনৈতিক দল। তবুও প্রচলিতরীতিকে বয়কট করতে চাই বলেই স্বশাসিত চাওয়া, এবং উপরোক্ত প্রসংগগুলি ব্যতিরেকেই। আর বিভিন্ন রাজ্যের ঐতিহ্যময় সংস্কৃতি রক্ষা, লালন এবং বিকাশের কাজ রাজ্যসরকারের পক্ষেই পালন সম্ভব। এবং দেশজুড়ে সেখানে বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রবণতা সেখানে জাতীয় সংহতি রক্ষার স্বার্থেও কেন্দ্রের উচিত রাজ্যের হাতে দ্বিতীয় চ্যানেলকে অর্পণ করা। শেষ কথা অনুষ্ঠানগুলি যাতে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রচার হয় সেইজন্য অবশ্যই কর্তৃপক্ষকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। দূরদর্শন সুস্থ সংস্কৃতির প্রচারের বাহক এই সত্যটি যেন বজায় থাকে।

শ্যামল দত্ত
কলকাতা-৭৬

যমদূত শব্দ

প্রাচীনকালের আর্য ঋষিরা কোলাহল থেকে বহুদূরে শান্ত সমাহিত পরিবেশে অবস্থান করেও তাঁরা সেদিন শব্দকে ব্রহ্ম রূপে কল্পনা করেছিলেন। আজ যদি সেইসব আর্য ঋষিরা আমাদের খণ্ডিত বংগের নয়নমণি কলকাতায় একটি দিনের জন্য অবস্থান করেন, তবে তাঁরা সেই পাঁচ হাজার বছরের প্রাচীন ধারণাকে মুহূর্তের মধ্যে পরিত্যাগ করে যন্ত্রণাকাতর কণ্ঠে ঘোষণা করতেন – শব্দই হচ্ছে সাক্ষাৎ যমদূত। জোব চার্নকের এই কলকাতা শহরে কিছু বছর আগে পর্যন্তও হাসপাতালের সামনে হর্ন বাজান নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু বর্তমানে হাসপাতালের সামনে শুধু হর্ন নয়, উন্মত্ত স্বরে এয়ার হর্ন বাজান হয় এবং তাতে যদি হাসপাতালের শয্যায় শায়িত কোন মুমূর্ষু রোগীর জীবন বিপন্ন হয়, তবুও এই সভ্য শহরের কাণ্ডজ্ঞান ফিরে আসবে না। ইদানীং পরিবেশ দূষণের পাশে শব্দদূষণ কথাটাও বেশ মুখরোচক হয়ে উঠলেও এই শব্দদূষণ বন্ধ করার ব্যাপারে সরকার তেমন কোন পদক্ষেপ নিয়েছেন বলে জানা নেই। আর পদক্ষেপ নেবেনই বা কেন, এতে তো আর মহামারি ঘটে না, মানুষ তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়। শ্রবণশক্তি হারায়। আর ব্যাপারটা যখন তিলে তিলেই ঘটে থাকে, তখন সরকারের আর উৎসাহী হয়ে লাভ কি? কারণ এর জন্য তো আর কেন্দ্রের কাছে কয়েক কোটি টাকা দাবী করা যাবে না।

রতন চক্রবর্তী
হাবড়া, ২৪ পরগনা

কেন্দ্র-রাজ্যের সমান অধিকার থাকুক

দূরদর্শন চালু হওয়ার পূর্বে থেকেই আমরা দেখে আসছি, বেতারকে কেন্দ্রীয় সরকার তাঁর নানা গুণকীর্তনে আর বিরোধীদের মুণ্ডপাত করতে ব্যবহার করে আসছেন। দূরদর্শন চালু হওয়ার পর তা আরও নগ্নভাবে প্রকাশ হয়ে পড়ে। বিশেষত বিরোধী দল শাসিত রাজ্যগুলোতে তা ব্যাপকভাবে প্রকটিত হয়।

কিন্তু একটা সরকারের ব্যর্থতা যেমন আছে, তেমন তার সাফল্যও আছে নিশ্চয়ই। অথচ আমরা বেতার ও দূরদর্শনে বামফ্রন্টের ব্যর্থতার কথাই ক্রমাগত শুনে ও দেখে আসছি। কিন্তু সামান্যতম সাফল্যের কথাও প্রচারিত হয়নি। আর সংবাদ পরিবেশন ও 'সমীক্ষা' (বেতার) ইত্যাদিতে নিরপেক্ষতার কোন বালাই নেই। এমতাবস্থায় রাজ্যসরকার যদি দ্বিতীয় চ্যানেলের দাবি করেন, তা এক কথায় নস্যাৎ করা যায় না।

তবে, যদি তাঁরা তা পেতেন, তাহলেও নিরপেক্ষতা নিয়ে নিশ্চিত হওয়া যেত না। কেন না এতদিনে আমরা একটা কথা জেনে গেছি, 'যে যায় লংকায়, সেই হয় রাবণ'।

এক্ষেত্রে স্বশাসনের প্রশ্ন উঠেছে। কিন্তু তাতেও নিশ্চিত হওয়া যায় না। কারণ স্বাধীনতার চল্লিশ বছর পরেও যে দেশে বিচ্ছিন্নতাবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা ক্রমশ মাথা চাড়া দিচ্ছে, সেখানে বেতার ও দূরদর্শন স্বশাসিত হলে তার আরও বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

তাই বেতার ও দূরদর্শন স্বশাসিত না হলেও চলবে তবে এক্ষেত্রে সরকারকে এই 'গণমাধ্যম'-গুলোকে প্রকৃত অর্থেই গণ-মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করতে হবে এবং তার পরিচালনায় কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার উভয়েরই সমানাধিকার থাকতে হবে, তা যে দলের শাসনই হোক না কেন।

অশোককুমার ভৌমিক
বেহালা, কলকাতা-৬০

সত্যপ্রকাশের জন্যই স্বশাসিত হোক

বেতার ও দূরদর্শন কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকবে না স্বশাসিত হবে এ নিয়ে বিতর্ক থেমে নেই, ভবিষ্যতেও থামবে না। দূরদর্শন ও বেতার কেন্দ্র প্রচারের একটা মস্তবড় হাতিয়ার। সুতরাং রাজ্যই বা সে সুযোগ থেকে বাদ যায় কেন। তারাও দাবি তুলল দ্বিতীয় চ্যানেল তাদের হাতে তুলে দিতে হবে। যে যতই বলুক যে, জনগণের মনোরঞ্জনের দিকে তাকিয়ে অনুষ্ঠানসূচী নির্ধারণ করা হবে, তা কিন্তু আদপে সম্ভব নয়। অন্তত রাজনীতিবিদদের পক্ষে প্রচার ছাড়া একমুহূর্ত থেমে থাকা সম্ভব নয়।

প্রতিদিনই বেতার ও দূরদর্শনে নির্লজ্জের মত চলে কেন্দ্রের প্রচার। এবং রাজ্য সরকার দ্বিতীয় চ্যানেলটি হাতে পেলেও ঐ একই কর্ম করবে। তার প্রমাণ তাদের প্রকাশিত সংবাদপত্র। যেখানে সর্বদাই দেখান হয় যে সবই আমাদের ভাল। সুতরাং সরকারের যে কোনও রকম দোষত্রুটি দেখতে আমাদের তাকিয়ে থাকতে হয় নিরপেক্ষ সংবাদপত্রের দিকে। যদিও তারাও পক্ষপাত দোষে দুষ্ট।

বর্তমানে অবশ্য সি পি আই (এম)-এর রাজ্য সম্পাদক সরোজ মুখার্জি নির্দেশ দিয়েছেন যে, কোন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে কি তার দপ্তর সম্পর্কে তথ্য প্রমাণ সহযোগে জনসাধারণ অভিযোগ জানালে দলীয় মুখপত্র 'গণশক্তি' তা প্রকাশ করবে। ওভাবে খোলা চিঠিতেই মন্ত্রীকে দিতে হবে অভিযোগের উত্তর। ঠিক এরকম দিল্লি দূরদর্শন 'জনবাণী' শীর্ষক অনুষ্ঠানে বিভিন্ন মন্ত্রীকে জনসাধারণের প্রশ্নের সামনে হাজির করতেন। কিন্তু পুরো ক্ষমতাই ছিল তাদের কুক্ষিগত অর্থাৎ কোন চিঠি ছাপা হবে সংবাদপত্রে এবং কোন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হবে 'জনবাণীতে'।

সুতরাং যে চিঠি ও প্রশ্ন সরকারকে বিব্রত করতে পারে তা কখনই প্রকাশিত হবে না। এগুলো অবশ্য নিরপেক্ষ সাজার চেষ্টা মাত্র, কারণ আমরা জানি জনগণের অভিযোগ কখনও সঠিকভাবে প্রকাশিত হয় না।

সুতরাং বেতার ও দূরদর্শন স্বশাসিত হোক। যাতে কর্তৃপক্ষ বুক ফুলিয়ে সত্যটা প্রকাশ করতে পারেন, সেটা রাজ্য অথবা কেন্দ্র যার বিরুদ্ধেই হোক। তাহলে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ কেউই তুলতে পারবেন না। যদি মনে হয় স্বশাসিত হওয়ার পর বেতার ও দূরদর্শন উগ্রসাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দিচ্ছে অথবা জনগণকে অশিক্ষার আঁধারে আরও বেশি করে নিমজ্জিত করছে, তাহলে তো কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে আইন আছেই আবার তা সরকারি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসার। নতুবা স্বশাসিতকেন্দ্রের কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে চলার জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা থাকবেন যারা দেখবেন ক্ষতিকারক কিছু প্রচারিত হচ্ছে কিনা। অবশ্য কোনটা ক্ষতি আর কোনটা লাভ সেটা সম্পূর্ণ আপেক্ষিক ব্যাপার।

অমল চক্রবর্তী
চুঁচুড়া, হুগলী

প্রসঙ্গ ত্রিপুরা

৩০ ডিসেম্বর ১৯৮৭ – ৫ জানুয়ারি ১৯৮৮ সংখ্যাতে 'প্রচ্ছদ কাহিনী' 'ত্রিপুরায় ভোটের হাওয়া, প্রচারে সবাইকে টেক্কা দিয়েছে বামফ্রন্ট' শীর্ষক সংবাদে 'সি পি এমের অন্তর্দ্বন্দ্ব', 'শরিকী অন্তর্দ্বন্দ্ব', এবং 'কর্মচারী বনাম নৃপেনবাবু' পড়ে অজানা অনেক কিছু জানতে পারলাম। ত্রিপুরার বাসিন্দা হয়েও এতদিন ধরে এইগুলি জানতাম না। এই প্রতিবেদনের জন্য পত্রিকার সংবাদ প্রতিনিধিকে জানাই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

স্বপনকুমার শূর
গ্রাম ও পোঃ অরুন্ধতীনগর-৬
আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা

কেন্দ্রের খুঁত ধরে লাভ কী ?

কলকাতার দ্বিতীয় চ্যানেল চালু হওয়ায় রাজ্য সরকার ও কেন্দ্র সরকারের মধ্যে পরিচালনক্ষমতা বণ্টন নিয়ে মত বিরোধ হয়েছে। শুরু হয়েছে একে অপরের সমালোচনা। আর তাতেই ভাগ বসিয়েছেন আমার মত অনেকেই। রাজ্যের হাতে ক্ষমতা না দেওয়ায় পক্ষপাতিত্বের যে অভিযোগ আজ কেন্দ্রের দিকে নিক্ষিপ্ত তা সমর্থন যোগ্য না হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। কারণ রাজ্যের হাতে ক্ষমতা থাকলে সে অভিযোগ কেন্দ্রও তুলতে পারে। রাজ্য সরকারকে একেবারে ধোয়া তুলসিপাতা ভাবাও যে অসম্ভব। তাছাড়া নিরপেক্ষতার প্রতীক সংবাদপত্রকেই বা কজন নিরপেক্ষ বলে ভাবতে পারেন? তাই ক্ষমতা যার কাছে, পরিচালন কমিটি যে তার প্রতিনিধি বলে সমালোচিত, সাদা বাংলায় তাকে দালাল বলা হবে, তাতে আর সন্দেহ কি? এ তো রাজনীতির পুরনো চাল!

তাছাড়া দর্শক শ্রোতাদের ভিন্ন ভিন্ন রুচিতে অভিযোগ উঠেছে বিভিন্ন দিক থেকে। যেমন অনেকেই অনেক অনুষ্ঠানকে শ্লীল-অশ্লীলের দাঁড়িপাল্লায় তুলে মুখিয়ে থাকা রাজনৈতিক নেতাদের জাবর কাটার সুযোগ দেন। অথচ শ্লীল-অশ্লীল তো সম্পূর্ণ নিজের রুচির উপর। সেখানে কেন্দ্রসরকারের পরিচালনার খুঁত ধরে লাভ কী?

উদয়শংকর কুণ্ডু
জলপাইগুড়ি

প্রথাবহির্ভূত শিক্ষার গুরুত্ব

প্রথাবহির্ভূত শিক্ষা অনেকের চোখে অবহেলার বা অবজ্ঞার হলেও এটি কিন্তু একটি মহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প। এই শিক্ষার উদ্দেশ্য হল বঞ্চিত অবহেলিত অপাংক্তেয় ও দরিদ্র্যের ৯ থেকে ১৪ বছর বয়স্ক বালক বালিকাদের বিশেষ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষা দিয়ে জীবনমুখী করে তোলা এবং সমাজ সচেতনতা বোধে উদ্বুদ্ধ করা। এইসব বালক বালিকারা যাতে আত্ম নির্ভরশীল হতে পারে সেই জন্যেই এই শিক্ষার আবির্ভাব। প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন করে তোলাও এই শিক্ষার অন্যতম মূল লক্ষ্য। সারা ভারতবর্ষে কয়েক লক্ষ প্রথাবহির্ভূত শিক্ষাকেন্দ্র রয়েছে। এখানকার পড়ুয়াদের মধ্যে বালক ছাড়া বালিকাদের জন্য স্বতন্ত্র কেন্দ্রের ব্যবস্থা থাকায় গ্রামের দরিদ্র তথা লাজুক প্রকৃতির মেয়েরা লেখাপড়ার একটা বাড়তি সুযোগ পায়। যেসব মেয়েরা আদৌ স্কুলে যায়নি বা যেতে যেতে পথিমধ্যে পড়াশুনা বন্ধ করে দিয়ে কিছুটা বয়স হওয়ার পর পরের বাড়িতে 'ঝি'-এর কাজে বাসন মাজতে বাধ্য হয় তারা যদি ঐ অবস্থায় নতুন উদ্যমে পুনরায় শিক্ষা লাভ করতে ইচ্ছুক হয় তাহলে এই ধরনের শিক্ষা কেন্দ্রে নিঃসংকোচে পড়াশুনা করতে পারে। কেন না এই সময়ে ওরা প্রাথমিক স্কুলে যেতে দ্বিধা করলে বা অনুপযুক্ত হলেও অন্তত বাস্তব জ্ঞান আহরণের জন্য এইসব শিক্ষাকেন্দ্রে আসতে পারে। অতএব একথা স্বীকার করতেই হবে যে প্রথা-বহির্ভূত শিক্ষা গ্রাম ও শহরের প্রতিক্রিয়াশীল মেয়েদের শিক্ষাদানের বিশেষ সহায়ক।

অনেকের ধারণা গ্রামের ন্যায় শহরেই শিক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা বেশি হওয়া উচিত নয়। তাঁরা মনে করেন শহরের মানুষ সবাই শিক্ষিত। সেখানে এই শিক্ষাকেন্দ্রের কোন আবশ্যকতা নেই।

এই ধরনের চিন্তাধারা একেবারেই ভুল। কেন না শহরাঞ্চলে অগণিত ছেলেমেয়ে আছে যারা অশিক্ষিত, কলকারখানায় শ্রমিকের কাজ করে, চায়ের দোকানে কাপপ্লেট ধোয়, হোটেলের বয় হিসেবে খদ্দেরের সামনে খাবার এগিয়ে দেয়, মেয়েরা বাবুদের ঘর মোছে। এইসব অশিক্ষিত দরিদ্র ছেলেমেয়েদের জন্যই তো একদিন প্রথাবহির্ভূত শিক্ষার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। সারাদিন পরের কাজে লিপ্ত থাকার পর মনিবপক্ষ থেকে ২ ঘন্টার জন্যে এদেরকে ছুটি দেওয়া উচিত শিক্ষাকেন্দ্রে উপস্থিতির জন্য।

তাহলে প্রতিদিন একটু একটু অধ্যায়নে এরা যোগ বিয়োগ গুন ভাগ শিখে নিতে পারে। তারপর জ্যামিতির প্রাথমিক স্তর ত্রিভুজ, চতুর্ভূজ বর্গক্ষেত্র আয়তক্ষেত্র সম্বন্ধে জানতে পারে, গ সা গু ল সা গু, শতকরা, সুদ, লাভ-লোকসান প্রভৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতে পারে (সিলেবাস)। মাতৃভাষাতে অক্ষর জ্ঞানের পর পরই প্রিয়জনের কাছে চিঠি লিখতে পারে। সমাজ সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা আসে। নিজের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে পুরো সচেতন হতে শেখে। অবশেষে এই শিক্ষাকেন্দ্রের পড়ুয়ারা তাদের প্রকট মূর্খতাকে ঝেড়েমুছে সব দিক থেকে অনেকটা স্বাবলম্বী হতে পারে।

আমজাদ আলি হালসিনা
হাটখোলা, নদীয়া

দুই মহিলা পুলিশ পরস্পরকে 'বিয়ে' করে চাকরি খোয়াল

নয়া দিল্লি থেকে সুদীপ মজুমদার

বিশাল মধ্যপ্রদেশের বিদিশা জেলার ছোট্ট গ্রাম মন্ডি বামোরা। শহর নয়, শিক্ষিত আধুনিক সমাজের ঔদ্ধত্য এখানকার বাসিন্দাদের নেই। কিন্তু এই গ্রাম থেকেই তথাকথিত সভ্য সমাজের প্রতি এক চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে দুই যুবতী। সভ্যতা আর সংস্কৃতির নামে আমাদের পুরুষ-প্রধান সমাজ নারীকে শুধু অত্যাচারই করে না তাকে মানুষ হিসাবে গণ্য করতেও দ্বিধা বোধ করে। আর সমাজের তথাকথিত কর্তারা নৈতিকতার বুলি কপচিয়ে মেয়েদের প্রতি অত্যাচারের আর অবমাননাকেই প্রশ্রয় দিয়ে যায়। আর এতে সরকার ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলো হয় সক্রিয়। তারা পরোক্ষভাবে সমর্থনও যুগিয়ে যায়।

উর্মিলা আর লীলার জীবন আর তাদের সোচ্চার প্রতিবাদ একথাই পরিষ্কার প্রমাণ করে দেয়। দুজনেই মধ্যপ্রদেশ পুলিশের তেইশ নম্বর স্পেশাল আর্মড ব্যাটালিয়ানে গত বছর চাকরি পায়। কনস্টেবল হিসাবে। আর কিছুদিন আগে পুলিশের বড়কর্তারা দুজনকেই চাকরি থেকে বরখাস্ত করে দেয়। ওদের অপরাধ : একে অন্যকে গভীরভাবে ভালবাসা যা তারা জীবনে কোনওদিনই পায়নি এবং মৃত্যু-পর্যন্ত একে অন্যকে ভরসা জোগাতে ওদের সম্বন্ধ পাকা করার জন্য 'বিয়ে' করা। প্রশাসন ও পুলিশ মহলে হৈ হৈ পড়ে যায়। এ কী করে সম্ভব ? দুজন মহিলার মধ্যে কি আবার 'বিয়ে' হতে পারে ? কী অনাচার ? অন্যান্যদের উপর কী প্রভাব পড়বে ? তাই তাড়াতাড়ি ওদের বরখাস্তই শুধু করা হল না, মাঝরাতে জোর করে অন্যান্য পুরুষ কনস্টেবলদের সাহায্যে ভূপাল স্টেশন থেকে একটা ট্রেনে তুলে দেওয়া হয় আর শাসান হয়, 'খবরদার, ফিরে আসার চেষ্টা কোর না।'

পুরুষশাসিত সমাজ এছাড়া আর অন্য কোন ব্যবহার কি করতে পারে ? নির্মমতাই এদের বৈশিষ্ট্য। সবরকমের মানবিক গুণ ও ব্যবহারকে পুরুষদের চোখ দিয়ে দেখতে হবে, তা না হলে সমাজের লাঞ্ছনা সহ্য করতে হবে। উর্মিলার বয়স বাইশের কাছাকাছি। ছোটবেলায় তিন বছরেই ওর বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়। একটু বড় হয়ে যখন ও বুঝতে পারে কী হয়েছে তখন থেকেই প্রতিবাদ করার চেষ্টা করে। কিন্তু একে মহিলা তার ওপর এক জঘন্য, নির্মম সমাজ। কোথাও থেকে একটু সমবেদনা পায়না। ওই পুরুষটিকে স্বামী হিসাবে স্বীকার করতে সে রাজী নয়। তাই তার ওপর পড়ল গোটা সমাজ এমনকি আত্মীয়-স্বজনেরও রোষ। কিন্তু উর্মিলা তা সত্ত্বেও ওই অন্যায়কে মেনে নিতে রাজী নয়।

বাড়ি থেকে তাকে বের করে দেওয়া হয়। এখানে-সেখানে সে কোনও মতে মাথা গোঁজার চেষ্টা করে। শেষ পর্যন্ত মধ্যপ্রদেশ পুলিশে একটা চাকরি পায়। লীলার জীবনও মর্মান্তিক। বিয়ে হয়েছিল তার। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যে স্বামী এক দুর্ঘটনায় মারা যায়। আমাদের সমাজ নারীর ওপর অত্যাচার তো করেই। কিন্তু আরও বেশি নির্মম বিধবাদের ওপর। বাঙালিদের মধ্যে তো বিধবাদের আরও লাঞ্ছনা। যারাই বৃন্দাবন আর কাশীর অলিগলিতে নারকীয় জীবন যাপন করতে দেখেছেন বাঙালি বিধবাদের তাদের আর বোঝানর দরকার নেই। বিধবাদের প্রতি সব সম্প্রদায়েরই তাচ্ছিল্য নিদারুণ। লীলার ওপরেও সেই কষ্টকর জীবনের ছায়া নেমে আসে। কিন্তু সরল, হাসিখুশি লীলা চায় জীবনটা যাতে নষ্ট না হয়ে যায়। তাই নিজের প্রচেষ্টাতেই খোঁজখবর নিয়ে শেষ পর্যন্ত মধ্যপ্রদেশ পুলিশে চাকরি পায়।

এখানেই উর্মিলা আর লীলার পরিচয়। আর পরিচয় থেকেই বন্ধুত্ব। হঠাৎ যেন দুই হারিয়ে যাওয়া কিশোরী অগাধ ভালবাসা আর সমবেদনার ভান্ডার খুঁজে পেয়েছে। প্রায় ৯০ জনের মত মহিলা রয়েছে তেইশ নম্বর ব্যাটালিয়নে। এদের অনেকেই প্রায়ই দেখতেন উর্মিলা আর লীলাকে, একসংগে ডিউটি হয়ে যাওয়ার পর দুজনে একান্তে বসে কথা বলত। দুজনেই কখনও অঝোরে কাঁদত। একে অন্যের গলা জড়িয়ে নিজেদের দুঃখের কথা বলে মনটাকে হাল্কা করার চেষ্টা করত। অন্যান্য মহিলা সহকর্মীরা এতে কোনওদিন কোনও অস্বাভাবিক কিছু দেখতে পায়নি। কিন্তু ওপরতলার পুরুষ কর্তারা উর্মিলা আর লীলার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বকে সহ্য করতে পারতেন না। পুরুষ কনস্টেবলরা তো ওদের দেখে নানারকম অশ্লীল ঠাট্টা আর মন্তব্য করতে থাকে। উর্মিলা আর লীলা ক্রমশ বেশি করে পুরুষ সহকর্মীদের রোষ আর অশ্লীলতার স্বীকার হতে থাকে। যে সমাজ তাদের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছিল সেই সমাজ এই দুই নারীর মধ্যেকার সহানুভূতি ও সমবেদনার সম্বন্ধকেও সহ্য করতে পারে না।

উর্মিলা আর লীলা কিন্তু মনে মনে স্থির করে ফেলেছে যে, যে শান্তি আর ভরসা একে অন্যের কাছ থেকে পেয়েছে তা কোনও মতেই হারাবে না। বরং একে সারা জীবনের সঞ্চয় হিসাবে রাখবে। ওরা ঠিক করল যে দুজনে কোনও মন্দিরে গিয়ে 'বিয়ে' করে নেবে আরও কজনকে সাক্ষী রেখে এবং বাকি জীবনটা দু'জনে একসংগে কাটাবে। ছুটি নিয়ে দু'জনে সাগর শহরে যায়। সেখানে এক মন্দিরে জনা-চল্লিশ অন্যান্য মানুষের উপস্থিতিতে উর্মিলা আর লীলা 'বিয়ে' করে। তারপর ওরা নিজেদের ছবিও তোলে। ভূপালে ফিরে এসে অন্যান্য সহকর্মীদেরও তারা ছবি দেখায়। কত সহজ, সরল তাদের ব্যবহার। মহিলা সহকর্মীরা ওদের অভিনন্দন জানায় এবং একটু ছোটখাট খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থাও করে। কিন্তু কথাটা যখন আই জি নরেন্দ্র ভিরমানির কানে গেল তিনি তো রেগে আগুন। সংগে সংগে ওদের ডেকে এনে ধমকান হল, তারপর সোজা বরখাস্ত। কারণ দেখাল ডিউটি থেকে বিনা আদেশে ছুটি নেওয়া। আসলে ওদের 'বিয়ে' করাটাই ভিরমানিসহ প্রশাসনের অন্যান্য সাহেবসুবোদের চোখে কটু লেগেছে। সেই রাতেই ওদের পাততাড়ি গুটোতে হল। কতকটা জোর করেই।

উর্মিলা আর লীলা কিন্তু ভেঙে পড়ার মত মেয়ে নয়। ওদের সাহস ও মানবিকতা অসামান্য এবং ভারতের নির্যাতিত নারীদের সামনে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আপাতত লীলা, উর্মিলার গ্রাম মন্ডি বামোরাতে ওদের বাড়িতে এসে রয়েছে। এবং সবচেয়ে আনন্দের ব্যাপার হল, উর্মিলার মা আর ভাই দুজনেই এই সাড়াজাগানো ঘটনায় কোনও অস্বাভাবিকতা দেখতে পাননি। বরং উর্মিলার মা কস্তুরী বাই বলেন, লীলা বড় দুখি মেয়ে। ওর চাই ভালবাসা আর সমবেদনা। আমাদের ঘরে সে তা পাবে। ওদিকে উর্মিলা আর লীলাও ঠিক করেছে যে ওরা ভূপালে ফিরে গিয়ে ওদের চাকরি-থেকে বরখাস্ত করার বিরুদ্ধে আপীল করবে। আস্তে আস্তে উর্মিলার গ্রামের অন্যান্য কয়েকজন পাড়াপ্রতিবেশীও ওদের সমর্থনে এগিয়ে এসেছে।

তাহলে নির্যাতিত ও লাঞ্ছিত নারী জাতির সামনে শুধু অন্ধকারই নেই। আশার আলো দেখিয়েছে উর্মিলা আর লীলা আর ওই গ্রামের মুষ্টিমেয় হলেও কিছু সাহসী মানুষ। সমাজের অন্যায় নিয়মকে না মানার সাহস তারা দেখিয়েছে। আমাদের দরকার সোচ্চার সমর্থন জানান আর কর্তৃপক্ষর উপর চাপ সৃষ্টি করে ওদের চাকরিতে আবার বহাল করান। উর্মিলা আর লীলা প্রেরণার উৎস। শুধু নারী জাতির কাছেই নয়। সমবেদনশীল পুরুষদের সামনেও। □

অনেক মন্ত্রী ভুলে যান, রাইটার্স বিল্ডিংস পার্টি অফিস নয়

নিশীথ দে

কংগ্রেস আমলে তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশংকর রায় বিধানসভা ভবনে মুখ্যমন্ত্রীর চেম্বারে কংগ্রেস দলের বৈঠক করেছিলেন। রাইটার্স বিল্ডিংসে কংগ্রেস দলের এম এল এ-দের দফায় দফায় বৈঠক করেছিলেন আস্থা ভোট নেবার জন্যে। কাজটা মোটেই ভাল করেননি। প্রচন্ড সমালোচনা হয়েছিল। সরকারি ভবনে পার্টির মিটিং করা নিঃসন্দেহে নিন্দনীয়।

আজকে কি সেই জিনিস বন্ধ হয়েছে? মোটেই না। যুক্তফ্রন্টের আমলেই এটা শুরু হয়েছিল। বিধানসভায় তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জি-কে অধিবেশন কক্ষে যাওয়ার পথে কো-অর্ডিনেশন কমিটির লোকেরা বাধা দিয়েছিলেন। পুলিশকে নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও কোন কাজ হয়নি। পুলিশ সেই নির্দেশ মানেনি। তখন পুলিশমন্ত্রী ছিলেন উপ-মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। জ্যোতিবাবুও বলেননি যে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ না মেনে পুলিশ অন্যায় করেছে।

যাই হোক, আজকের পরিস্থিতিটা আবার সেই জায়গায় যাচ্ছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনে বামফ্রন্টের শরিকদের মধ্যে ঐক্য হয়নি। ঐক্যের জন্য চেষ্টা চলছিল পঞ্চায়েত নির্বাচন ঘোষণার তিন মাস আগে থেকে। শরিকদলের নেতারা একসংগে জেলায় জেলায় ঘুরে বামফ্রন্টের সব দলের নেতা এবং কর্মীদের বৈঠক করেছেন।

এরপর আসন ভাগাভাগি নিয়ে জেলায় জেলায় অনেক বৈঠক হয়েছে। শেষ পর্যন্ত কোন জেলায় ঐক্য হয়নি। বামফ্রন্টের ঐক্য বজায় রাখার জন্য সি পি আই (এম)-এর রাজ্য কমিটির সম্পাদক সরোজ মুখার্জি ঘোষণা করেছিলেন, যে সব জেলায় বামফ্রন্টের শরিকদলের মধ্যে ঐক্য হবে না, জ্যোতিবাবু সেখানে যাবেন না। শেষ পর্যন্ত ঐক্য কোন জেলায় হয়নি। কিন্তু জ্যোতিবাবু সব জেলায় গিয়েছেন এবং চুটিয়ে বক্তৃতা করেছেন। জ্যোতিবাবুর বক্তৃতায় কংগ্রেসকে যত না আক্রমণ করেছেন, তার চেয়ে বেশি আক্রমণ করেছেন আর এস পি এবং ফরোয়ার্ড ব্লককে।



ফটো : সৌগত রায়বর্মন

কৃষিমন্ত্রী কমল গুহ

জ্যোতিবাবুর বক্তব্য হল, আর এস পি এবং ফরোয়ার্ড ব্লক বামফ্রন্টের নীতি মানেনি। ওই দুটি দল কংগ্রেসের সংগে আঁতাত করেছে। ওদের ভোট দেবেন না। একের পর এক জনসভায় জ্যোতিবাবু আর এস পি এবং ফরোয়ার্ড ব্লকের বিরুদ্ধে প্রচার চালিয়ে গেলেন।

প্রথমত, বামফ্রন্টের নীতিটা কী আর কোন শরিক দল সেই নীতি মেনে চলে? নীতি-নৈতিকতার কোন বালাই কি স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু এবং অন্য কয়েকজন মন্ত্রী রেখেছেন?

পঞ্চায়েত নির্বাচনের ব্যাপারে জনসভায় বক্তৃতা দেবার জন্য জ্যোতিবাবু একমাস ধরে জেলায় জেলায় ঘুরেছেন। সরকারি খরচে ঘুরেছেন। কখনও হেলিকপ্টারে, কখনও গাড়িতে। লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে সরকারি তহবিল থেকে।

বোধহয় কোন মন্ত্রী বাদ যাননি। সরকারি গাড়ি নিয়ে, সরকারি খরচে বিমানে পাড়ি দিয়ে, ট্রেনের প্রথম শ্রেণীতে দলবল নিয়ে পার্টির নির্বাচনী বক্তৃতা দিয়েছেন। এটা শুধু বামফ্রন্টের মন্ত্রীরা নয়, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরাও তাই করেন। সরকারি গাড়িতে রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের পার্টির লোক সমস্ত জেলা চষে বেড়িয়েছেন।

এবার বামফ্রন্টের কয়েকজন মন্ত্রী আর এক ধাপ এগিয়েছেন। এক মন্ত্রী আর এক মন্ত্রীর বিরুদ্ধে বলেছেন রাইটার্স বিল্ডিংসে নিজেদের ঘরে বসে। এক দলের মন্ত্রী আর এক দলের বিরুদ্ধে বলেছেন। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন। রাইটার্স বিল্ডিংস যে পার্টি অফিস নয়, এটা তাঁরা বোধ হয় ভুলে গিয়েছেন।

কৃষিমন্ত্রী কমল গুহ, সমবায় মন্ত্রী ভক্তিভূষণ মন্ডল, পূর্তমন্ত্রী যতীন চক্রবর্তী এবং সেচ মন্ত্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় রাইটার্স বিল্ডিংসে বসে সাংবাদিকদের কাছে তাঁদের বক্তব্য তুলে ধরেছেন। বক্তব্য আর কিছুই নয় – পঞ্চায়েতের আসন ভাগাভাগি নিয়ে বিরোধ।

কথাটা হল, মন্ত্রীদের এইসব বক্তব্য দলীয় বক্তব্য – তাঁদের দপ্তর বা বামফ্রন্ট সরকারের নীতি সম্পর্কে নয়। মন্ত্রীরা বলতে পারেন যে তাঁরা সি পি আই (এম) বা মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের সমালোচনা করতে চাননি, অসত্য বক্তব্যের প্রতিবাদ জানাতে চেয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু তাঁদের প্ররোচিত করেছেন। কথাটা মিথ্যা নয়। মুখ্যমন্ত্রী এর আগেও বলেছেন, ওঁরা বামফ্রন্ট থেকে বেরিয়ে যেতে পারেন তো! ওঁরা তো কংগ্রেসের সংগে হাত মিলিয়েছেন, প্রভৃতি।

একজন মুখ্যমন্ত্রী হলেন গোটা মন্ত্রিসভার নেতা। মন্ত্রিসভাকে একটাই দল বলে ধরে নিতে হয়। সেদিক থেকে জ্যোতিবাবু কোনদিনই মন্ত্রিসভার সাধারণ নিয়মনীতি মানেননি। আগে কাজটা করিয়ে নিয়ে তারপর মন্ত্রিসভার অনুমোদন করিয়ে নিয়েছেন। নিয়মনীতি জ্যোতিবাবুর জন্য নয়। এতদিন পর ৭৪ বছর বয়সের একজন লোকের পক্ষে সেটা যে পাল্টানো সম্ভব নয়, এটা অন্য শরিকদলের মন্ত্রীদের হয়তো বোঝা উচিত ছিল। জ্যোতিবাবু সকলের সমালোচনা করবেন কিন্তু তিনি কোনদিনই কারুর সমালোচনা শুনতে রাজি নন। জ্যোতিবাবুর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে কোন মন্ত্রী দলে বা মন্ত্রিসভায় থাকতে পারেন না। তার সাম্প্রতিক নজির হল প্রাক্তন পরিবেশমন্ত্রী ভবানী মুখার্জি এবং প্রবীণ সদস্য অরুণপ্রকাশ চ্যাটার্জি। যাই হোক, প্ররোচনা সত্ত্বেও অন্য শরিকদলের মন্ত্রীদের সংযত হওয়া উচিত ছিল।

সি পি আই (এম)-এর মধ্যে জ্যোতিবাবুর অনুসরণকারীর সংখ্যা কম নয়। সি পি আই (এম)-এর কেন্দ্রীয় কমিটির বুদ্ধিজীবী সদস্য ডঃ বিপ্লব দাশগুপ্ত সবাইকে অবাক করে দিয়েছেন। বিপ্লববাবু গত ২০ ফেব্রুয়ারি হঠাৎ দলবল নিয়ে রাইটার্স বিল্ডিংসে এসে প্রেস কর্ণারে সাংবাদিক বৈঠক ডাকলেন। কলকাতার একটা ইংরেজি দৈনিকে তাঁর সম্পর্কে খবর বেরিয়েছে। সে জন্য তিনি আদালতে মামলা করেছেন এবং আর একটি সংবাদ সম্পর্কে প্রেস কাউন্সিলের কাছে অভিযোগ করেছেন। গৌহাটিতে প্রেস কাউন্সিলের কাছে তাঁর বক্তব্য জানিয়েছেন। এই ব্যাপারগুলো জানানোর জন্যই তাঁর সাংবাদিক বৈঠক। সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার। এর সংগে সরকার, পঞ্চায়েত নির্বাচন বা সি পি আই (এম)-এরও কোন সম্পর্ক নেই।

নতুন এবং নিন্দনীয় নজির সৃষ্টি করেছেন মন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যর তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর। প্রেস কর্ণারে ওই দপ্তরের একটা ব্ল্যাক বোর্ড আছে। কোন মন্ত্রী সাংবাদিক বৈঠক ডাকলে ওই ব্ল্যাক বোর্ডে তথ্য দপ্তরের একজন অফিসার খড়ি দিয়ে লেখেন মন্ত্রীর নাম, কোথায়, কখন সাংবাদিক বৈঠক করবেন। ব্ল্যাক বোর্ড কেবলমাত্র মন্ত্রীদের জন্যই ব্যবহার করা হয়। সেদিন দেখা গেল মন্ত্রীর নামের জায়গায় তথ্য দপ্তরের একজন অফিসার ব্ল্যাক বোর্ডে ডঃ বিপ্লব দাশগুপ্তর নাম লিখে দিলেন।

প্রশ্ন হল, অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে, তাতে এখন থেকে কি যে কোন লোক রাইটার্স বিল্ডিংসে এসে প্রেস কর্ণারে বসে সাংবাদিক বৈঠক করতে পারবেন?

পঞ্চায়েত নির্বাচনের আসন বন্টন নিয়ে বিরোধকে কেন্দ্র করে মন্ত্রীরা কোন নীতিতে রাইটার্স বিল্ডিংসে বসে সাংবাদিক বৈঠক করেছেন? দলীয় ঝগড়ায় প্রশাসনকে বা প্রশাসনের অফিসকে কেন ব্যবহার করতে দেওয়া হবে? আমার এই লেখা বের হবার আগেই পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফল বেরিয়ে যাবে। উত্তেজনা আরও বাড়বে। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু এবং সি পি আই (এম) নেতাদের বিরূপ মন্তব্য, অপমানজনক মন্তব্যের প্রতিবাদ জানাতে কৃষিমন্ত্রী কমল গুহ পদত্যাগ করতে পারেন। তারপর আবার বামফ্রন্টের শরিকী বিরোধ মিটিয়ে ফেলার উদ্যোগ চলবে। তার আগে দরকার মুখ্যমন্ত্রী এবং মন্ত্রীদের জন্য একটা আচরণবিধি, যে আচরণবিধি সবাই মেনে চলবেন। □

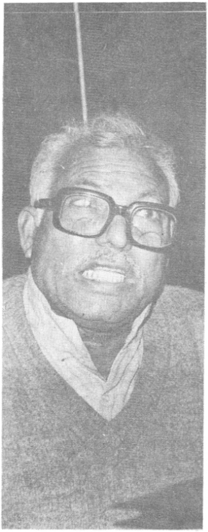
বিহার রাজনীতির উজ্জ্বল ব্যতিক্রম কর্পূরি ঠাকুর

কর্পূরি ঠাকুর চলে গেলেন। ভারতীয় রাজনীতির এক দৃঢ়চেতা ব্যক্তিত্ব বিদায় নিলেন। রাজনীতি ছিল তাঁর জীবনচর্যার অংগ। ৬৮ বছরের জীবনে অনেকবারই জেলে গেছেন কর্পূরি ঠাকুর। স্বাধীন ভারতবর্ষেই অন্তত ২০ বার। বরাবরের স্বাধীনচেতা এই মানুষটির মৃত্যুতে শুধু তাঁর পার্টি লোকদল (ব)-ই নয়, সর্বভারতীয় ক্ষেত্রেই বিরোধী রাজনীতিবিদরা হারালেন এক দক্ষ নেতাকে। নিজের রাজ্য বিহারে আমৃত্যু কর্পূরি ছিলেন জনপ্রিয়তার তুংগে। জীবদ্দশায় তাঁর এই জনপ্রিয়তায় কেউ ভাঙন ধরাতে পারেননি। বলা বাহুল্য, সে সাহস ছিল না কারও। বিহারের হালফিলের রাজনীতিতেও কর্পূরি ছিলেন এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। আজীবন জনগণের দাবিদাওয়া, সমস্যা নিয়ে সমানে লড়াই করে গেছেন কর্পূরি ঠাকুর। এমনকি, কখনও কখনও নিজের দলের বিরোধিতার মুখে দাঁড়িয়েও এ ব্রত পালনে তিনি বিরত হননি।

কেন্দ্রে জনতা সরকারের পতনের পর চৌধুরী চরণ সিং প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। সেই সময় কর্পূরি চরণের সংগেই ছিলেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই চরণের হাবভাবের সংগে তাল মিলিয়ে চলতে না পারায় জনতা পার্টিতে যোগ দেন। তবে, এখানেও থিতু হতে পারেননি। জনতা পার্টির প্রধান চন্দ্রশেখরের সংগে কিছুতেই বনিবনা হচ্ছিল না তাঁর। অগত্যা জনতা পার্টি ছেড়ে বহুগুণার নেতৃত্বাধীন লোকদলে যোগ দেন। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তিনি ছিলেন এই দলেরই একজন মহারথী।

বিহারের রাজনীতিতে জাতপাতের একটা ভূমিকা আছে বরাবরই। কিন্তু, কর্পূরি ছিলেন এহেন সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে। তিনি যে আজীবন দাপটে রাজনীতি করে গেলেন, তা কেবল 'ঠাকুর' গোষ্ঠীর আশীর্বাদে নয়। আসলে, জাতপাত নির্বিশেষে সকলের কাছেই এই মানুষটির রাজনৈতিক সততা ছিল প্রশ্নাতীত। এর সংগে যোগ হয়েছিল দলিত মানুষের পাশে দাঁড়ানর সাহস। সংসদীয় রাজনীতিতে লোহীয় সমাজতন্ত্রের প্রতি তাঁর অবিচল নিষ্ঠা। একটা 'বাংলো' দূরস্থান, মৃত্যুর পর নিজের বলতে একটা ছোটখাট বাড়িও রেখে যাননি কর্পূরি ঠাকুর – দু-দুবার বিহারের মুখ্যমন্ত্রী ও একবার উপ-মুখ্যমন্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও।

সমস্তিপুরের পিতাওঝিয়া গ্রামে একটা নড়বড়ে দু-কামরার বাড়িতে ১৯২১ সালের ১ মে জন্মগ্রহণ করেন কর্পূরি। তাঁর দীর্ঘ ৬৮ বছরের জীবনে পিতাওঝিয়া গ্রামের অনেক বাড়ির ভোল পাল্টাতে দেখেছেন কর্পূরি।



ফটো : সৌরভ রায় বর্মণ

কিন্তু নিজের বাড়ির হাল যে কে সেই। গান্ধী চরিত্রের অনাড়ম্বরতা এমনভাবেই রক্তে মিশেছিল তাঁর, নাপিত পরিবারে জন্মেছিলেন কিন্তু তা নিয়ে কোন হীনমন্যতা ছিল না তাঁর মনে। এমনকি পুত্র যখন মুখ্যমন্ত্রী তখনও পিতা গোকুল ঠাকুর বংশবৃত্তি ত্যাগ করেননি এবং পুত্রও পিতাকে বৃত্তি ত্যাগের কোন অনুরোধ জানাননি।

আসলে শ্রমশক্তিতে আস্থা, সরল জীবন-যাপন এইসব গুণাবলীই তাঁকে জনতার অত কাছে নিয়ে এসেছিল। বরাবরই তিনি কথায় ও কাজে জনগণের কাছে সমান বিশ্বাসভাজন ছিলেন। নিজ রাজনৈতিক আদর্শের প্রতি তাঁর বিশ্বাস এতই দৃঢ় ছিল যে অনেক প্রলোভন সত্ত্বেও 'ঝোপ বুঝে কোপ মারার' রাজনীতি তিনি কখনই করেননি। এদিক থেকেও তিনি ছিলেন দৃষ্টান্ত স্বরূপ। গত ২১ বছর ধরে বিহারের অ-কংগ্রেসী শিবিরে তিনিই ছিলেন সেই নাপিতপুত্র, জীবনে কোন শক্তির ভয়েই যিনি সততার কবচকুণ্ডল ত্যাগ করেননি।

যখন যে পক্ষের হয়েই জনতার দরবারে প্রার্থী হয়েছেন জনতা তাঁকে ফেরায়নি। '৫২ সালে প্রথম নির্বাচিত হন। তারপর আর পিছন ফিরে তাকাননি। আর '৬৭ সাল থেকে আমৃত্যু তিনিই তো অ-কংগ্রেসী শিবিরের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা। আজ প্রায় সমস্ত বিরোধী দল যখন রাজীবের বিরুদ্ধে এককাট্টা হওয়ার চেষ্টা করছে তখন জাতীয় স্তরে বিশেষত হিন্দিভাষী অঞ্চলে কর্পূরির মত নেতার অভাব পূরণ হবার নয়। ভি পি সিং যখন জাতীয় স্তরে কংগ্রেস (ই)-র বিকল্প গড়ার তোড়জোর করছেন তখন কর্পূরি লোকদল (ব)-র কর্মকৌশলের সংগে তেমন তাল মিলিয়ে চলেননি। কিন্তু স্বয়ং ভি পি জানতেন যে কর্পূরি ছাড়া এই উদ্যোগ বিহারে দানা বাঁধবে না। জনতা পার্টির সংগে এর জন্য ভি পি-র মনোমালিন্যও হয়েছিল কিন্তু ভি পি কর্পূরির সংগে সম্পর্ক ছিন্ন করেননি। ভি পি বুঝেছিলেন, একবার কর্পূরির সমর্থন পেলে বিরোধী শিবিরে একটা নতুন মাত্রা যোগ হবে – রাজীবের বিকল্প গঠনে যে প্রার্থিত মাত্রার কোন বিকল্প নেই। ব্যক্তি কর্পূরি সম্পর্কে ভি পি-র এই মূল্যায়নে দুই কমিউনিস্ট পার্টিই ছিল একমত। বিহারে সি পি আই-র শক্তি নেহাত ফেলনা নয়। এবং তাঁরাও কর্পূরিকে 'ম্যান অব দ্য সয়েল' সম্মান দিয়েছেন। আর এই কারণেই মতের বিস্তর ফারাক সত্ত্বেও দুই কমিউনিস্ট পার্টিই ছিল কর্পূরির নেতৃত্বাধীন বিরোধী শিবিরের শরিক। '৬৭-তে বিহারে সংযুক্ত মোর্চার সরকারে সি পি আই এবং জনসংঘ এই দুই বিপরীত মেরুর দলই ছিল। সেবার এমন 'অসবর্ণ বিবাহের' পৌরোহিত্য করেছিলেন কর্পূরি ঠাকুর। এমনই ছিল তাঁর রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। এহেন ইন্দ্রের পতনে বিহার লোকদল (ব)-এ হয়ত সাময়িক অস্তিত্ব সংকট দেখা দিতে পারে। কর্পূরির নিজের 'ভোট-ব্যাংক' এখন কেমন দলের লক্ষ্মী হয় সেটাই দেখার। কর্পূরির মৃত্যুতে বিহারে শাসক শিবিরেও শক্তির রদবদল হতে পারে। সাম্প্রতিক কালে বিহারে জনবলে বলীয়ান নেতা বলতে দুজনই মাত্র গণ্য হতেন – একজন কর্পূরি আর একজন কং (ই)-র জগন্নাথ মিশ্র।

কর্পূরির মৃত্যুতে বিহার রাজনীতিতে একটি অধ্যায়ের অবসান হল। তিনিই ছিলেন ডঃ রামমনোহর লোহিয়ার অনুগামী শেষ সমাজতন্ত্রী। বলা যায়, এক সম্ভ্রান্ত রাজনৈতিক ঘরানার শেষ প্রতিনিধি বিদায় নিলেন।□

অরবিন্দ চতুর্বেদী

বুদ্ধির দৌড়

গল্প নয়, সত্যি। মজার হলেও দুঃখজনকই বটে। সামান্য একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে দেওঘর বাজারের একপাশে জটলা। জ্যামিতির বৃত্তের মতোই বলা যেতে পারে। সামনে পেছনে যে যেদিক দিয়ে পারছেন পথচলতি স্থানীয় বাসিন্দা ও ভ্রমণার্থীরা নিশ্বাস নেবার মতো জায়গা করে ব্যাপারটা দেখবার জন্য উঁকি দিয়ে দেখছেন। ওফ্ঃ বাপরে বাপ, কী সর্বনাশা কান্ডরে!

একজন স্থূলকায় ব্যক্তি কোমরে গামছা জড়িয়ে দুজন শিশু ভোলানাথকে ভীষণ পোটাচ্ছেন। বেচারা দুজনে 'মা গো বাবা গো' করে চিৎকার করে কাঁদছে আর অনবরত বলছে 'আমি করিনি, আমাকে ছেড়ে দাও।' ভদ্রলোক কিছুতেই তো থামছেন না। আশ্চর্য, আশেপাশের লোকেদের এতটুকুও সাহস নেই যে তার প্রতিবাদ করে। দুজন শিশুর মধ্যে একজন আধ-মরার মতো মাটিতে শুয়ে কাঁদছে। অপরজন সেই সময় চোখের পলকে সেই ব্যক্তির গামছাখানা ভীষণ জোরের সংগে টেনে দিয়ে দৌড়। ভদ্রলোক লজ্জা নিবারণের জন্য তো কোনরকমে নিজেকে সামলাতেই ব্যস্ত। ঠিক এমন সময় আরেক শিশুও দৌড়। এবার সাহসিকতার জন্য বাহবা জানাল পথ চলতি মানুষরা, শিশু ভোলানাথদের।

প্রদীপ ঘোষ

দুটি আঙুল মানে টু রুপিজ

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে কলুটোলার গলির মোড়ে ডাব বিক্রি হামেশাই চোখে পড়ে। এখন তো আবার ফাগুনে আগুনের তৃষ্ণা, 'জল চাই' জল'। সেদিন অর্থাৎ ২৭ ফেব্রুয়ারির শনিবারের বারবেলায় সেই ডাবের দোকানের সামনে এক সাহেব এবং মেম সাহেব ডাব কিনতে এলেন। বিক্রেতা একটা বাচ্চা ছেলে। মেমসাহেব তো এসে ইংরেজিতে বকবকম শুরু করলেন, মোদ্দা কথা হচ্ছে ডাব কত করে? বাচ্চাটা তো ছাই ভস্ম কিছুই বোঝে না, শুধু দুটো আঙুল দেখায়। এই কথোপকথনের মাঝে তাঁরা দুজনে দুখানা ডাব খেলেন এবং পাঁচ টাকার চকচকে নোট বার করে দিয়ে বললেন, 'টেক ইট'। হাসি মুখে শ্বেতাংগর দিকে তাকিয়ে এক টাকা ফেরত দিয়ে নমস্কার করল বাচ্চাটা।

ভাস্বতী মুখোপাধ্যায়

কলির কামধেনু

সেদিন মৌলালির মোড়ে বেশ কিছু লোকের জটলা। মাঝখানে এক ভদ্রমহিলার তারস্বরে চিৎকার। জটলার ভেতরে কী হচ্ছে তা দেখার জন্য সবাই উৎসুক। চলতি পথে ভিড় লক্ষ্য করে ব্যাপারটা কী তা দেখার জন্য উঁকি মারতেই দেখি একটি শ্বেতবর্ণের গাভী। গাভীটির ছয়টি পা। সাধারণ গরুর মত চারটি। এবং অতিরিক্ত দুটি ঘাড়ের কাছে। গঠন দেখলে মনে হবে ঘাড় থেকে যেন একটা আস্ত বাছুর ঝুলছে।

ভদ্রমহিলার গ্র্যাভিটি এই গাভীটিকে নিয়েই। ভদ্রমহিলা আধা বাংলা, আধা হিন্দিতে চিৎকার করে যাচ্ছেন 'এ্যাসা গাভী কভি নেহি মিলতা হ্যায়। মহাদেওজী স্বয়ং ইসকো ভেজতা হ্যায়। দয়া করকে ইসকো সেবাকে লিয়ে কুছ প্যায়সা দিজিয়ে। মহাদেওজী আপকো আশীর্বাদ দেংগে।'

ভদ্রমহিলার কথায় আকৃষ্ট হয়ে কেউ কেউ অবশ্য পয়সা ফেলছিলেন। এমন সময় দর্শকদের থেকেই একজন বলে উঠলেন, ফেলুন দাদা, ফেলুন। এ যে কলির কামধেনু। পয়সা ফেলে বাড়ি যান, দেখবেন সব আশা পূর্ণ হয়েছে।

শিবরাম চক্রবর্তী

ঘুস না দিলে কাজ হবে না,
দোষটা যেন নেয়ার,
দিয়ে আবার বলিস কেন
ঘুষ নেবার চেয়ার।

* * *

পণ দেব না, পণ নেব না,
মিথ্যে এসব বুজরুকি!
পণ নেবে না? পাত্র খারাপ,
চিন্তা এমন তুঘলকি।

পুলক রায়চৌধুরী

বাজেট এল, যাত্রী মাসুল
দিচ্ছে আকাশ পাড়ি;
ভাবছি এবার রণপা চড়ে
করব অফিস-বাড়ি।

* *

পণ্য মাসুল দিচ্ছে যা শূল
কে আগলায় ঘর,
দুদিন পরেই হূহূ করে
বাড়বে বাজার দর।

সুখেন্দু মজুমদার

শহর জুড়ে ফুটপাতে –
হকার চেঁচায় দিন-রাতে।
কিছু বললেই, – তাকিয়ে,
অমনি, সে চোখ পাকিয়ে
বলবে, – 'সোজা, কাটুন!
বড় রাস্তায় হাঁটুন!!'

* * *

শব্দ-দূষণ ভীষণ রকম!
কান যে ঝালা-পালা!
'শব্দ' থেকে বাঁচতে হলে, –
শহর ছেড়ে পালা!

শব্দে, চোখের ঘুম ছুটেছে, –
রাতেও, রাখে জাগিয়ে!
শহরেতে থাকবি, কানে,
'সাইলেন্সার' লাগিয়ে!!

শ্যাম বন্দ্যোপাধ্যায়

জমিদারের মোসাহেবী
আর চামচাগিরি নেতার
এ যেন সেই একই সুরা
নতুন পাত্রে আবার।

রতন বড়ুয়া

অফিস ফেরৎ বাড়ি ফিরে
চা বানিয়ে কর্তা খান
জর্দা মুখে টিভির সামনে
গিন্নি তখন চিবোন পান।

অজিতকৃষ্ণ দে



বড়লোকদের স্বার্থরক্ষা না করলে রাজীব টিঁকতে পারবেন না

ভারতের সংবিধান সংশোধন করে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী 'সমাজতন্ত্র' শব্দটি জুড়ে দিয়েছিলেন। নেহরু নিজেও 'সমাজতন্ত্র কায়েমের' জন্য শব্দের অজস্র মালা গেঁথে গেছেন। কিন্তু ভারতে 'সমাজতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার প্রয়াস কখনও চোখে পড়েনি। খ্যাতনামা সাংবাদিক রণজিৎ রায় নেহরু থেকে রাজীব গান্ধীর শাসনকাল পর্যন্ত তথ্যভিত্তিক আলোচনা করে দেখিয়েছেন, এই ভারতে ধনিক শ্রেণীর স্বার্থ না আগলালে কেউই দিল্লির মসনদে টিঁকে থাকতে পারবেন না।

রাজীব গান্ধীর মতিগতি এবং তাঁর চঞ্চলচিত্ত কাজকর্মের ওপর আলোকপাত করেছেন বিশিষ্ট রাজনীতিক হীরেন মুখোপাধ্যায়।

এছাড়া সাংবাদিক বিমল নন্দীর কলমে ফুটে উঠেছে রাজীব গান্ধীর শাসনকালের তিন বছরের হালতামামি।

গত অক্টোবর মাসে ওয়াশিংটন সফরকালে প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী বলেছিলেন, শিল্প-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তুলে দেবার যে নীতি ভারত সরকার গ্রহণ করেছে, সে পথ ত্যাগ করা হবে না। ছয় বছর পূর্বে তাঁর মা তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সংগে আমেরিকা সফরকালে রাজীব বলেছিলেন 'ভারত যখন স্বাধীন হয় তখন শিল্প প্রসারের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো ছিল না। শিল্প স্থাপনের জন্য ব্যক্তিগত মূলধনেরও অভাব ছিল। সুতরাং সব কিছুই সরকারকে করতে হত। বর্তমানে শিল্প-প্রসারের মূল ভিত তৈরি হয়েছে। সুতরাং ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে শিল্প প্রসারের অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে।

সরকারি মূলধনে-সৃষ্ট শিল্প-ব্যবসায়কে বলা হয়, পাবলিক সেক্টর এবং ব্যক্তিগত মূলধনে সৃষ্ট শিল্প-ব্যবসায়কে বলা হয় প্রাইভেট সেক্টর। কেন ভারত সরকার পাবলিক সেক্টর তৈরি করল তার ব্যাখ্যায় ১৯৫০-এর নভেম্বর মাসে দিল্লিতে এক শিল্পমালিকদের মিটিং-এ জওহরলাল নেহরু বলেন: 'প্রাইভেট সেক্টরকে যদি তার ইচ্ছামত কাজ করতে দেওয়া হয় তবে সর্বপ্রথম ঘায়েল হবে ওই প্রাইভেট সেক্টর। অর্থ রোজগারে প্রাইভেট সেক্টর পটু বটে, কিন্তু এর মগজের অভাব আছে।'

প্রাইভেট সেক্টরের সংগে সংগে পাবলিক সেক্টর আছে বলে আমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে বলা হয় মিশ্র অর্থনীতি। মিক্সড ইকনমিতে পাবলিক সেক্টর হল সমাজতান্ত্রিক সেক্টর এবং ব্যক্তিগত মালিকানায় শিল্পব্যবসা হল প্রাইভেট সেক্টর। পাবলিক সেক্টরের মূলধন আসে জন-সাধারণের পকেট থেকে। মুখ্যত উচ্চহারে ট্যাক্স মারফৎ।

পরমেশ্বর নারায়ণ (পি এন) হাকসার ছিলেন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর সেক্রেটারি ১৯৬৭ থেকে ১৯৭২ পর্যন্ত। এর পর তিনি পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যানের অর্থাৎ মুখ্য পরিচালকের পদ অলংকৃত করেন। পাবলিক সেক্টরের ভূমিকা ব্যাখ্যা করে ১৯৭৪-এর ২৬ জানুয়ারি সংখ্যার ব্লিৎজ সাপ্তাহিকে তিনি লেখেন : 'পাবলিক সেক্টরের পরিচালনা এবং উৎপাদনে শৃঙ্খলা নেই। এই সেক্টরের উৎপাদিত দ্রব্যাদি বন্টন এবং এসব দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ করা হয় কেবলমাত্র সস্তায় মাল সরবরাহ করে, কতিপয় ব্যক্তি এবং প্রাইভেট সেক্টরের হাতে সাদা ও কালো টাকা জমানোর জন্য।'

স্বাধীনতার পর ভারতের আর্থিক-সামাজিক ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, তার কিছু হিসাবের দিকে নজর দেওয়া যাক। ধরুন শিল্প-শ্রমিক ও উচ্চতম বেতনভোগীর আয়ের কথা। এ আই সি সি কর্তৃক নিয়োজিত, জওহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে একটি কমিটি ১৯৪৮-এ সুপারিশ করে যে, উচ্চতম আয় ন্যূনতম আয়ের ৪০ গুণের বেশি যাতে না হয়, তার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ক্রমে উচ্চতম আয় ন্যূনতম আয়ের ২০ গুণে নামিয়ে আনতে হবে। সারণি দেখুন।

১৯৪৮-৪৯-এর মধ্যে শ্রমিক শ্রেণীর বা অফিসারদের বেতনে বিশেষ কিছু পরিবর্তন হয়নি। কিন্তু ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৬, এই আট বছরে (যার মধ্যে ছিল প্রথম পরিকল্পনার পাঁচ বছর) জওহরলাল নেহরুর রাজত্বে বৈপ্লবিক বৃদ্ধি ঘটে শ্রমিক শ্রেণীর আয়ে নয়, শিল্পে উচ্চতম বেতনভোগীদের আয়ে। কাপড়ের মিলে শ্রমিকের বেতনের তুলনায় উচ্চতম বেতনভোগীদের আয় যা ১৯৪৮-৪৯-এ ছিল ৭৭ গুণ তা ১৯৫৬-৫৭-তে হয় ২৪২ গুণ। এবং পাটকলে ১১০ গুণের স্থলে হয় ৩৫৬ গুণ। নেহরু ধাঁচের সমাজতান্ত্রিক সমাজের দিকে অগ্রসর হওয়াই বটে!

কর্মচারীদের দাবি ছিল, মূল্যান্তর যে হারে বৃদ্ধি পাবে সে হারে তাদের বেতনও বৃদ্ধি করতে হবে। এই দাবি অগ্রাহ্য করে কমিশন বলে : 'মূল্য বৃদ্ধি ঘটলে বেতন বৃদ্ধির দাবি ওঠা স্বাভাবিক। সরকারের দেখা উচিত যেন তার নিম্নস্তরের কর্মচারীদের জীবনযাত্রার মান নেমে না যায়।'

কেন্দ্রীয় সরকারের প্রচারের ফলে এই ধারণা সৃষ্টি হয়েছে যে, স্বাধীনতার পর শ্রমিকশ্রেণীর আসল মজুরি বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। আসল ঘটনা ঠিক উল্টো। ভারত সরকারের শ্রমমন্ত্রক কর্তৃক তথ্যে দেখা যায় ১৯৬১-র তুলনায় ১৯৭৫-এ মাসিক ৪০০ টাকা বেতনভোগী শিল্প শ্রমিকের আসল

টাকায় বাৎসরিক আয়

	১৯৪৮-৪৯	১৯৫৬-৫৭
ক। অদক্ষ শ্রমিকের আয় সর্বপ্রকার ভাতা সহ		
১। বোম্বাইয়ের কাপড়ের মিল	৯৯৯	১,১৮৫
২। কলকাতার পাট-কল	৭০২	৮০৬
খ। ট্যাক্স দেবার পর উচ্চতম বেতনভোগীদের বেতন	৭৭,২৫০	২,৮৬,৯২৯
গ। অসমতার হার		
(i) ক (১)-এর তুলনায় খ	৭৭ গুণ	২৪২ গুণ
(ii) ক (২)-এর তুলনায় খ	১১০ গুণ	৩৫৬ গুণ

সূত্র কেন্দ্রীয় সরকার, কমিশন অব ইনকোয়ারি অন ইমলিউমেন্টস অ্যান্ড কন্ডিশনস অব সারভিস অব সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ, ১৯৫৭-৫৯, রিপোর্ট, পৃঃ ৮৩

মজুরী ৩৩ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার সময়ে এই তথ্য আর গোপন থাকে না যে, একদিকে দারিদ্র্য দ্রুত প্রসার লাভ করছে অন্য দিকে উৎপাদিত সম্পদ মুষ্টিমেয়র হাতে পুঞ্জীভূত হচ্ছে। প্রশ্ন ওঠে দরিদ্র কাকে বলা হবে?

১৯৬২-তে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক নিয়োজিত একটি কমিটির মতে তখনকার মূল্যস্তরে গ্রামে মাসিক ২০ টাকা এবং শহরে ২৫ টাকার কম যাদের আয় তারা দারিদ্র্য-সীমার নিচে বাস করে বলে ধরতে হবে। বিশেষজ্ঞদের মতে এই আয়ে কোনমতে জীবনধারণ করা সম্ভব, তার বেশি কিছু নয়। এই ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক সংগৃহীত পরিসংখ্যানে দেখা যায় ১৯৭৭-৭৮-এ, অর্থাৎ স্বাধীনতার ত্রিশ বছর পরেও ৪৮.১৩ শতাংশ মানুষকে বাস করতে হত দারিদ্র্যসীমার নিচে। এদের মোট সংখ্যা ছিল ৩০ কোটি ৪৬ লক্ষ ১০ হাজার।

স্বাধীন ভারতে কৃষিতে এবং শিল্পে উৎপাদন যে দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে তার প্রমাণ ভারত সরকার কর্তৃক সংগৃহীত পরিসংখ্যানেই মেলে। জনসংখ্যা যে হারে বেড়েছে তার থেকে অনেক দ্রুত বেড়েছে উৎপাদন – গ্রামে এবং শহরে। এই উৎপাদিত সম্পদ গেল কোথায়?

উৎপাদিত সম্পদের এক অংশকে পরিণত করা হয়েছে কালো টাকায়। বিশেষজ্ঞরা যার পরিমাণ ১৯৮২-তে আন্দাজ করেছিলেন ১০,০০০ কোটি টাকা থেকে ৬০,০০০ কোটি টাকা। এবং যে টাকার সাহায্যে একটি সমান্তরাল অর্থনীতি পরিচালিত হচ্ছে। ১৯৬৩-তে এ আই সি সি-র এক অধিবেশনে ওড়িষ্যার নেতা বিজু পট্টনায়কে বলেছিলেন, কালো টাকার পরিমাণ ৩০০০ কোটি হবে। তারপর কালো টাকার পরিমাণ এবং ক্ষমতা কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

উৎপাদিত সম্পদের একটি বড় অংশ অবশ্য রূপ নিয়েছে শিল্পপতি ব্যবসায়ীদের হাতে শিল্প-সম্পত্তি হিসাবে। স্বাধীনতার পূর্বে যেসব শিল্পপতি-ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর শিল্প-সম্পদ ছিল কয়েক লাখ (আজ হয়েছে) বা দু-দশ কোটি টাকার তাদের সম্পত্তি আজ হয়েছে শতকোটি বা হাজার কোটি টাকার। এদের সংখ্যাও বছরের পর বছর বেড়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে (যখন কালোবাজার কথাটি চালু হয়) ভারতে এদের সম্পত্তি দ্রুত বাড়তে শুরু করে। স্বাধীনতার পর বৃদ্ধির হার হয় আরও দ্রুত। ১৯৬৪-তে (জওহরলালের মৃত্যুর বছর) টাটাগোষ্ঠীর শিল্পসম্পদ ছিল ৪১৮ কোটি টাকা। বাড়তে বাড়তে ১৯৮৫-তে হয় ৩৬৯৯ কোটি টাকা। একই সময়ে বিড়লা গোষ্ঠীর শিল্পসম্পদ ৪১৮ কোটি থেকে এসে দাঁড়ায় ৪১১১ কোটি টাকায়। মফৎলালদের সম্পত্তি ৪৬ কোটি টাকা থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে ওঠে ৯৬৫ কোটি টাকায়। ইত্যাদি।

শ্রেণীতে শ্রেণীতে, মানুষে মানুষে আর্থিক বৈষম্য পশ্চিমের উন্নত দেশগুলোর চাইতেও ভারতে তীব্র। বিশ্ব ব্যাংকের ১৯৮২-র ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট জানিয়েছে যে, ১৯৭৫-এ ভারতে উচ্চতম ২০ শতাংশ পরিবার দেশের মোট পারিবারিক আয়ের ৪৯.৪ শতাংশ উপভোগ করে। কিন্তু আমেরিকার উচ্চতম ২০ শতাংশ পরিবার উপভোগ করে মোট পারিবারিক আয়ের ২৬.৬ শতাংশ (১৯৭২-এর হিসাব)। এটা পশ্চিম জার্মানিতে (১৯৭৪) ৩৭.২ শতাংশ, ফ্রান্সে ৩৭ শতাংশ, জাপানে ৩৮.৮ শতাংশ এবং আমাদের অতি পরিচিত পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেনে ৩৯.২ শতাংশ।

মূল্যবৃদ্ধি সব দেশেই ঘটেছে, বেড়েছে বেতন ও মজুরিও। কিন্তু মূল্য ও মজুরির ক্ষেত্রেও ভারত বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে উন্নত দেশগুলোর তুলনায়। লোকসভার সেক্রেটারিয়েট কর্তৃক জুলাই ১৯৭৩-এ সংগৃহীত তথ্য অনুসারে ১৯৬৯-৭৪, এই পাঁচ বছরে মূল্য বেড়েছে ৪৫ শতাংশ। কিন্তু মজুরি বেড়েছে ৬৭.৫ শতাংশ, আমেরিকায় যথাক্রমে ২৫ শতাংশ এবং ৩৭.৫ শতাংশ। জাপানে ৪০ শতাংশ এবং ৮৭.৫ শতাংশ। অন্যান্য উন্নত দেশেও মূল্যবৃদ্ধির হার থেকে মজুরি বৃদ্ধির হার বেশ বেশি। যে কটি দেশের তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে তাদের মধ্যে ব্যতিক্রম একমাত্র ভারত। ভারতে মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে শতকরা ১২৫ থেকে ১৫০। কিন্তু মজুরি বৃদ্ধির হার মাত্র শতকরা ২০ থেকে ৩০।

জওহরলাল জীবন কাটিয়েছেন সমাজতন্ত্রের বাণী প্রচার করে, অবশ্য তাঁর সমাজতন্ত্রের সংগে মার্ক্সীয় সমাজতন্ত্রের কোন সম্পর্ক ছিল না। ১৯৭৫-এ তাঁর কন্যা শ্রীমতী গান্ধী অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার অবস্থা ঘোষণা করে বহু লোককে বিনা বিচারে জেলে আটক রেখেছিলেন। ঐ সময়ে তাঁর আরেকটি কাজ ছিল সংবিধান পরিবর্তন করে ভারতকে সমাজতান্ত্রিক দেশ বলে ঘোষণা করা। আমাদের দেশকে সমাজতান্ত্রিক দেশ বলে ঘোষণা মনে করিয়ে দেয়, হিটলারও জার্মানিকে আখ্যা দিয়েছিলেন ন্যাশনাল সোসালিস্ট বলে। নেহরুর সময় থেকে আমাদের নেতৃবৃন্দ প্রচার করে আসছেন, ভারতীয় ঢঙে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছেন তাঁরা।

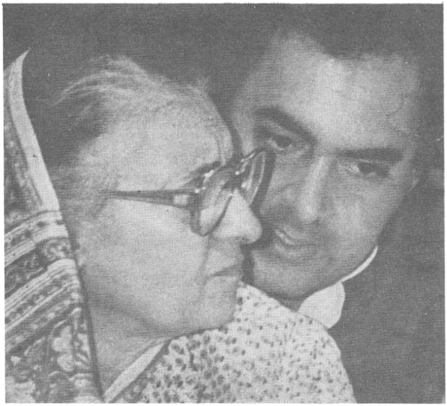
স্বাধীন ভারতের বয়স ৪০ বছর ৬ মাস ২৩ দিন। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর পর কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকারের পরামর্শে বিভিন্ন রাজ্য সরকার সিকিউরিটি আইন চালু করল রাজনৈতিক বিরোধীদের বিনা বিচারে নজরবন্দী করে রাখার উদ্দেশ্যে। সংবিধান চালু হবার পর বিভিন্ন হাইকোর্ট বিনা বিচারে আটক আইন সংবিধান-বিরোধী বলে রায় দেয়। তখন নেহরু সরকার সংবিধানকেই সংশোধন করেন। বিনা বিচারে বন্দী করার ক্ষমতার জন্য নিবর্তনমূলক আইন প্রবর্তন করা হয়। বলা হয় তিন বছরের জন্য আইনটি চালু করা হয়েছে। তিন বছর অন্তর অন্তর আইনটি নতুন করে পার্লামেন্ট দ্বারা পাশ করিয়ে চালু রাখা হয় পুরো ১৮ বছর। ১৯৬৯-এর নভেম্বরে কংগ্রেস দ্বিখণ্ডিত হলে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কংগ্রেস লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারায়। ঐ সময়ে নিবর্তনমূলক আইন পুনরায় পাশ করাতে না পারলে তা আর প্রয়োগ করা চলবে না। সব বিরোধী দল একত্রিত হয়ে ঘোষণা করে, আইনটির মেয়াদ বৃদ্ধির বিরোধিতা তারা করবে। পার্লামেন্টে পরাজিত হবে বলে শ্রীমতী গান্ধী আইনটাকে নতুন করে চালু করার চেষ্টা থেকে বিরত থাকেন। একাদিক্রমে ১৮ বছর চালু থাকার পর ১৯৭০-এর ১ জানুয়ারি আইনটি তামাদি হয়ে যায়।

১৯৭১-এর লোকসভা নির্বাচনে শ্রীমতী গান্ধী বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেন। ১৮ মার্চ তিনি নতুন সরকার গঠন করেন। ২০ দিনের মধ্যে তিনি অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা-রক্ষা আইন (মিসা) পার্লামেন্টে পেশ করেন। এটি নিবর্তনমূলক আইন থেকেও বেশি কঠোর। এটি নাগরিক অধিকার বিরোধী আইন। এই আইনটি বাতিল করা হয় জনতা সরকারের আমলে।

১৯৬২-তে চীনের সংগে সীমান্ত যুদ্ধ চলে ৩০ দিন। ওই সময়ে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়। জরুরি অবস্থার সময় সর্বপ্রকার নাগরিক অধিকার আইন শিকেয় তোলা থাকে। যুদ্ধ শেষ হলেও আইনটি প্রত্যাহার করা হয় না। নেহরু এটি প্রত্যাহার করতে অস্বীকার করেন। লালবাহাদুরও অস্বীকার করেন। শ্রীমতী গান্ধীও এটি চালু রাখেন। ১৯৭৫-এ শ্রীমতী গান্ধীর নির্বাচন বাতিল হয়ে গেলে তিনি পদত্যাগ না করে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন। যদিও ১৯৭১-এ পাকিস্তানের সংগে যুদ্ধের সময় প্রবর্তিত জরুরি অবস্থা ঘোষণাটি প্রত্যাহার হয়নি। ১৯৭৭-এ নির্বাচনে জনতা পার্টির নিকট দারুণভাবে পরাজিত হবার পর ২১ মার্চ জরুরি অবস্থা ঘোষণাটি প্রত্যাহৃত হয়। মিসা নেই বটে, কিন্তু ১৯৮০-তে পুনরায় ক্ষমতা হাতে এলে শ্রীমতী গান্ধী বিনা বিচারে বন্দী করে রাখার ব্যবস্থা করে নেন। যেন রাজীব গান্ধীর আমলেও সেই জাতীয় নিরাপত্তা আইনটি বলবৎ আছে।

স্বাধীন ভারতকে বহু বছর কাটাতে হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে দমনমূলক আইনের অধীনে। আশ্চর্য মনে হয়, ১৯৩৬-এ কংগ্রেসের লক্ষ্মৌ অধিবেশনে বলা হয়েছিল: 'যে সরকারকে ক্রিমিনাল ল' অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট এবং অনুরূপ অন্যান্য আইনের উপর নির্ভর করতে হয়, যে সরকার সংবাদপত্র এবং সাহিত্য প্রচার করতে দেয় না, যে সরকার মানুষকে বিনা বিচারে বন্দী করে রাখে, এবং যে সরকার এসব এবং অনুরূপ আরও অনেক কার্য করে থাকে সে সরকারের বেঁচে থাকবার কোন অধিকার নেই।'

কংগ্রেসী রাজত্বে এই হচ্ছে সংক্ষেপে আমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার চিত্র। এই অবস্থা সৃষ্টির কাজ চলছে স্বাধীন ভারতের প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই। বিগত ৪০ বছরে তার ব্যাপকতা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজীব গান্ধী প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন ১৯৮৪-র অক্টোবরে। আজ অবধি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যেসব ইংগিত তিনি দিয়েছেন তাতে মনে হয় না ধনিকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষাকারী এই অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থার কোন পরিবর্তন তিনি চান। অবশ্য যদি না সে পরিবর্তন ঐ শ্রেণীর জন্য আরও সুবিধা সৃষ্টি করে। যদি তিনি জনসাধারণের স্বার্থে ভিন্ন পথে চলতে চান – যার কোন চিহ্ন নেই, তবে তাঁর পক্ষে প্রধান মন্ত্রিত্বের গদিতে টিকে থাকাই অসম্ভব হয়ে পড়বে। দেশে যে ইন্টারেস্ট গ্রুপ সৃষ্টি হয়েছে সে গ্রুপের স্বার্থ হানিকর কোন পদক্ষেপ গ্রুপটি বরদাস্ত করবে না। তাঁর মাতা এবং মাতামহের মত তাঁকেও শহরে গ্রামে ধনিকশ্রেণীর স্বার্থসিদ্ধির কাজ করে যেতে হবে। □



রাজীব ইন্দিরা- রাজনীতির উত্তরসূরি

১৯৮০ সালের জুন মাসে সঞ্জয় গান্ধীর মৃত্যুর পর দিল্লি থেকে ঘুরে এসে পশ্চিমবাংলার দু'জন তরুণ কংগ্রেস নেতা কলকাতায় তড়িঘড়ি বিবৃতি দিয়ে দাবি জানালেন, রাজীব গান্ধীকে রাজনীতিতে আনতে হবে এবং জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে বসাতে হবে। কারণ দেশের 'বর্তমান সংকটজনক পরিস্থিতিতে' তাঁর নেতৃত্ব প্রয়োজন। ঐ বিবৃতির পরে দেখা গেল, এরকম দাবি সব রাজ্য থেকেই উঠেছে। দিল্লি সহ সব রাজ্যের তরুণ কংগ্রেস নেতারাই এক সুরে দাবি জানাতে লাগলেন : রাজীব গান্ধীকে রাজনৈতিক নেতা হিসেবে চাই।

রাজীব গান্ধী তখন নিছক পাইলটের চাকরি করেন। দেশ তো দূরের কথা তিনি কোন রাজনৈতিক সংগঠনও পরিচালনা করেন না। রাজনীতি করার অভিজ্ঞতা তাঁর নেই। রাজনীতি করা বাড়ির ছেলে হয়েও রাজীব প্রত্যক্ষভাবে কখনও রাজনীতির ধারে-কাছে ছিলেন না। দেশের সংকটমোচনে তাঁর নেতৃত্বের প্রয়োজন আছে কি না তা দেশের সাধারণ মানুষের জানার কথা নয়। সাধারণ মানুষের যা জানার কথা নয় তরুণ কংগ্রেস নেতারা তা টের পেলেন কী করে? এ নিয়ে এই প্রতিবেদকের দু'একটি প্রশ্নের জবাবে পশ্চিমবাংলার উপরোক্ত দুই তরুণ কংগ্রেস নেতা সেদিন যা বলেছিলেন তার সারমর্ম হল : বিবৃতি না দিয়ে উপায় কী? আমরা না বললে অন্য কেউ বলতেন।

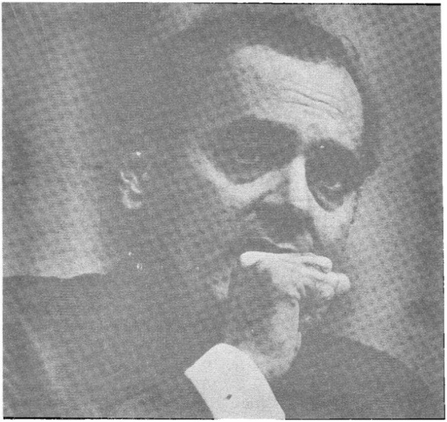
কেন বলতেন তা বুঝতে অবশ্য অসুবিধে হবার কথা নয়। এক পুত্রের মৃত্যুর পর তখনকার প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী আর এক পুত্রকে রাজনৈতিক নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠা দিতে চেয়েছিলেন। সেদিক থেকে তিনি অবশ্য সফলও হয়েছেন। জাতীয় রাজনীতিতেও রাজীব গান্ধী আজ ইন্দিরা গান্ধীর উত্তরসূরি।

দলের নেতাদের দাবি অনুযায়ী না বলে প্রকৃতপক্ষে ইন্দিরা গান্ধীর ইচ্ছে অনুসারেই যথাসময়ে পাইলটের চাকুরিতে ইস্তফা দিয়ে রাজীব গান্ধী কংগ্রেস রাজনীতিতে যোগ দেন। মা প্রধানমন্ত্রী এবং জাতীয় কংগ্রেসের সভানেত্রী তাই এক্ষেত্রেও তাঁকে বেশি সিঁড়ি ভাংগতে হয়নি। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি রাজনৈতিক শক্তির কেন্দ্রভূমিতে এসে দাঁড়ান। ১৯৮১ সালে আমেথি কেন্দ্র থেকে রাজীব লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হন। তার উপর অল্প দিনের মধ্যেই এ আই সি সি'র সাধারণ সম্পাদকের পদটি তাঁকে আরও শক্তিশালী করে তোলে। জাতীয় কংগ্রেসের রাজনীতিতে তিনিই তখন মধ্যমণি। তাঁর ক্ষমতাও অসীম। এই অসীম ক্ষমতা এবং বলতে গেলে অনায়াস-লব্ধ ক্ষমতা তাঁর মেজাজটিকেও বদলে দেয়।

সম্ভবত সেটা ছিল ১৯৮২ সাল। তখন অন্ধ্রের মুখ্যমন্ত্রী টি আনজাইয়া। রাজীব কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক। তিনি গিয়েছিলেন অন্ধ্রপ্রদেশ সফরে। হায়দরাবাদের বেগমপেত বিমানবন্দরে উপস্থিত সকলেই সেদিন অবাক হয়ে দেখলেন যে, সামান্য একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে সেদিন রাজীব গান্ধী অপমান করলেন মুখ্যমন্ত্রী টি আনজাইয়াকে। এতটুকু আব্রু ছিল না। সকলের সামনেই অর্থাৎ প্রকাশ্যেই রাজীব গান্ধী অপমান করলেন মুখ্যমন্ত্রীকে।

রাজীব গান্ধীর সেই মেজাজ পরবর্তীকালে দলীয় মন্ত্রী, এম পি, এ আই সি সি কর্মকর্তা মায় দিল্লির আমলা মহলও টের পেয়েছেন। জনৈক প্রবীণ কংগ্রেস নেতার মতে, ক্ষমতা যত কেন্দ্রীভূত হয় ততই বেশি ব্যক্তিগত রাগ-অনুরাগ-বিরাগের ব্যাপারটি মুখ্য হয়ে ওঠে। রাজীবের আমলে ক্ষমতা আরও বেশি কেন্দ্রীভূত হয়েছে। ইন্দিরার আমলেও ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত ছিল কিন্ত তিনি সব শক্তির মধ্যে সমন্বয়-সাধন (ব্যালান্স) করে চলতে পারতেন, কারণ তাঁর সংগে মাটির যোগ ছিল। তিনি দেশকে, দেশের মাটিকে চিনতেন। রাজীবের 'গ্যাপ' এখানেই।

এই মাটি না চেনার জন্যেই সাধারণ সম্পাদক হিসেবে রাজীব গান্ধী অন্ধ্রের এন টি আর সরকার ফেলে দিলেন তেলেগু দেশমের এক দলছুট নেতার সাহায্য নিয়ে। পরবর্তীকালে তার জন্যে কংগ্রেসকেই খেসারত দিতে হয়। রাজীবের ঐ সরকার-ভাংগার খেলার জন্যেই আরও শক্তিশালী হয়ে সেদিন ক্ষমতায় ফিরে আসেন মুখ্যমন্ত্রী নন্দমুরি তারক রামারাও। কংগ্রেস সভানেত্রী পদে বসেই এক সময় ইন্দিরা গান্ধীও ভেংগে দিয়েছিলেন কেরলের প্রথম কমিউনিস্ট সরকার। ব্যতিক্রম শুধু সময়ের 'আর বাস্তব

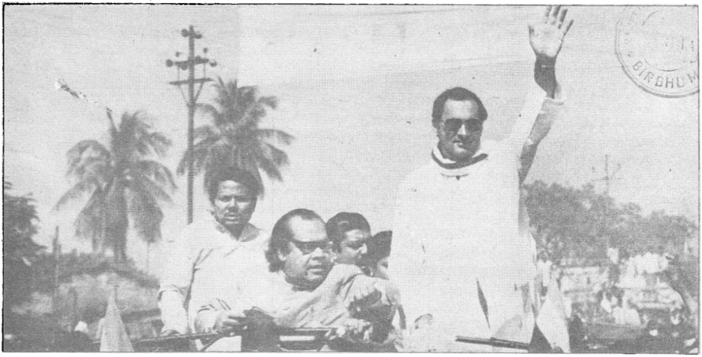


পরিস্থিতির।

১৯৮৪ সালের ৩১ অক্টোবর ইন্দিরা গান্ধীর হত্যাকান্ডের পর আকস্মিকভাবেই রাজীব গান্ধী প্রধানমন্ত্রী হন। কংগ্রেস সংসদীয় বোর্ডের একটি প্রস্তাবের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতি জৈল সিং সেদিন দেশের চিরাচরিত প্রথা ভেঙে রাজীব গান্ধীকে প্রধানমন্ত্রীর পদে শপথ নেওয়ান। যে পদ্ধতিতে এর আগে দু'দুবার গুলজারিলাল নন্দ 'কেয়ার-টেকার' প্রধানমন্ত্রী হন সে পদ্ধতি এক্ষেত্রে মানা হয়নি। প্রথমে প্রধামন্ত্রী হয়ে তারপরে রাজীব গান্ধী কংগ্রেস সংসদীয় দলের নেতা নির্বাচিত হলেন।

এভাবে প্রধানমন্ত্রী হবার পর মাত্র দু'মাসের মধ্যেই নির্বাচন ঘোষণা করে রাজীব গান্ধী রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় দিলেন। এর সুফলটুকুও তিনি আশাতীত-ভাবেই পেলেন। আসাম ও পাঞ্জাব বাদে লোকসভার ৫০৮টি আসনের মধ্যে রাজীব গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস জয়ী হয় ৪০১টি আসনে। পন্ডিত জওহরলাল নেহরু এবং ইন্দিরা গান্ধী ইতোপূর্বে সাত সাতটি লোকসভা নির্বাচনের মুখোমুখি হয়েছেন। কিন্ত এত বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা তাঁরা কখনই পাননি। ১৯৭৭ সালে তো ইন্দিরা গান্ধী হেরেই গিয়েছিলেন। রাজীব এবার তা পুষিয়ে নিয়ে দেশ-বিদেশকে চমকে দিলেন। রাজীবের বৃহস্পতি তখন তুঙ্গে। তিনি ক্রমশই জনপ্রিয় হতে লাগলেন। এবার তিনি আর একটি রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় দিলেন। লোকসভায় দলত্যাগ-বিরোধী বিল পাশ করালেন। ফলে দেশ জুড়ে তাঁর নামে ধন্য ধন্য পড়ে গেল। তিনি তখন 'মিঃ ক্লিন' নামে পরিচিত।

কিন্তু এই বিপুল জনপ্রিয়তা এবং নজিরহীন নির্বাচনী সাফল্য রাজীব গান্ধীর মেজাজটিকেও বদলে দিল। পরিস্থিতি বিচার না করে তিনি নিজের জনপ্রিয়তা সম্পর্কে এমন একটা ধারণা নিয়ে এগোলেন যে, 'আর কে রুধিবে তাঁরে'। ১৯৮৪'র নির্বাচনে জয়ী হয়ে তিনি যে মন্ত্রিসভা গঠন করলেন সেই মন্ত্রিসভায় বাদ পড়লেন ইন্দিরা মন্ত্রিসভার দু'নম্বর ব্যক্তি প্রণব মুখার্জি এবং তাঁর কাছের লোক বলে পরিচিত এ বি এ গণি খান চৌধুরী। তাঁদের যে শুধু বাদ দেয়াই হল তা নয়, এমনভাবে তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করা হল যা অভাবনীয়। শুধু প্রণববাবুরাই নন। চিরাচরিত প্রথা ভেঙে যে জৈল সিং রাষ্ট্রপতি হিসেবে পাশে দাঁড়ালেন রাজীবের এবং প্রধানমন্ত্রী পদের জন্যে শপথ নেয়ালেন, সেই জৈল সিংও রাজীবের আচরণে অল্পদিনের মধ্যেই ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন। খোদ রাষ্ট্রপতিই

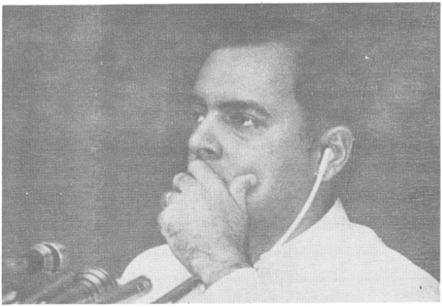


অভিযোগ তুললেন, প্রধানমন্ত্রী তাঁকে উপেক্ষা করছেন। নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী হবার পরে দেখা গেল রাজীব কোনও ব্যাপারেই জৈল সিংকে পাত্তা দিচ্ছেন না। কোনও ব্যাপারেই তিনি জৈলের সংগে পরামর্শ করছেন না। এমনকি প্রথা-মত বিদেশ যাওয়ার আগে ও পরে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতির সংগে নিয়ম-মাফিক দেখা করেন। রাজীব তাও করছেন না। তাই নিয়ে দেশজুড়ে তোলপাড় শুরু হয়ে গেল। একটা সময় এল যখন রাষ্ট্রপতি জৈল সিংও যোগ্য জবাব দেয়ার জন্যে শলাপরামর্শ শুরু করলেন। ইতোমধ্যে ১৯৮৭ সালের ৯ মার্চ রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীকে একখানি কড়া চিঠি লিখে পরিষ্কার জানিয়ে দেন, রাষ্ট্রপতিকে কেন্দ্র করে প্রধানমন্ত্রী সংসদে যে বক্তব্য রেখেছেন তা ঠিক নয়। চিঠিখানি একটি সংবাদপত্রেও প্রকাশিত হয়। এতে জল অনেকদূর গড়ায়। রাজীব গান্ধীও বুঝতে পারেন, পরিস্থিতি খুবই জটিল। রাষ্ট্রপতি সংঘর্ষের পথ নিলে তিনি বেকায়দায় পড়বেন। অগত্যা তিনি ১৯৮৭ সালের ৮ এপ্রিল সকালে রাষ্ট্রপতি ভবনে হাজির হন। প্রধানমন্ত্রী হবার পরে আনুষ্ঠানিকভাবে এটা তাঁর তৃতীয় সাক্ষাৎকার!

রাজীব গান্ধীর এ ধরনের কাজকর্মের মধ্যে একদিকে যেমন ঔদ্ধত্য প্রকাশ পেতে থাকে, অন্যদিকে তাঁর কিছু অনুগত ব্যক্তি বা দুন স্কুলের সতীর্থদের কার্যকলাপও জনমানসে বিরক্তির সৃষ্টি করে। ফলে জনপ্রিয়তা যে দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে তাও অচিরেই ধরা পড়ে। ১৯৮৫'র মার্চ মাসেই ১১টি রাজ্যের বিধান সভার নির্বাচন হয়। অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক এবং সিকিমে কংগ্রেস দারুণভাবে পরাজিত হয়। উত্তরপ্রদেশে শক্তি হ্রাস পায়। রাজস্থান ও মহারাষ্ট্রে কোনক্রমে মান রক্ষা হয়। লোকসভা নির্বাচনের সাফল্য এই ক'মাসের মধ্যেই ম্লান হয়ে গেল। রাজীব ভয় পেলেন।

এ অবস্থা থেকে উত্তরণের পথ হিসেবে রাজীব গান্ধী কয়েকটি শক্ত পদক্ষেপ নেয়ার চেষ্টা করেন। ১৯৭৮ সাল থেকে পাঞ্জাবে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন শুরু। মোরারজী সরকার বা ইন্দিরা সরকার কেউ-ই এই সমস্যা মেটাতে পারেননি। উপরন্তু শক্তভাবে মোকাবিলা করতে গিয়ে ইন্দিরাকে প্রাণ দিতে হল। রাজীব এবার অন্যভাবে ঝুঁকি নিলেন। ২৪ জুলাই ১৯৮৫ প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী চুক্তি করলেন অকালি প্রধান সন্ত হরচন্দ সিং লংগয়ালের সংগে। স্বাক্ষরিত হ'ল পঞ্জাব চুক্তি। এ চুক্তি সেদিন দেশজুড়ে সাড়া জাগায়। যদিও পরবর্তীকালে নির্বাচনে ঐ রাজ্যেও কংগ্রেসের ভরাডুবি হয়।

বিদেশী বিতাড়ন আন্দোলন আসামে শুরু হয় ১৯৭৯ সালে। শেষ দিকটায় কিছুটা চাপাই পড়ে যাচ্ছিল। এমন পরিস্থিতিতে ১৯৮৫ সালের আগস্ট মাসে আন্দোলনকারীদের



সংগে রাজীব আসাম-চুক্তি করেন। এ চুক্তির সময় ঐ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিতেশ্বর সইকিয়াকে বহুলাংশে অন্ধকারেই রাখা হয়। পরে নির্বাচন হ'লে ঐ রাজ্যেও কংগ্রেস দারুণভাবে বিপর্যস্ত হয়। পরের বছর হয় মিজো-চুক্তি লালডেঙার সংগে।

কিন্তু এতসব করেও রাজীব গান্ধী তাঁর হারানো ভাবমূর্তি ফিরে পেলেন না। এখন আর তিনি 'মিঃ ক্লিন' বলেও পরিচিত নন। বফর্স ও সাবমেরিন কেলেংকারী তাঁর উজ্জ্বল ভাবমূর্তিকে ম্লান করে দিয়েছে। বিভিন্ন রাজ্যে পরাজয়ও তাঁর ধারণাকে বদলে দিয়েছে। রাজীব গান্ধী ভেবেছিলেন, পশ্চিমবাংলা এবং কেরলে তাঁর দল জিতবে। কিন্তু হল না। সম্প্রতি তিনি ত্রিপুরা ও মেঘালয়ের নির্বাচনী সাফল্যে কিছুটা উত্তরণের চেষ্টা করছেন। কিন্তু প্রকৃত পরিস্থিতি ততটা আশাব্যঞ্জক নয়। ঐভাবে তড়িঘড়ি সামরিক বাহিনী না নামালে শুধু সাংগঠনিক ক্ষমতায় কংগ্রেসকে জেতানো যেত না। মেঘালয়ের ফলাফল কংগ্রেসের পক্ষে আহামরি কিছু নয়। সেখানেও দল ভাঙার খেলা খেলতে হচ্ছে।

আসলে পরিস্থিতি সামাল দিতে রাজীব গান্ধী এখন হিমসিম খাচ্ছেন। তিনি যে দলের সভাপতি সেই দলের সাংগঠনিক অবস্থা ছিন্নভিন্ন, বিপর্যস্ত। ১৯৭২ সালের পর থেকে কংগ্রেসের কোন সাংগঠনিক নির্বাচন হয়নি। সমস্ত ক্ষমতা কুক্ষিগত এখন দিল্লির হাতে। কিছু তোষামুদে-খোশামুদে ব্যক্তির দ্বারা পরিবেষ্টিত হাইকমান্ড-এর করুণা লাভের জন্যে ভিড় ছাড়া দলের অন্য কোন কাজে তেমন ভিড় নেই। ইতোমধ্যে কংগ্রেসের পুরনো নেতাদের মধ্যে অনেকেই হয় বিতাড়িত নতুবা নিষ্ক্রিয়। কমলাপতি ত্রিপাঠির মতো পুরনো নেতাও রাজীবের দ্বারা উপেক্ষিত। গুজরাতের মাধব সিং সোলাঙ্কি রাজীবকে চিঠি লিখে বলেছেন: কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ভ্রান্ত নীতির ফলে কংগ্রেস জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। জনসমর্থন হারাচ্ছে। অভিযোগ উঠেছে, ইন্দিরা গান্ধী পরাস্ত হলে যাঁরা দল ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন, তাঁদের ডেকে এনে রাজীব অনুগত কর্মীদের মাথার উপর বসিয়ে দিচ্ছেন। ফলে দলের মধ্যে অসন্তোষ ক্রমশ বাড়ছে।

রাজীব গান্ধী দেশ ও দল চালানোর ক্ষেত্রে তাঁর মা ইন্দিরা গান্ধীর পথই অনুসরণ করছেন কিন্তু সেক্ষেত্রেও তিনি হোঁচট খাচ্ছেন বারবার। প্রধানমন্ত্রীর সেক্রেটারিয়েটের হাতে ক্ষমতা কুক্ষিগত করেছিলেন ইন্দিরা গান্ধীও। কিন্ত তার বাইরেও ইন্দিরার সংগে প্রত্যক রাজ্যের কিছু বুদ্ধিজীবী, কিছু রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের যোগসূত্র ছিল। যার মাধ্যমে তিনি কাজের অনেকগুলি ধারার মধ্যে সমন্বয়-সাধন করতে পারতেন। রাজীবের সে সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। রাজীব গান্ধীর কাজকর্মের মধ্যে যে অস্থিরতা লক্ষ্য করা যায়, তার জন্যেও খোশামুদে-তোষামুদে ছাড়া তাঁর কাছে কেউ এগোতে চান না।

প্রধানমন্ত্রীত্বের ৩৭ মাসে রাজীব গান্ধী মোট এগারবার তাঁর মন্ত্রিসভায় রদবদল ঘটালেন। প্রধানমন্ত্রী হয়ে প্রথমে ঘোষণা করেছিলেন, তিনি ছোট মন্ত্রিসভার পক্ষে। কারণ তা'তে নাকি কাজ করতে সুবিধে হয়। এখন দেখা যাচ্ছে, তিনিই সবচেয়ে বড় মন্ত্রিসভা করলেন! মন্ত্রীর সংখ্যা ৬০। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা সারকারিয়া কমিশন গঠন করলেন। কিন্তু দেখা গেল, সম্প্রতি ছ'টি রাজ্যে ছ'জন রাজ্যপাল নিয়োগ করার ক্ষেত্রে সেই সারকারিয়া কমিশনের সুপারিশ মানা হল না! ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করে পরিস্থিতি এমন একটি জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে, কংগ্রেস দলতো বটেই মন্ত্রিসভা গঠন এবং



রদবদল যেন একটি ঘরোয়া ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। দলীয় নেতৃত্বের স্বাভাবিক বিকাশ তো অসম্ভব ব্যাপার। হাইকম্যান্ডের নামে কথায় কথায় মুখ্যমন্ত্রীদের পর্যন্ত সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ঐ হাইকম্যান্ডের নির্দেশে মধ্যপ্রদেশ, বিহার, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রীদের বারেবারে পদত্যাগ করতে হয়েছে।

এতো গেল দলের হাল। এর উপর-প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও এখন রাজীব গান্ধীর বেহাল অবস্থা। বিশেষ করে সচিব পর্যায়ের আমলাদের সংগে রাজীব গান্ধীর সম্পর্ক এখন খুবই তিক্ত। তিরিক্ষি মেজাজ দেখিয়ে তিনি অনেককেই চটিয়েছেন। দিল্লিতে এমন ঘটনার কথাও শোনা যায়, গাড়ি পছন্দ হয়নি বলেই অপমানিত হতে হয়েছে আন্দামানের একজন ডেপুটি ডিরেকটর পর্যায়ের অফিসারকে। তিনি যে গাড়ি রেখেছিলেন তার রঙ প্রধানমন্ত্রীর পছন্দ নয়। গত বছর ৯ জানুয়ারি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দফতরের সংসদীয় পরামর্শদাতা কমিটির এক বৈঠকে অপমানিত হন বিভাগীয় দুই সচিব দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সি এস শাস্ত্রী। আই এ এস মহলে এঁরা দুজনই খুব সম্মানিত। দক্ষ এবং সৎ অফিসার বলেই পরিচিত। প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী এঁদের অপমান করেছেন অহেতুক। ফলে সচিব পর্যায়ের অফিসাররা খুবই ক্ষুব্ধ। রাজীব জমানার সংগে তাল মিলিয়ে থাকতে না পারায় কাজে ইস্তফা দিয়েছেন প্রাক্তন ক্যাবিনেট সচিব পি কে কল এবং পলিসি প্ল্যানিং কমিটির চেয়ারম্যান জি পার্থসারথি। এরপরে আরও নক্কারজনক ঘটনা ঘটে ভারতের বিদেশ সচিবকে কেন্দ্র করে। গত বছর ২০ জানুয়ারি এক সাংবাদিক বৈঠকে প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলে বসলেন, শীঘ্রই নতুন বিদেশ সচিব দেখতে পাবেন। ফলে আর কাল-বিলম্ব না করেই পদত্যাগ করেন বিদেশ সচিব শ্রী বেংকটশরণ। দিল্লিতে একটি অগ্নিকান্ডের পরে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছোতে না পারায় প্রকাশ্যে ভর্ৎসিত হয়েছেন পুলিশ কমিশনার। অজ্ঞাত কারণেই হেনস্থা হতে হয়েছে দিল্লির লেঃ গভর্ণর এম এম কে ওয়ালিকে। প্ল্যানিং কমিশনের একজন ডেপুটি চেয়ারম্যানকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করানো হয় বলেও অভিযোগ আছে।

অপর দিকে অভিযোগ, প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের কর্তাদের হাতে মাত্রাতিরিক্ত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। প্রশ্রয়ও পাচ্ছেন তাঁরা। দিল্লিতে একটা রসিকতা চালু আছে, প্রধানমন্ত্রীকে কোন জিনিস বোঝাতে হলে 'You have got to take Gopi Aroras thoughts and put them into Moni Sankar Aiyar's mouth' সচিবালয়ে ঐ দুই সচিব গোপি অরোরা এবং মণিশংকর আয়ার এক সময় প্রধানমন্ত্রীর চোখ-কান ছিলেন। আয়ার এখনও অবশ্য রয়েছেন কিন্তু বিদায় নিতে হয়েছে গোপি অরোরাকে। যেমন কিছুদিন আগে এই অসীম ক্ষমতার কেন্দ্রভূমি থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে এস এল ফতেদারকে। মন্ত্রী করা হলেও তাঁর মনে তেমন শান্তি নেই। কারণ প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের কোন কর্তাব্যক্তির ক্ষমতা মন্ত্রিসভার যে কোন সদস্যের চেয়ে অনেক বেশি।

ইন্দিরা গান্ধীর জমানায়ও প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের কর্তাব্যক্তিদের ক্ষমতা কম ছিল না। কিন্ত এমনভাবে তা প্রকাশ্যে আসতে পারেনি। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আব্রু থাকতো। কিন্তু রাজীবের আমলে সেই আব্রুটুকু নেই। পুরোপুরি সচিবালয়-নির্ভর রাজনীতি মূল কংগ্রেস সংগঠনকেই আজ বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলে দিয়েছে।

প্রয়াত কংগ্রেস নেতা অতুল্য ঘোষ বলতেন, পন্ডিত জওহরলাল নেহরু গণতন্ত্রে বিশ্বাস করতেন। কিন্তু তাঁর গণতন্ত্রের একটা ধরন ছিল। তিনি যা বিশ্বাস করতেন তা সকলকেই বিশ্বাস করাতে পারতেন। সবাই মেনেও নিতেন।

ইন্দিরা গান্ধী ছিলেন আরও বেশি বাস্তববাদী। তিনি সাধারণ মানুষের মনের কথা ভাল বুঝতেন। তাই তিনি ছিলেন অনেক বেশি জনপ্রিয়। ফলে তাঁর জনপ্রিয়তাই তাঁকে সকলের উপর আধিপত্য বিস্তারে সহায়ক হয়েছে। রাজীব গান্ধীর গণতন্ত্রের ধ্যান ধারণা এখনও স্পষ্ট নয়। □

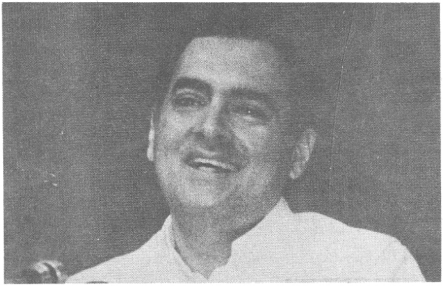
বিমল নন্দী

গৃহনীতিই বিপদ ঘটাতে পারে ঃ হীরেন মুখোপাধ্যায়

রাজীব গান্ধীর মতিগতি আর তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের কাণ্ডকারখানা এমনই বিচিত্র যে তাঁদের সম্বন্ধে যুক্তিগ্রাহ্য কোন মতামত প্রকাশ করাই কঠিন ব্যাপার। সেখানে নীতির বালাই নেই, সেখানে ক্ষমতায় জাঁকিয়ে রয়েছে যারা, তারা কখন যে কোন অপকর্ম করে বসবে, এই হল সাধারণ সুবুদ্ধি মানুষের ভাবনা। টেবিলের ওপর একটা বিড়াল লাফিয়ে বসলে কোন দিকে যে সেটা নামবে তা স্বয়ং ভগবানও বলতে পারেন না। রাজীব-এর ধ্যান-ধারণা এটা মনে করিয়ে দেয় বলেই এত মুশকিল।

বাঁচোয়া এই যে অন্তত আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিষয়ে রাজীব এখনও মারাত্মক কিছু ভুল করে বসেননি। নীতিগত দিক থেকে তাঁর বোধশক্তি কতটা তা নিয়ে জল্পনা না করে অন্তত একটা ব্যাপারে খুশি হওয়া যায় যে সোভিয়েত এবং অন্যান্য অগ্রগামী দেশের সঙ্গে বন্ধুতার ধারা তিনি ভাঙেননি। তাঁর দুর্বলতা অবশ্য নানা দিক থেকে প্রকট। মাঝে মাঝে সমাজতন্ত্রের বুকনি আওড়ালেও রাজীব আর তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গরা (এঁরাই দেশের কর্তা আজ) সমাজবাদের ধারেকাছে যান না। পশ্চিমী শক্তিপুঞ্জের প্রতিই এদের টান। অর্থনীতিকে ঢেলে সাজাবার মতলব তাঁর নেই। এমন অবস্থায় বিপদ সর্বদাই থাকে যে বৈদেশিক ব্যাপারেও আজকের মোটামুটি প্রগতিশীল কর্মধারা ভারত বদলাতেও পারে। তাই দরকার দেশের জনশক্তির হুঁশিয়ার থাকা। দুঃখের বিষয় সোসালিস্ট চিন্তার ধারক ও বাহক বামপন্থীরাও এদিক দিয়ে খুব অবহিত নয়।

খুঁটিনাটি আলোচনা স্বল্প পরিসরে সম্ভব নয়। তবে একটা ব্যাপারে সন্দেহ নেই যে রাজীব জমানার উপর নির্ভর করা হবে প্রচণ্ড বোকামি। সেজন্যই দরকার প্রকৃত বামপন্থীর সচেতন প্রয়াস। এ পর্যন্ত যে রাজীব পশ্চিমী নয়া-সাম্রাজ্যবাদের কাছে মাথা নোয়াননি, তার মূল হেতু হল যে, আমাদের দেশের একটা পরম্পরা তৈরি হয়েছে। বামপন্থার অজস্র ত্রুটি ও দুর্বলতা সত্ত্বেও দেশের সাধারণ মানুষ বুঝে গিয়েছেন যে দেশের স্বাধীনতার সঙ্গে সোস্যালিজম-এর সম্পর্ক একেবারে আত্মীয়ের মতো। সোভিয়েতের মতো দেশ যে আমাদের বন্ধু হয়ে কাজ করে আসছে বহুদিন ধরে, এটা স্বতঃসিদ্ধ। মোরারজি দেশাই-এর মতো নেতাও ইচ্ছা সত্ত্বেও সোভিয়েতের সঙ্গে বন্ধুত্বকে অগ্রাহ্য করতে পারেননি। অটল বিহারী বাজপেয়ী পররাষ্ট্রমন্ত্রীরূপে প্রকাশ্যে সোভিয়েত-বিরোধিতা করতে পারেননি। হয়তো বা মনে মনে সোভিয়েত ভূমিকার তারিফও করেছিলেন। মস্কোতে বসে কবিতাও লিখেছিলেন সোভিয়েত বিষয়ে। মা ইন্দিরা আর মাতামহ জওয়াহরলালের নাম ভাঙিয়ে রাজীবের মূলধন – সে কেমন করে চটজলদি এদেশের বহুদিনের নীতি বদলাবে।



রাজনীতি যদি 'নীতি' – বিবর্জিত হতে থাকে – যা দিনের পর দিন হতে চলেছে – তাহলেই অবশ্য বিপদ ঘনিয়ে আসবে। রাজীব সরকারের দৌরাত্ম্য সয়ে যাবার কোন যুক্তি নেই। কিন্তু মুশকিল এই যে, রাজীবকে হটাবার আক্রোশে যদি আজ ফার্নাণ্ডেজ, বিজু পট্টনায়ক, সুব্রহ্মণ্য স্বামী ধরনের ধুরন্ধরদের সঙ্গে হাত মিলাতে হয় তাহলে কোথাকার জল কোথায় গড়াবে ঠিক নেই। 'চৈতন্যরথে' চড়ে 'ভক্ত'-দের পাদোদক (ডাবের জলে পা ধোয়া!) বিলিয়ে এন টি রামারাও কিম্বা দেবীলালের মতো ব্যক্তি আজ সারাদেশে হাততালি কুড়োচ্ছেন। এহেন নীতিহীনদের নিয়ে 'রাজীব-নিধন' সম্ভব কিনা জানি না কিন্ত দেশজোড়া প্রতিক্রিয়াকে ঠেকানো যাবে না।

বাঁচোয়া এই যে বৈদেশিক ব্যাপারে রাজীবের দুর্মতি এখনও ফুটে ওঠেনি। কিন্তু তা ফুটতে পারে রাজীবের বর্তমান আভ্যন্তরীণ নীতিরই ফলে। এজন্যই বলি, বামপন্থীরা সাবধান থাকুন।

শ্রীলঙ্কায় আই পি কে এফ

শ্রীলঙ্কায় শান্তি বাহিনী (আই পি কে এফ) পাঠানর ব্যাপারে প্রথমে রাজীবকে সকলেই সাধুবাদ জানিয়েছিলেন। কিন্তু আজকের পরিপ্রেক্ষিত অনেকটা পাল্টেছে। ভারতীয় সেনাদের সঙ্গে শ্রীলঙ্কার তামিল-ভাইদের সম্মুখ সমর এখন। তাই অনেকেই আগের মত পাল্টে বলছেন, রাজীব ভুল করেছেন। দাবার চালে জয়বর্ধনে মাত করেছে। আমি বলি, না, রাজীব ঠিকই করেছেন ভারত-শ্রীলঙ্কা চুক্তি স্বাক্ষর করে। এর ফলাফল ভারতের পক্ষে তথা বিশ্ব রাজনীতির ক্ষেত্রে কতটা মঙ্গলদায়ক হবে, ভবিষ্যৎই তার সাক্ষ্য দেবে, একথা আমি হলফ করে বলতে পারি।

বর্ণনীতি ও ক্রিকেট

সাম্প্রতিককালে ভারতবর্ষের বিদেশনীতি ভয়ানকভাবে ধাক্কা খেয়েছে ইংরেজদের উদ্ধত মনোভাবের কাছে। গৃচ, ল্যাম্ব, এম্বুরি – এঁদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধেই দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে সম্পর্ক রাখার অভিযোগ ছিল রাষ্ট্রসংঘের নিয়ম অনুযায়ী, এই ধরনের খেলোয়াড়েরা, লিখিতভাবে দুঃখ প্রকাশ না করলে কোনরকম স্বীকৃত টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। অথচ এসব ছাড়াই অভিযুক্ত খেলোয়াড়েরা দিব্যি খেলে গেল রিলায়েন্স কাপে। কারণ ইংরেজরা হুমকি দিল, ভারত যদি এখন এসব ফ্যাকড়া তোলে, তাহলে ইংলণ্ড রিলায়েন্স কাপ বয়কট করবে। দুঃখের কথা, ভারত এই হুমকিতে ইংল্যাণ্ডের কাছে মাথা নোয়াল, মাথা নোয়াল বর্ণবিদ্বেষীদের কাছে। এ লজ্জা আমরা ঢাকব কীভাবে। অনেকে মনে করতে পারেন, আমি ক্রিকেট-বিদ্বেষী। মোটেই নয়। বরং একজন ক্রিকেট অনুরাগী হওয়ার জন্যই আমাকে বিস্তর টিকাটিপ্পনি সইতে হয়েছে লণ্ডনে থাকাকালীন। কিন্তু এটা একটা নীতির প্রশ্ন। আর এই নীতি নিয়ম জলাঞ্জলি দিয়ে ভারত এভাবে বর্ণবিদ্বেষ-নীতির কাছে মাথা নোয়াল শুধুমাত্র রিলায়েন্স কাপকে সফল করার জন্য – এটা অত্যন্ত লজ্জার। □

সাক্ষাৎকার ঃ অরুণাভ দাস

বহির্বঙ্গের ছেলে-মেয়েদের বিয়ের সমস্যা

এখন বিয়ের মরশুম। চারিদিকে সানাই বাজছে। কিন্তু বহির্বঙ্গের বাঙালি অভিভাবকদের কাছে তাঁদের ছেলে-মেয়েদের বিয়ে দেওয়া একটা বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বঙ্গ ও বহির্বঙ্গ – দুটি স্থানের সমাজ-ব্যবস্থা দুরকম। বঙ্গে বাঙালিরা বসবাস করেন, অবাঙালিরা সেখানে সংখ্যালঘু। তাঁদের সমস্যা বঙ্গের বাঙালিদের সমস্যার চেয়ে আকারে ও প্রকারে ভিন্নতর। বহির্বঙ্গে বাঙালিরা অবাঙালি রাজ্যে ভিন্ন পরিবেশে, বহু সমস্যা বুকে নিয়ে সংখ্যালঘুর জীবনযাত্রা নির্বাহ করেন। কোথাও কোথাও তাঁরা কিছু কিছু সমস্যার সমাধান করতে পারলেও প্রয়োজনের তুলনায় তা অপ্রতুল। বহির্বঙ্গে বাঙালিদের বসবাস শুরু হয়েছে শতাধিক বছর আগে থেকে। প্রথমে তাঁরা ছিলেন সংখ্যায় অল্প সরকারি বড় বড় পদে আসীন ছিলেন। সমাজে খ্যাতি ছিল। দেশের বাড়ির সঙ্গে যাতায়াত ছিল। বসবাস করা বা ছেলে-মেয়েদের বিয়ে দেওয়া তখন বহির্বঙ্গের বাঙালিদের সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়নি। যুগ পালটে গেছে। দেশ ভাগের কবলে পড়ে হাজার হাজার বাঙালি ঘরছাড়া হয়ে বহির্বঙ্গে চলে এলেন। এখন প্রায় ১ কোটির মত বাঙালি সমগ্র বহির্বঙ্গে বসবাস করছেন। উদ্বাস্তু ও নিম্নমধ্যবিত্ত-দের সংখ্যাই বেশি। দিন-আনা-দিন খাওয়া, কোনভাবে টিকে থাকা। এই টিকে থাকতে থাকতে প্রায় প্রতি প্রদেশে হাজার হাজার বাঙালি বহির্বঙ্গে স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে পড়েছেন। ক্লাব, থিয়েটার, কালীমন্দির, বাঙালি সমিতি, স্কুল গড়েতুলেছেন। ঘরে ফেরার রাস্তা অনেকের বন্ধ হয়ে গেছে। এদিকে ছেলে-মেয়ের জন্ম এবং ভিন্ন সম্প্রদায়ের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে বেড়ে ওঠা বাঙালি ছেলে-মেয়েরা নিজেদের বাঙালিত্ব ভুলতে বসেছেন, অথচ স্থানীয় পরিবেশ ও পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারছেন না অনেক ক্ষেত্রে। ফলে এক মিশ্র বাঙালি সম্প্রদায় নিজেদের অলক্ষ্যে গড়ে উঠেছে। যাঁদের চলনে-বলনে, শিক্ষা আর আদর্শে বাঙালিয়ানার ছাপ অত্যন্ত অল্প অথচ তাঁদের পরিচয় তাঁরা বাঙালি। এইভাবে বেড়ে ওঠা ছেলে-মেয়েদের বিয়ের সমস্যা স্বভাবতই ভাবিয়ে তুলেছে বাপ-মায়েদের। পশ্চিমবঙ্গে মানুষ হওয়া ছেলে-মেয়েদের চাল-চলনের সঙ্গে বহির্বঙ্গে বেড়ে ওঠা ছেলে-মেয়েদের মধ্যে আদব-কায়দায় প্রচুর তফাৎ পরিলক্ষিত হচ্ছে। এটা কারো দোষ নয়। এটা স্বাভাবিক রীতি। পরিবেশের রীতি। কিন্তু এর বিষময় ফলে দেখা দিয়েছে বিয়ের ক্ষেত্রে। বহির্বঙ্গে বেড়ে ওঠা অনর্গল হিন্দি বলা, হিন্দি কালচারে অভ্যস্ত ছেলে-মেয়েদের পুত্রবধূ অথবা জামাই করে ঘরে আনতে বঙ্গবাসী পরিবারে মানসিক আপত্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আবার একেবারে নির্ভেজাল বঙ্গললনা অথবা ধুতি-পাঞ্জাবি পরিহিত জামাই অত্যন্ত বেমানান বহির্বঙ্গের কস্মোপলিটন পরিবেশের শ্বশুড়বাড়িতে। উভয়বঙ্গের ছেলে-মেয়েরা তাই একে অপরকে সহ্য করতে পারছেন না। 'ওসব ভেতো বাঙালিপনা চলবে না' অথবা 'কী সব খোট্টার মত হিন্দি বল' – এই জাতীয় উক্তি এবং কটূক্তির অভাব নেই। বহির্বঙ্গের একাধিক ছেলে-মেয়ের বঙ্গে বিয়ে হয়ে যেমন অনেকে সুখী হতে পারেননি, সেরকম বঙ্গের একাধিক ছেলে-মেয়ে অসুখী জীবন যাপন করছেন বহির্বঙ্গের পরিবারে বিয়ে করে। মানিয়ে নেবার নীতি এখানে খুব বেশি কাজে লাগে না। তাই বাঙালি ঘরে অবাঙালি গৃহবধূর এবং জামাই-এর প্রবেশ ঘটছে বেশি। বহির্বঙ্গে মানুষ হওয়া ছেলে-মেয়েদের যেমন মাতৃভাষার চর্চার সুযোগ করে দেওয়া এবং কৃষ্টি সম্বন্ধে কিছু কিছু জ্ঞান অভিভাবকদের দিয়ে দেওয়া দরকার, ঠিক তেমনই বঙ্গে বেড়ে ওঠা ছেলে-মেয়েদের মধ্যে বহির্বঙ্গের আবহাওয়ার কিছু কিছু পরিচয়ও দেওয়া প্রয়োজন। তাই আমার মনে হয় বহির্বঙ্গের ছেলে-মেয়েদের বহির্বঙ্গের মধ্যেই বিয়ে দেবার ব্যবস্থা করা দরকার। এই ব্যাপারে উদ্যোগ নিতে হবে স্থানীয় পত্র-পত্রিকা, বাঙালি সমিতি, কালীবাড়ি ইত্যাদি জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানগুলিকে। সুখের কথা, বহির্বঙ্গের কোন কোন স্থানে কিছু ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এই কাজ শুরু করে দিয়েছেন। □

নারায়ণ সেনগুপ্ত

কর বাড়লে ফাঁকিও বাড়বে-
বললেন আই এম এফ উপদেষ্টা মুটেন

বেছে বেছে কয়েকটি জিনিসের ওপর ক্রমাগত অপ্রত্যক্ষ কর চাপালে তাতে রাজস্ব আয় কমে বই বাড়ে না। ভারতের মতন উন্নয়নশীল দেশের পক্ষে ক্রমাগত বিশেষ কয়েকটি জিনিসের ওপর করের বোঝা না চাপিয়ে বরং বেশি সংখ্যক জিনিসের ওপর কম হারে কর ধার্য করলেই ভালো হতো। এতে কর দেওয়ার প্রবণতা যেমন বাড়ে তেমনি রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য আসার সম্ভাবনা থাকে।

ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফান্ড বা আন্তর্জাতিক অর্থ ভান্ডারের প্রবীণ অর্থনৈতিক পরামর্শদাতা অধ্যাপক লিফ মুটেন এই মত পোষণ করেন। মুটেন সম্প্রতি কলকাতায় এসেছিলেন এক বণিক সভার আমন্ত্রণে। ভারতের মতন উন্নয়নশীল দেশের করের বোঝা কী রকম হওয়া উচিত সেই বিষয়ে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় তিনি এই মন্তব্য করেন।

মুটেনের ধারণা নির্দিষ্ট কতগুলি ক্ষেত্রে করের বোঝা না চাপিয়ে যদি নিত্য ব্যবহার্য সব জিনিসের ওপরই কম হারে কর ধার্য হয় তাহলে লোকে সে ট্যাক্স দিতে পিছপা হয় না। আর সেটা যদি অপ্রত্যক্ষ কর হয় তাহলে গায়ে আঁচও লাগে না।

মুটেনের অভিযোগ ছিল যে, ক্রমাগত প্রত্যক্ষ করের বদলে অপ্রত্যক্ষ করের প্রবণতা খুবই বেড়ে যাচ্ছে। ১৯৫০-৫১ সালের তুলনায় গত ৩৭ বছরে দেশের ধার্য করের হার প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রে বেড়েছে ৩৭ বার। আর পাশাপাশি অপ্রত্যক্ষ করের হার বেড়েছে ১৩২ বার। ৫০-৫১ সালে যেখানে অপ্রত্যক্ষ কর ধার্য হত শতকরা ৫৬ ভাগ, ১৯৮৭ সালে তা দাঁড়িয়েছে শতকরা প্রায় ৮২.৫ ভাগ। অন্যদিকে প্রত্যক্ষ কর বরং কমেছে ৪৩ শতাংশ থেকে শতকরা ১৭ শতাংশ।

অধ্যাপক মুটেন অবশ্য উন্নয়নশীল দেশের কর ধার্যের ব্যবস্থাটির সমালোচনা করেছেন। তাঁর মতে একটি শক্তিশালী অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য চাই শক্তিশালী আর্থিক নীতি। দেখতে হবে রাজস্ব বাড়াতে গিয়ে যেন রাজস্ব আদায়ের খরচটা বেশি না হয়ে যায়। অনেক সময়েই দেখা যায় যে, কর আদায় হয়তো ভালো হলো, কিন্তু সেই কর আদায় করতে গিয়ে আদায়ের খরচ দাঁড়াল আকাশছোঁয়া। তাই যদি ঘটে তাহলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কী করে সম্ভব?

অধ্যাপক মুটেন আলোচনা প্রসঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করনীতির ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর মতে শতকরা ৬৫ থেকে ৮৫ ভাগ হারে কর ধার্য হলে লোকে কর ফাঁকি দেবার চেষ্টা করবেই। তার বদলে যদি শতকরা ৫০ ভাগ কর ধার্য হয়। তাহলে লোকে বেশি কর দেবে।

মুটেন সমালোচন করেছেন কয়েকটি দেশের। যাঁরা একদিকে মোটা কর আদায়ের জন্য বাজেটে কর চাপাচ্ছেন আবার উদার শিল্পনীতির ফলে বিভিন্ন ভরতুকি দেবার ব্যবস্থাও পাশাপাশি করছেন। এটা সম্পূর্ণ **বিপরীত ধর্মী ব্যবস্থা। এর ফলে আর্থিক** উন্নয়নে কিছু ফাঁক সৃষ্টি হয়ে যায়। বরং এর চেয়ে শিল্পনীতি পরিবর্তন করে কর্পোরেট ট্যাক্সের হার কমানো উচিত। এটা ভরতুকি বা অনুদান দেওয়া থেকে ভাল ব্যবস্থা। অবশ্য তিনি একেবারে ভরতুকি বন্ধ করতে বলেননি, তবে সেটা বুঝে-শুনেই করা উচিত। একেবারে অপারগ অবস্থার নিতান্ত প্রয়োজনেই ভরতুকি দেওয়া উচিত। মুটেন কোনওভাবেই বিশ্বাস করেন না যে, ভরতুকি দিলেই শিল্প উন্নতি সম্ভব।

অধ্যাপক মুটেন কৃষির উপর সম্পূর্ণ কর প্রত্যাহার সুপারিশ করেননি, তবে অবশ্য কম হারে করের সুপারিশ করেছেন।

কেন্দ্র বা রাজ্যে ক্রমাগত ঘাটতি বাজেট করার প্রবণতা যে খুব একটা ভাল নয় সে সম্পর্কে তিনি মত প্রকাশ করেন। তাঁর মতে যে সব দেশে অর্থ বিনিয়োগ বা অর্থ সঞ্চয়ের প্রবণতা আছে সে সব দেশে ঘাটতি বাজেট হলেও আর্থিক ভারসাম্য নষ্ট হয় না। যেমন জাপান, কিন্তু অন্য দেশে বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশে ঘাটতি বাজেটের প্রবণতা ভাল নয়। এতে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিতে পারে। তাঁর মতে এক আধবার ঘাটতি বাজেট হয়তো অবশ্যম্ভাবী কিন্তু বারবার সেটা করলে তার ফল বিপরীত হতে বাধ্য।

অধ্যাপক মুটেন সরকারি পরিচালনাধীন সংস্থাগুলির একচেটিয়া ব্যবসায়ের প্রবণতার সমালোচনা করে বলেন এর ফলে দেশে আর্থিক প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। একচেটিয়া ব্যবস্থায় এই সব সংস্থা যেমন টেলিফোন, বিদ্যুৎ প্রভৃতিতে ক্রমাগত দাম বাড়তে পারে। বিশ্বব্যাংক এই ধরনের প্রবণতা বেশ কিছু দেশে দেখেছে। ভারতেও সরকারি পরিচালিত শিল্পে মূল্যবৃদ্ধির হার যথেষ্ট বেশি। এটা নিয়ন্ত্রণে থাকা জরুরি।



অধ্যাপক **লিফ মুটেন**

মুটেন অবশ্য স্বীকার করেন যে, উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় আজকাল বহু উন্নত দেশে করের হার বেশি। অবশ্য তাতে ওই সব দেশে রাজস্ব আদায়ে তেমন হেরফের হয়নি। অবশ্য দেশের জাতীয় বাজেটে কর চাপবে কিনা তার অনেকটাই রাজনৈতিক কারণের উপর নির্ভরশীল।

যে দল প্রশাসন পরিচালনা করছেন তাদের নীতির উপর কর ব্যবস্থার হেরফের হয়, অনেকক্ষেত্রে ইচ্ছা করলেও সেই সরকার বা দল আর্থিক নীতিটা বদলাতে পারেন না। □

অমলেন্দু কুণ্ডু



রতিরঙ্গবিলাসিনী দেবদাসী

হাজার হাজার বছরের প্রাচীন দেবদাসী প্রথা নিয়ে বেশ কিছুকাল ধরেই তুলকালাম আন্দোলন চলেছে। প্রাচীনতম এই প্রথার পিছনে শুদ্ধ আধ্যাত্মিক চেতনার স্ফুরণ ছিল। কিন্তু কালের নিয়মে শুদ্ধ রতিরঙ্গ পঙ্কিল কামবিলাসের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। অথচ ওই সর্বকলানিপুণা দেবদাসীদের মাধ্যমেই আমরা পেয়েছি অপূর্ব সব নৃত্যমাধুর্য – কুচিপুডি, ভরতনাট্যম, কথাকলি – এমন অনেক।

এইসব নিয়েই রচিত হয়েছে আজকের প্রচ্ছদ নিবন্ধ রতিরঙ্গবিলাসিনী দেবদাসী। লিখেছেন মুকুল গুহ।

'সৃতনুকা নামে আমি দেবদাসী। আমি বারাণসীবাসী তরুণ শিল্পীচূড়ামণি দেবদিন্নকে ভালবেসেছিলাম–'এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত এই কামনাজর্জর স্বীকারোক্তির উল্লেখই ভারতে দেবদাসীদের প্রথম ইতিহাস। খৃষ্টজন্মের ৩ শতক আগের এই মহার্ঘ শিলালিপিতে সৃতনুকার সেই করুণ আক্ষেপের ঠিক পূর্বখিলানেই রয়েছে মৌর্যযুগের প্রচলিত লিপিতে খোদিত আরও করুণ আরও নিমগ্ন মর্মবাণী–'রিরংসায় জর্জারিতা ওই দেবদাসীও নারী, মানবী। সেও বিলিয়ে দিতে চায় নিজেকে গভীর প্রেমে, নিরবচ্ছিন্ন ভালবাসায়।'

প্রাচীন এইসব শিলালিপি পাওয়া গেছে মধ্যপ্রদেশের রামগড় পর্বতের যোগীমারা আর সীতাবেডা গুহায়। সেখানকার ৬টি গুহাই হিন্দুমন্দির, তবে বুদ্ধপ্রভাব যেন রয়েছে মনে হয়। আর গুহাগুলি রঙ্গমঞ্চের

আদলে তৈরি। সুতনুকা ছাড়াও ওই প্রাচীন গৃহগাত্রে খোদিত শিলালিপিতে উল্লেখ রয়েছে গৃহাভিনেত্রী (লেনাশোভিকা) দন্দাও তাঁর কন্যা নন্দার কথা। সুতনুকা প্রেম কিংবদন্তি হয়ে আজও মানুষকে যেমন বিহ্বল করে। তেমনি তার আকৃতিতে কষ্ট পায় মানুষ।

কিন্তু মন্দিরে কেন? মনে হয় রঙ্গমঞ্চ ধীরে ধীরে গৃহমঞ্চ থেকে মন্দিরের নাটমঞ্চে স্থানান্তরিত হয়েছিল। আর তার পর থেকেই মন্দিরসংলগ্ন নাটমঞ্চই হয়ে উঠেছিল দেবসম্মুখে নৃত্যগীত ও অভিনয় অনুষ্ঠানের নির্বাচিত স্থান। ক্রমশ ওই দেবদাসী নৃত্যগীত একান্তভাবেই মন্দিরের সম্পত্তি বলে চিহ্নিত হতে থাকে, অবশ্যই সসম্মানে। পুরুরবার ঔরসজাত সন্তান উর্বশীর গর্ভজাত হলেও সমাজে সগৌরবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। বোঝা যায় যে, সেসময়ে বিশ্বাস ছিল দেবদাসীরা দেবমূর্তির স্ত্রীরূপ, তাই তাঁদের সন্তানও সমাজে স্বীকৃতি পেয়েছিল।

মনে রাখা দরকার যে, যেমন গণিকামাত্রেই দেবদাসী নয়, তেমনি দেবদাসীমাত্রেই কিন্তু গণিকা নয়। শূদ্রকের মৃচ্ছকটিকে যে বসন্তসেনা, বুদ্ধযুগের জনপদ কল্যাণী বা স্মানবতী অথবা রাজা বিম্বিসারের প্রণয়িণী আম্রপালী সকলেই গণিকা কিন্তু দেবদাসী নয়। কারণ দেবদাসীদের রূপ ও গুণ ছিল ভিন্ন মাত্রার। অনেকেরই গণিকা হওয়া সম্ভব হলেও দেবদাসী হওয়া সহজ ছিল না।

এক অদ্ভুত গঠন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে নির্বাচিত হত কে হবে রাজগণিকা। কে হবে রুদ্রগণিকা। মন্দিরে কিশোরীদের কঠোর পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে নৃত্য, গীত, বাদ্য ও অভিনয় শিখতে হত। যৌবন আসার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণপণ পরিশ্রমে অধিগত শিক্ষার পরীক্ষা দিতে হত তাঁদের। পরীক্ষা হত নাটমন্দিরে দেবতার সামনে, উপস্থিত থাকতেন রাজা, পুরোহিত ও রসিকসমাজ। তাঁরাই নির্বাচন করে বলে দিতেন পরীক্ষার্থিনীদের মধ্যে কে হবে রাজগণিকা কে রুদ্রগণিকা। যাঁরা রাজ গণিকা বলে চিহ্নিত হতেন তাদের গল্প ভিন্নতর। আর যারা রুদ্রগণিকা হিসেবে মনোনীত হলেন তাঁরাই হবেন দেবদাসী। তাঁদের মর্যাদা ছিল ভিন্ন অন্যান্য দাসদাসীদের চেয়ে ভিন্ন, এমনকি সুশিক্ষিতা, গৃহবধূদের চাইতেও তাদের মর্যাদা অনেক উঁচুতে স্থান পেত। কারণ তাঁরা তো ঈশ্বরের স্ত্রী। শিল্পী হিসেবে তাঁরা ছিলেন তুলনাহীনা, তখন এমনকি রাজারও সাহস বা ক্ষমতা ছিল না তাঁদের প্রতি কামাতুর দৃষ্টিতে তাকাতে। সে অধিকার হয়তো ছিল কেবলমাত্র প্রধান পুরোহিতের। দেবদাসী প্রথা ওই রুদ্রগণিকাদের নিয়ে সমাজে চালিত হয়ে গেল, তাঁদের কাছ থেকেই আমরা পেয়েছি সারা পৃথিবীতে মুগ্ধ করে দেওয়ার মত নৃত্যমাত্রা। কুচিপুড়ি, ভ রতনাট্যম, মোহিনী-আট্টম, কথাকলি এবং আরও অনেক কিছু।

রঙ্গসেবা, অঙ্গসেবা

ওই দেবদাসীরা ছিল দুটি পৃথক পর্যায়ের। প্রথমটি ছিল রঙ্গভোগের দেবদাসী। দ্বিতীয়টি অঙ্গভোগের দেবদাসী। রঙ্গভোগের জন্য নির্বাচিত দেবদাসীদের কর্তব্য ছিল দেবতার মনোরঞ্জন। নৃত্যগীত অভিনয় দিয়ে দেবতার মনোরঞ্জনকারিণী। আর অঙ্গভোগের জন্য মনোনীত দেবদাসীদের কর্তব্য ছিল দেবমূর্তির অঙ্গসেবা করার। অঙ্গভোগ দেবদাসীরা ছিল কিছুটা ভৃত্যাস্থানীয়া। কালে কালে দেবমূর্তির ভৃত্যা পুরোহিতদের ভৃত্যায় রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল। দেবতার অঙ্গসেবার সঙ্গে সঙ্গে পুরোহিতদের অঙ্গসেবা করার দায়ও তাঁদের নিতে হত।

কিন্তু কোথা থেকে আগত মন্দিরে এইসব দেবদাসীরা। ইতিহাস ঘাঁটলে খুঁজে পাওয়া যায় যে সমাজের প্রায় সবশ্রেণী থেকেই আসত তারা বা আনা হত তাদের। কীভাবে আসত তাঁরা তারও বিশদ বর্ণনা রয়েছে:

১। দত্তা– প্রণ্যলোভী পিতামাতা স্বেচ্ছায় মন্দিরে তাঁদের কন্যাকে দান করার পর।

২। হৃতা-রাজা জয় বা যুদ্ধের পরে হরণ করা কন্যাদের মন্দিরে দান করার পর।

৩। বিক্রীতা– মন্দির কর্তৃপক্ষের কাছে বিক্রি করা হত যেসব মেয়েদের। সম্ভবত দারিদ্র্য কিংবা অত্যাচারে নিরুপায় হয়ে বিক্রি করা হত তাঁদের।

৪। ভৃত্যা–স্বেচ্ছায় মন্দিরবাসিনী হয়ে ভৃত্যারূপে কাজ করতে আসত যারা।

৫। ভক্তা–স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণকারিণী সন্ন্যাসিনী, মীরাবাঈ ছিলেন এমন দেবদাসী।

৬। অলংকারা–মন্দিরে অর্পিতা সালঙ্কারা নৃত্যগীত পটিয়সী রাজকন্যারা অনেকেই এভাবে দেবদাসী হতেন।

৭। গোপিকা–নির্দিষ্ট সময়ে নাচগান করার জন্য নিয়োজিত বেতনভোগিনা কলাবিদ্যানিপুণা নারী।

সুতনুকার ইতিহাসখৃস্টপূর্ব২/৩ শতকের হলেও ভারতে দেবদাসী প্রথা অবশ্যই আরও হাজার বছরের প্রাচীন। পুরাণের অপ্সরার ওই দেবদাসী প্রথারই ইঙ্গিত বহন করে।

দুই প্রধান ক্ষমতা রাজা এবং পুরোহিতদের শরীরসংলগ্না থাকার ফলে দেবদাসীদের ক্ষমতা ও সম্মান ছিল সমাজে অনেক উঁচুতেই। তাছাড়া যেহেতু তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন সুন্দরী রতিবিলাসিনী এবং জৈনদের ৭২ কলা না হলেও বাৎস্যায়নের ৬৪ কলায় পারদর্শিনী তাই অনেক সময়েই রাজনীতিতে তাঁদের হস্তক্ষেপ ছিল অমোঘ। এমনকি একাদশ শতকে কয়েকজন দেবদাসীকে গুপ্তচর বৃত্তিতেও নিয়োজিত হতে দেখা যায়। এই ৬৪ কলা: গণিত, রূপস; নৃত্যম, গীতম, বাদ্যম, স্বরগতম, পুষ্করগীতম, উদকমৃত্তিকা, অন্নবিধি, পানবিধি, বেশবিধি, শয়নবিধি, বিলেপনবিধি, আর্যা, পহেলিয়ম, মাগধীয়ম, গ্রহণ, শ্লোকম গীতিকা, হিরণ্যযুক্তি, চূর্ণযুক্তি, আভরণবিধি তরুণী আকর্ষণ, সামুদ্রিক শাস্ত্র, হয়লক্ষণ, পক্ষ পশুলক্ষণ নির্ণয়, ছত্রদন্ড লক্ষণ, অসিলক্ষণ, মণিলক্ষণ, বিষলক্ষণ, বস্তুবিদ্যা, স্কান্দাবারমলম, নগরমানস, গুপ্তচর বিদ্যা, ব্যূহ পড়িব্যূহ, চক্রব্যূহ গরুড়ব্যূহ, সকটব্যূহ, যুদ্ধ, কুস্তি, যুদ্ধাতিযুদ্ধ, দৃষ্টিযুদ্ধ, মুষ্টিযুদ্ধ, বাহুযুদ্ধ, লতাযুদ্ধ, ইষ্টশাস্ত্র, হিরণ্যাপক, পুত্রখেলম পত্রচ্ছেদেস, সঞ্জীবনির্জীব, শাকুনশাস্ত্র, অসিবিদ্যা ইত্যাদি ইত্যাদি।

বলা বাহুল্য এই বিশালগুণাবলির দিকে লক্ষ্য দিলে বোঝা যায় যে দেবদাসীদের একটি সুশিক্ষি'ত সংগঠনে পরিণত করাই ছিল তখনকার সমাজপিতাকের আগ্রহ।

দেবদাসীরা ছিল রাজার অনেক কাছের মানুষ, রাজকর্মচারীদের নির্ভরযোগ্য। অন্যদিকে তাঁরা ছিলেন দেবতার কাছের মানুষ। দেবতাদের পুরোহিতদের একান্ত নির্ভরযোগ্য। তাঁদের স্থান ছিল রাজা অন্তঃপুরে। না হয় মন্দিরের অর্ন্তগৃহে। তাই ভারতের ইতিহাসে আর্থ সামাজিক সাংস্কৃতিকআধ্যাত্মিক যা কিছুর উচ্ছ্বাসই ঘটে থাকুক না কেন সবই হয়েছে ধরে নেওয়া যেতে পারে দেবদাসীদের শক্তির সহযোগিতায়। এমনকি সাহিত্য, শাস্ত্র এবং জঘন বিবিধ বিষয়ের বোধ সম্পর্কেও তাঁদের ভূমিকা অবশ্যই ছিল। এমনকি মন্দির অথবা রাজসভার বাইরে যেসব বিষয়ে ভারত তার গবেষণার ক্ষেত্রে ক্রমাগত এগিয়ে গিয়েছিল যেমন বিজ্ঞান, জ্যোতিষশাস্ত্র, বায়ুমন্ডল, মহাশূন্যবিষয়ে গবেষণা। সব বিষয়েই তাঁদের জ্ঞান নিশ্চয়ই কাজে লেগেছিল, সাহিত্য, নৃত্যগীত। নাটকে তো ছিলই। তাই প্রাচীন ভারতে দেবদাসীদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শুধুমাত্র গণিকা বলে তাদের চিহ্নিত করাটা যুক্তিসম্মত নয়।

মনে রাখা দরকার যে শুধ রতিরঙ্গ আর সীমিত বা কলঙ্কিত রতিবিলাসের যে সূক্ষ্ম সীমারেখা তারই বাস্তব শরীর হচ্ছে দেবদাসীরা।

উদ্বাস্তু দেবদাসীর দল

স্বাধীনতার ঠিক পর পরই যে তৃতীয় দলটি উদ্বাস্তু হয়েছিল তাঁরা ছিলেন দেবদাসী, দেবতাদের স্ত্রী।

সেই সময় অসংখ্য দেবদাসীকে মন্দির চত্বর থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছিল, দিনের আলোয়, রাতের অন্ধকারে, তাড়িয়ে দিচ্ছিলেন মন্দিরের কর্তৃপক্ষরা। স্বাধীন ভারতের নতুন আইন নিষিদ্ধ করেছিল দেবদাসীপ্রথা তাই ওই বিতাড়ন যজ্ঞ। সেদিন আইন করেই ক্ষান্ত হয়েছিলেন সরকার। ওই হাজার হাজার নতুন উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের কথা ভেবেও দেখেননি। ফলে চোখের জল মুছতে মুছতে নিঃসম্বল, অসহায় কিশোরী, তরুণী, যুবতী, বৃদ্ধা সব বয়সের দেবদাসীদের বিদায় নিতে হচ্ছিল তাঁদের লীলাস্থান মন্দিরের সীমানা থেকে। সেইসময়ে দিনের পর দিন এক অদ্ভুত আতঙ্কের মধ্যে দিবসরজনী কাটাতে হয়েছে তাঁদের। সমাজে ফেরার অবস্থা ছিল না, ঘরে অর্থাৎ মন্দিরে ফেরার পথ বন্ধ। হয়তো তাঁদের অনেকেরই ছিল মন্দির কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দৈহিক সম্পর্ক, অনেকেরই হয়তো ছিল না, বিগতযৌবনাদের মন্দির ছিল শেষ আশ্রয়স্থল। সেসব সম্পর্কের কথা মনে করে রাখতে চায়নি কেউ।

কিন্তু কী হল সেইসব বিতাড়িত সর্বগুণসম্পন্না রতিবিলাসিনী দেবদাসীদের। তাঁরা ছিলেন সত্যিই শিল্পকলায় দক্ষ, ঈশ্বরের স্ত্রী হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে হয়েছিল প্রত্যেকেরই। সেদিন কি দেবদাসীদের গণমৃত্যু ঘটেছিল মুছে গিয়েছিল তাঁদের অর্জিত বংশপরম্পরার সেইসব অকল্পনীয় কলামাধুর্য। না তা হয়নি, কারণ তাঁদের রক্ষার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন আরও অনেকে, যারা হয়তো এরকম একটি সুযোগের অপেক্ষাতেই ওত পেতে ছিল কাছে পিঠে। তাই বিতাড়িত সেইসব দেবদাসীর ধরা পড়লেন অমোঘ আর এক জালে। সেই জাল তাঁদের কাউকে কাউকে টেনে নিয়ে গেল দূর প্রাচ্যে, কেউবা যেতে বাধ্য হল মুখ্য শহরগুলির রেড লাইট অঞ্চলে, আর যাঁরা একটু ভাগ্যবতী তাঁদের কাজকে তৈরি করা হল কল গার্ল হিসেবে। দুর্ভাগ্য যাদের বয়সে ও ব্যর্থতায় তাঁরা উঠল পথপার্শ্বের ঝুপড়িতে। দেবতাদের স্ত্রীরা আইনের এক খোঁচায়, হয়ে উঠলেন নির্বাচিত পতিতা। কিংবা পথের ভিখারিণী। হাজার হাজার সেইসব দেবদাসী শিল্পীদের জন্য চোখের জল ফেলতে উপস্থিত ছিল না কেউ সেদিন। এমনকি যাঁরা তাদের একসময়ে উপভোগ করেছেন তাঁরাও কেউ উপস্থিত হননি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে। মৌন ছিলেন ঈশ্বর, ঈশ্বরের পুরোহিতবৃন্দ আর সমাজ। ১৯৪৭ থেকে ১৯৪৯ সালের মধ্যে এক অভিনব অস্ত্রোপচারের মধ্য দিয়ে আপাতভাবে সাঙ্গ হয়েছিল এই হাজার হাজার বছরের প্রাচীন, সম্মানিত ও অতি গুরুত্বপূর্ণ দেবদাসীপ্রথা।

অনেকেই মনে করেছেন যে, দেবদাসীপ্রথা



আসলে দাস প্রথারই একটা ভিন্নতর দিকমাত্র। আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে তার যোগসূত্র একটা সুচতুর আড়াল মাত্র। তাঁরা বলেছেন, মনোরঞ্জনই হচ্ছে দেবদাসীদের জীবন। তাঁদের মূলত মনোরঞ্জন করতে হত রাজাদের, রাজপুরুষদের আর পুরোহিতদের তো নিশ্চয়ই। মন্দিরে দেবতার আড়ালে দীর্ঘকাল ধরে চলে আসছে নারীমাংস ভোগের এই নির্লজ্জ ব্যবস্থা, রাজার সঙ্গে পুরোহিতদের ছিল এই ব্যাপারে এক স্বার্থসুলভ চক্রান্ত। তার কঠোর জাল ছিন্ন করা সম্ভব হয়নি তাই। কারণ সমাজ ছিল চিরকালই উদাসীন, বিশেষত দাসপ্রথা সম্পর্কে। অবশ্য এই প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন হয়েছে নানা সময়ে রোম সম্রাটের সামনে, সেন্ট পিটারের আত্মাহুতি, স্পার্টাকাসের বিদ্রোহ, আর সাম্প্রতিককালে আব্রাহামলিংকনের জেহাদ দাসপ্রথাকে নিয়ন্ত্রণে এনেছে অনেক, কিন্তু একেবারে শেষ করতে পারেনি আজও।

দাস ব্যবস্থার প্রথম শিকার নারীশরীর। সে ব্যবসায়ে লাভ অনেক। জনসংখ্যা যখন বেশি দরকার তখন তাকে ব্যবহার করা হয়েছে উর্বরা জমির মত। মানুষের মর্যাদা সে পায়নি তখন। লাঞ্ছিত হয়ে সে শুধু ব্যবহৃত হয়েছে অর্থের বিনিময়ে। ভোগ আর লালসার শিকার হিসেবে। নারীর শরীর নিয়ে যুদ্ধ হয়েছে অনেক। মৃত্যু হয়েছে অগণিত। সর্বনাশ হয়েছে পরিবারের। সমাজের রাষ্ট্রের বারবার। বিদ্রোহও কম নয়।

ইতিহাসের দিকে নজর দিলে চোখ চলে যায় ভারত ইতিহাসের প্রথম দেবদাসী সুতনুকার দিকে। খৃস্টজন্মের তিনশো বছর আগে। সুতনুকা বিদ্রোহ করেছিল, ভাল লাগেনি তার দেবদাসীর জীবন। সে ভালবাসতে চেয়েছিল, ভাল লাগেনি আম্রপালীরও। আম্রপালী শরণ নিয়েছিল বুদ্ধের। তারপর অন্ধকারযুগ পেরিয়ে একলাফে আমাদের চলে আসতে হয় বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ১৯১২ সালে। সেই বছরই ব্রিটেনের ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল পরপর তিনটি বিল নিয়ে আলোচনায় বসতে বাধ্য হন; দেবদাসী প্রথার বিলোপ ছিল বিষয়।

তারপর ১৯২৭ সালে সারা দাক্ষিণাত্য জুড়ে দেবদাসী প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেছিলেন ড. মুথুলক্ষ্মী রেড্ডি। মদ্রাজ বিধানসভায় সেই বিল নিয়ে তুমুল আলোচনা হয়। সেই আন্দোলনের পক্ষে কলম ধরেছিলেন মদনমোহন মালব্য। অ্যানি বেসান্ত এবং মহাত্মাজী স্বয়ং, মিস ক্যাথারিন মেয়ার কলমে ফুটে ওঠে দেবদাসী কুপ্রথা সম্পর্কে তীব্র শ্লেষ, তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ। পদ্মভূষণ ড. রেড্ডির সময়েই বোম্বাই থেকে আর একজন যিনি এই প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করছিলেন তিনি হরি সিং গৌর। ড. রেড্ডি আর গৌর-এর আন্দোলন সর্বভারতীয় রূপ নিয়ে অবশেষে ১৯৪৯ সালে আইনে পরিণত হয়। দেবদাসী প্রথা নিষিদ্ধ হয় প্রথমে মহীশূরে। পরে বোম্বাই আর মদ্রাজে।

এই আন্দোলনের ইতিহাসে যার কথা না বললেই নয়, তিনি হলেন এক দেবদাসী পুত্র রাজারাম পাইনগিংকর। রাজারামের মা ব্রাহ্মণ বিধবা। সমাজের অত্যাচারে অসহায় অবস্থায় রাজারামের মা আশ্রয় নিয়েছিলেন দেবদাসী হিসেবে মন্দিরে, গোয়ায়। সেই দেবদাসীর ছেলে রাজারাম ২০ বছর বয়সে মারাঠিতে দুটি খণ্ডে একটি বই লেখেন 'মে কোন' (আমি কে), অধ্যাপক নারায়ণ বনদোদকারের সঙ্গে দেবদাসী প্রথা বিলোপের জন্য একটি আইনের খসড়া জমা দেন পর্তুগিজ শাসকদের হাতে। আর

আশ্চর্য, পর্তুগিজ কর্তৃপক্ষ ১৯৩০ সালে রাজারামের খসড়া প্রস্তাব আইনে পরিণত করেন। ভারতের মাটিতে সম্ভবত সেটাই প্রথম দেবদাসী প্রথা বিলোপের আইন।

দেবদাসী মুক্তিবাহিনী আর কাগুজে আইন

দেবদাসী প্রথা উচ্ছেদের জন্য আইন হলেও অন্যান্য অনেক আইনের মত এই আইনও কাগুজে আইন হয়েই রয়েছে। ফলে দেবদাসী প্রথার বিরুদ্ধে তৈরি হয়েছে দেবদাসী মুক্তিবাহিনী। এখনও কর্নাটক, মহারাষ্ট্র, গোয়া, কেরল, অন্ধ্র ও ওড়িষায় এই প্রথার চল রয়েছে। বেশ কয়েকটি সাম্প্রতিক সমীক্ষায় কীভাবে এই প্রথা চালু রয়েছে আইনের চোখকে ফাঁকি দিয়ে সেসব স্পষ্ট হয়েছে। জানা গেছে, দেবদাসী প্রথার সাহায্যে মদ্রাজ, বোম্বাই, দিল্লি, কলকাতা, বাঙ্গালোরের বেশ্যাপল্লীগুলিকে কীভাবে সমৃদ্ধ করা হচ্ছে সেসব খবর। জানা যাচ্ছে প্রচুর টাকার বিনিময়ে কীভাবে বিদেশে রপ্তানি করা হচ্ছে তাঁদের সেইসব রোমহর্ষক কাহিনী। কিছুকাল আগেই লোকসভায় শ্রীমতী উষাপ্রকাশ চৌধুরীর দেবদাসী ও মুরলী প্রথা বন্ধের জন্য প্রস্তাবিত বিলটি নিয়ে তুলকালাম কান্ড ঘটে গেল। কয়েকজন সদস্যের বক্তব্য ছিল যে 'সিটা' আইন (দি সাপ্রেশন অব ইমমরাল ট্রাফিক অ্যাক্ট) যথেষ্ট কার্যকরী নয়। কর্নাটক তামিলনাড়ু মহারাষ্ট্র, গোয়া আর ওড়িষায় যেমন দেবদাসী ও মুরলী প্রথার বিলোপের জন্য বিশেষ আইন আছে, সেরকম আইন সর্বভারতীয় স্তরে থাকা দরকার।

বিশ্বের রতিবিলাসিনীরা ও বঙ্গদেশ

খৃষ্টজন্মের ১৪০০ বছর আগে ফিরে যাই। রাজা তৃতীয় আমেজ হোটেপ থিবস শহরে 'আমন 'মুট' আর 'খেন সু'-র মন্দির প্রতিষ্ঠা করছেন। ওই মন্দিরের দাসদাসী, ভূসম্পত্তি ছিল অঢেল। পরে তুতেনখামেন, প্রথম মোতি ও রামেশিসের সময়ে থিবস শহরের দাপট আড়ম্বর ও ঐশ্বর্য আরও বাড়াতে থাকে। আর সেই সময়ে তৃতীয় রামেশিসের একটি দলিল গ্রেট হ্যারিস প্যাপিরাস, এর মাধ্যমে আমন মন্দিরে ৮৬৪৪৫ জন ক্রীতদাসী ও প্রচুর ভূসম্পত্তি দান করেন। এখন পর্যন্ত এই দলিলটিই দেবদাসী বিষয়ে পৃথিবীর প্রাচীনতম দলিল।

নবম রামেশিসের সময়ে থেকে রাজপুরুষদের নৈতিক অধঃপতন ঘটেছিল। রাজক্ষমতা ক্রমশ তানিস-এর ফারাওআর প্রধান পুরোহিতদের হাতে যুগ্মভাবে এসে যায়। ফারাওদের কন্যারা থিবস মন্দিরে আমনদেবতার স্ত্রী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। দেখা যায় যে দেবদাসীদের ইতিহাস ভারত ও মিশরেও এবং অন্যান্য দেশেও প্রায় একই ধরনের। আসিরিয় ও ব্যাবিলোনিয় সভ্যতার মধ্যেও ওই একই ধরনের দেবদাসী প্রথা নিশ্চিতরূপে বর্তমান ছিল। ফিনিসীয়দের কার্থেজের মন্দির সম্পর্কে মার্মাই শহরে পাওয়া একটি মূল্য তালিকায় দেখা যায় যে অনেক কিছুর সঙ্গে দেবদাসীদের মূল্যও উল্লিখিত রয়েছে। গ্রিসেও একই ভাবে হিয়েরোডুল অর্থাৎ দেবদাসীদের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়, এই মন্দির বালাদের গ্রিসের প্রত্যেক মন্দিরেই উপস্থিত থাকতে হত। তাঁদের কাজ ছিল দেবসম্মুখে নৃত্যগীত অভিনয় করা আর বাধ্যতামূলকভাবে পতিতাবৃত্তি। প্রাচীন ব্যাবিলনের ইশতের মন্দিরের দেবদাসীদের মতন এদেরও কাজ ছিল প্রধান পুরোহিত ও রাজ্যের বীরপুরুষদের মনোরঞ্জন কিংবা অঙ্গসেবা করা।

আর্টেসিমের মন্দিরের 'মিনাড' দেবদাসীদের বালিকা বয়স থেকেই তালিম দিয়ে তৈরি করা হত। মিনাডদের মতই ছিল 'আমাজন' দেবদাসী সম্প্রদায়ের কথা। আমাজন অর্থে একস্তন। কারণ ডান কাঁধে তূণ রাখার অসুবিধা হওয়ার জন্য এরা একটা স্তন কেটে বাদ দিত। এই সম্প্রদায়ে পুরুষসন্তানকেবাঁচিয়ে রাখা হত না। বেঁচে থাকত একমাত্র কন্যাসন্তান। প্রজননের জন্য পুরুষকে বলপূর্বক ধরে এনে গর্ভধারণ করার পর সন্তান প্রসব করার পরই হত্যা করা হত সেইসব পিতাদের। জাপানের গেইসা, দক্ষিণ আমেরিকার ইনকা সভ্যতা, মায়া বা অ্যাজটেক সভ্যতাতেও একই রকম দেবদাসী প্রথার বিবরণ। একটু ভিন্নধরনের হলেও মূল প্রথা বা ব্যবস্থা প্রায় সর্বাংশে একই।



বঙ্গদেশে দেবদাসীপ্রথা দক্ষিণ ভারতের অন্যান্য রাজ্যের মতই একসময়ে বিস্তৃতি পেয়েছিল। বাংলার প্রথম দেবদাসীর উল্লেখ পাওয়া যায় অষ্টম শতকে কল্হলের রাজতরঙ্গিণীতে। কাশ্মীররাজ জয়াপীড় বিজয়াদিত্য অনেক অর্থমূল্যে মন্দির কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ক্রয় করেছিলেন নতর্কী কমলাকে। সন্ধ্যাকর নন্দী তাঁর রামচরিত কাব্যে রামাবতী শহরের মন্দিরে দেবদাসীদের রূপলাবণ্যের অপরূপ বিবরণ দিয়েছেন। ধোয়ীর পবনদূতে বাররামাদের সকলেই মন্দিরের দেবদাসী। বিজয় সেন কেত্তপাড়া প্রশস্তিতে উল্লেখ করছেন দেবদাসীদের আশ্চর্য লক্ষণ, উমাপতি ধরের রচনাতেও রয়েছে দেবদাসী আখ্যান।

পাল আমলে ততটা না হলেও সেন বংশের শাসনকালে বাংলার দেবদাসী প্রথা যে বিশেষ বিস্তৃতি পেয়েছিল সেকথা স্বীকার করেছেন প্রয়াত ডঃ নীহাররঞ্জন রায়। গোবর্ধন আচার্যের আর্যসপ্তশতী, হালের গাথা সপ্তশতী কর্ণামৃতের শ্লোকসংগ্রহে সর্বত্রই বিলাসিনীদের সম্পর্কে রয়েছে বিস্তৃত বিবরণ। কবি জয়দেব ছিলেন সেসময়ের শ্রেষ্ঠ প্রতিভা। জয়দেবের স্ত্রী পদ্মাবতী ছিলেন পুরীর মন্দিরের দেবদাসী। চৈতন্যদেব পুরীর মন্দিরের তৎকালীন দেবদাসীদের কৃপা করেছিলেন। এখনও পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে দেবদাসী একটি অতি সম্মানিত পদ। রথযাত্রা কিংবা রাজপরিবারের বিবাহে দেবদাসীদের উপস্থিতি অবশ্য প্রয়োজনীয়।

একসময় মন্দিরে ছিল দেবদাসীদের প্রয়োজন। বর্তমান প্রেক্ষাপটে তাদের প্রয়োজন দেখা যাচ্ছে হোটেলে ক্যাবারেতে। সময় দেবতারা ছিলেন স্বর্গরাজ্যের। এখন দেবতারা হলেন হোটেলবাসী, ক্ষমতায় যিনি তিনিই দেবতা। ফলে দেবদাসীরা রূপ বদলে আশ্রয় নিচ্ছেন হোটেলে। শ্রীমতী উষা প্রকাশ চৌধুরির লোকসভায় তোলা প্রস্তাবের পক্ষে বলতে গিয়ে লোকসভার সদস্য পি কে থুঙ্গন ঠিক এই তথ্যটাই বলেছিলেন। থুঙ্গন বলেছিলেন—দেবদাসী প্রথার আধুনিক রূপ ক্যাবারে নর্তকীদের নিয়ে ব্যবসাও বন্ধ করতে হবে।

দেবদাসীদের বিয়ে

১৯৮১ সালে দক্ষিণের রাজ্যগুলিতে দেবদাসীদের পুনর্বাসনের জন্য আন্দোলনে বেশ কিছু কর্মসূচী সরকারি ও বেসরকারি



পর্যায়ে নেওয়া হয়েছিল। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিকল্পনা ছিল দেবদাসীদের জন্য বিবাহের ব্যবস্থা করা। মদ্রাজে তামিলনাড়ু সরকার বছরে ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেন দেবদাসীদের বিয়ে আর যথাযথ পুনর্বাসনের জন্য। এই পরিকল্পনা প্রচারিত হওয়ার সংগে সংগে সাধারণ মানুষদের মধ্যে বেশ ভাল সাড়া পাওয়া যায়। স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে যুবকেরা বিয়ের আগ্রহ প্রকাশ করে। তামিলনাড়ুর বিভিন্ন জায়গায় এযাবৎ প্রায় ১ হাজারেরও বেশি দেবদাসীদের বিয়ে সরকারিভাবে দেওয়া হয়েছে। সরকারের পরিকল্পনা এখন পর্যন্ত যা তাতে বছরে অন্তত পক্ষে ১ হাজার দেবদাসীদের বিয়ে দেওয়া সম্ভব। সমস্ত তামিলনাড়ুর রাজ্যে দেবদাসীদের সংখ্যা ১০ হাজারেরও বেশি। তামিলনাড়ুর প্রাক্তন মন্ত্রী বীরাপ্পান কিছুদিন আগে এরকমই একটি গণবিবাহ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। ৪৩ জন দেবদাসীর বিয়ে সেদিন অনুষ্ঠিত হয় ওয়া্লাপালানি আন্দোভার মন্দিরে। দেখা গেল ৪৩ জন যুবক আর ৪৩ জন দেবদাসী সকলেই অনুন্নত শ্রেণীর। আদি দ্রাবিড় সম্প্রদায়ের। এদের মধ্যে ৮ জনের বিয়ে হল ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে। আর উপস্থিত যাঁরা ছিলেন সেই অনুষ্ঠানে সকলেই একবাক্যে সমর্থন করলেন এই বিয়ে। দেবদাসীদের বিয়ে আর ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিয়ের এই চল দুটোই বৈপ্লবিক সন্দেহ নেই। মন্ত্রীপত্নী রাজাম্মান বীরাপ্পান নিজে থিরুমংগলায়ম মংগলসূত্র পরিয়ে দিলেন নবদম্পতিদের। সারাক্ষণ বেজে যাচ্ছিল থেভারম আর নাদেশ্বরম গাথা। প্রাচীনকালে এই একই ধরনের অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দেবদাসীদের বিয়ে হত দেবতাদের সংগে, এখন বিপরীত বিবাহ অনুষ্ঠান হাজার হাজার বছরের প্রথা ভেঙে চুরমার করে দিল।

একই রকম আন্দোলন চলছে কর্নাটক ও মহারাষ্ট্রেও। বিজাপুরের মহালিংগপুরের মন্দিরে ৫৩ জন দেবদাসীর বিয়ে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল। দেবদাসী প্রথা অনুসারে এই ৫৩ জন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই দেবী ইয়ালাম্মার মন্দিরে দেবদাসী হিসেবে গৃহীত হয়েছিল। কর্নাটক সরকার দেবদাসীদের যারা বিয়ে করবে তাঁদের প্রত্যেকের জন্য তিন হাজার টাকা বরাদ্দ করেছেন, সংগে আরও কিছু কিছু সুযোগ সুবিধাও।

মন্দিরে ছবিতে দেবদাসী ঃ শুদ্ধ দেহতত্ত্বের প্রসন্ন বিলাস

সুকুমার সেন একবার লিখেছিলেন,– আমাদের সাহিত্যে কখনই কামরসের ভিয়ান ছিল না। তবে মেয়ে মহলে–সম্পূর্ণভাবে নিজেদের মধ্যে কামরসের খোলায় ছড়া ফুট আর কামরসের কেঁড়েয় দই জমত। সুকুমার সেন কামরস আর আদিরস এই দুটি কথার দুর্জয় ব্যবধান স্পষ্ট করেছিলেন। তিনি বলেছেন আধুনিক দৃষ্টিতে দেখলে আদিরস সার্থক শব্দ বটে কেননা সৃষ্টির চিরন্তন উৎসই হল যৌন প্রবৃত্তি। যৌন প্রবৃত্তিকে তিনি অবশ্য জীবনের মূল রস হিসেবে মেনে নিতে পারেননি। কিন্তু ব্রহ্মসংহিতার যে মূল্যবান শ্লোকটি তিনি সুনীতিবাবুকে শুনিয়েছিলেন সেটি ছিল, '–যিনি আনন্দ চিন্ময় রসরূপে প্রাণিদের মনে কামস্তা বহয়ে লীলা করে বিশ্বসংসারকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে ভজনা

করি।' মজার কথা হল সুনীতিবাবু ইয়োরোপে ফ্রয়েড সাহেবকে এই শ্লোকটি আবৃত্তি করে মুগ্ধ করেছিলেন। ফ্রয়েডের এই ব্যাপারে মুগ্ধ ও চমকিত হওয়ার কারণ ছিল।

ওই শ্লোকটি থেকে যে ইঙ্গিত আমরা পেতে পারি সেটাই হল দেবদাসী পরিকল্পনার সম্ভবত মূল উৎস দেবদাসীরা বেশ্যা নয়। সুকুমার সেন ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে প্রাচীন যুগে বণিকদের রাত্রিবাসে জন্য জনপদ গড়ে উঠেছিল 'বেশ' যেগুলো তুলনায় ওখানকার তারাচিহ্নিত হোটেলের মত। কিন্তু হোটেল নয়। কিছুটা গৃহস্থবাড়ির মত। সেই সব 'বেশ'-এর কর্ত্রী হতেন বিচক্ষণ বিদগ্ধ মহিলা। তিনি তার বেশে সর্বক্ষণের জন্য পুষতেন সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী মেয়েদের। যারা অতিথিদের পরিচর্যা করবে। তাঁদের বলা হত বেশবধূ বা বেশ্যা। তবে একটু ব্যতিক্রম শুধু এই যে সেইসব বেশ্যারা প্রেমে পড়ে বিয়ে করে গৃহস্থসংসারে ফিরে যেতে পারত অনায়াসে।

দেবদাসীরা ওই গোবিন্দের ভজনার জন্যই মন্দিরে নিয়োজিত হত। কিন্তু মন্দিরে মন্দিরে যেসব মদনকাই বা খুবসুন্দরী মূর্তির অনুপম ভাস্কর্য আমরা পাই সেসব সৃষ্টির সময়ে ভাস্করেরা কি সেইসব খুবসুন্দরীদের মডেল হিসেবে চোখের সামনে পেতে অভ্যস্ত ছিল? নিশ্চয়ই পেতেন। কারণ ইতিহাস ঘাঁটলে আমরা দেখতে পাই যে সোমনাথের মন্দিরে ৫০০ জন দেবদাসী ২৪ ঘন্টা নৃত্যগীত দিয়ে দেবতার আরাধনা করে চলেছেন। সম্রাট রাজরাজ তাঞ্জোরের বৃহদীশ্বর শিবমন্দির প্রতিষ্ঠার সময়ে প্রথমেই ব্যবস্থা করা হয়েছিল ৪০০ জন দেবদাসীর। চালুক্যরাজ ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের সময়েও মন্দির নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে দেবদাসীদের কর্মস্থান তৈরির ব্যবস্থাও পাকা ছিল।

ভারতের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত মন্দিরে মন্দিরে দেবদাসীদের নানা নৃত্যভঙ্গিমার যে অপূর্ব ভাস্কর্য সারা পৃথিবীতে আলোড়ন তুলেছে সেগুলোর ইতিহাস সম্যক পর্যালোচনা না করলে মনে হবে সেসব মন্দিরই বুঝি রতিবিলাসের কেন্দ্র মাত্র। অন্য কিছু নয়। কিছু বিদেশীদের এরকম মন্তব্য অস্বাভাবিক নয়। কারণ হয়তো তাঁদের পক্ষে ভারতের প্রাচীন ধর্মব্যবস্থার মূল প্রেক্ষাপটটি বোঝার অসুবিধা ছিল। তবে দুবোয়ার 'হিন্দু ম্যানারস, কাস্টমস অ্যান্ড সেরিমনিজ' গ্রন্থে দেবদাসী প্রথার মন্দ দিকগুলো যেমন দেখছেন তেমনিই উল্লেখ করেছেন ভাল দিকগুলোকেও। তিনি দেবদাসীদের অসামান্য শিল্পনৈপুণ্য ছাড়াও প্রশংসা করেছেন তাঁদের শালীনতা ও রুচিবোধের।



ভাস্করেরা যে মূর্তি মন্দিরের গায়ে নির্মাণ করেছেন সেখানে খোলামেলা কামকলার নিদর্শন থাকলেও দেবদাসীদের উচ্চ শিল্পাদর্শের নিদর্শন সমসময়েই রেখেছেন। গণভোগ্যা দেবদাসীদের অন্ধকার জগতের সমস্ত খবর জেনেও এইসব শিল্পীরা ছবি ও ভাস্কর্যের মধ্য দিয়ে নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন দেবদাসী আদর্শের মূল ইঙ্গিতগুলি। দেবদাসীদের শরীর স্রোতে ভেসে যে যেতনা ভাস্করেরা তার প্রমাণ— বেলুড় মন্দিরের মদনকাই মূর্তির পাদপীঠে উৎকীর্ণ লিপিগুলি। সেখানে ভাস্কর নিজের পরিচয় দিয়ে বলছেন, আমি দেবগণের ভাস্কর, সজ্জনের হৃদয়রঞ্জক ও সরস্বতীর চরণকমলের মধুকর। ক্ষীরামম্বুমধ্যাৎ– আদর্শ মেনে চলেছেন যে ভাস্করেরা তার আরও অসংখ্য প্রমাণ সারা ভারতের মন্দিরে মন্দিরে ছড়িয়ে রয়েছে।

আসলে মন্দিরগাত্রে খোদিত শিল্পকলাগুলি সবসময়েই হতে চেয়েছে স্বয়ংসম্পূর্ণ। যে ৬৪ টি কলা জীবনযাপনের পক্ষে অপরিহার্য। কৌটিল্য তথা বাৎস্যায়ন যে কলাগুলি জীবনের পূর্ণতা লাভের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় বলে প্রস্তাব করেছেন সেগুলোকে লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখার কোন প্রয়োজন আমাদের পূর্বপুরুষেরা অনুভব করেননি। হয়তো কিছু ব্যতিক্রম ঘটেছিল। হয়তো অন্য অনেক বিষয়ের মতই দেবদাসী বা ঈশ্বরপূজার প্রেক্ষিতে কিছু বিকৃতি ছিল। কিন্তু তাই বলে সমস্ত বিষয়টি কামলালসার বিকৃতি বলে ভাবা ভুল হবে। শুধু সৌন্দর্যের প্রতীকচিহ্ন হিসেবে ভারতের প্রাচীন মন্দিরগুলির ভাস্কর্য আজও লক্ষ লক্ষ মানুষকে যেভাবে মুগ্ধ ও মগ্ন করে রাখে–সেটাই তো সেগুলি নির্মাণের মুখ্য সাফল্য। □

কাম্পুচিয়ায় 'আঙ্কর ভাট' পুনরুদ্ধারে ভারতীয়রা

বাঙালির ছেলে কল্যাণপ্রিয় গুপ্ত কাম্পুচিয়ার ঘন জঙ্গলে লেগে আছেন 'আঙ্কর ভাট' পুনর্গঠনের কাজে। নিজে অবশ্য উনি বলেন 'কিছুই নতুন করে যুক্ত করছি না।' কাজ হচ্ছে, 'আঙ্কর যাতে আর ধ্বংস না হয় তার ব্যবস্থা করতে। আর যা ভেঙে গেছে বা ধসে পড়েছে সেগুলো পুনরুদ্ধারে।'

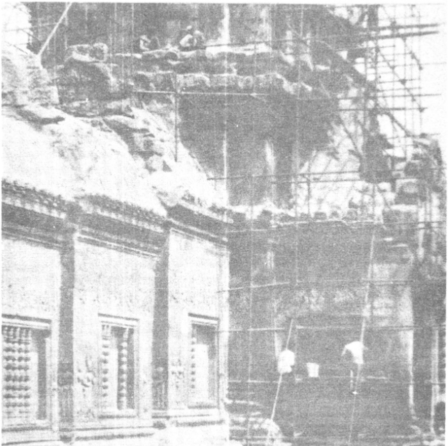
শুনতে কাজটা বেশি শক্ত বলে মনে হয় না। কিন্তু আসলে বড়ই শক্ত। প্রথমত কাম্পুচিয়াতে যন্ত্রপাতি কিছুই নেই। আর না আছে কাজ জানা লোক। যাঁরা কাজ জানতেন তাঁদের অধিকাংশই মারা গেছেন পল পটের রাজত্বে। পল পট শুধু পুরনো সমাজই ভাঙেননি, ভেঙেছেন ঘর, পরিবার, পুরনো সভ্যতাও। আর যাঁদের পল পট সরকার শত্রু মনে করতেন, তাঁদের একমাত্র সাজা ছিল মৃত্যু। আর শত্রু হিসেবে চিহ্নিত তারাই যারা তথাকথিত বুদ্ধিজীবী – শিক্ষক, ডাক্তার, কেরানি, ব্যবসায়ী।

পল পটের রাজত্ব ছিল ১৩০০ দিনের ১৯৭৫ সালের এপ্রিল থেকে ১৯৭৯ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত। এই ১৩০০ দিনে ৩০ লাখের মত লোক বলি হয়েছেন পল পটের অস্বাভাবিক রাজনীতির। বেশ কিছু লোক মারা গেছেন অসুখে। কারণ, ডাক্তার বা ডাক্তারি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। যেমন বন্ধ ছিল লেখাপড়া।

পল পটের হাত থেকে যখন কাম্পুচিয়া মুক্ত হলো, তখন বেঁচে থাকাটাই ছিল সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। যাদের দেশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তাদের ফিরিয়ে এনে আবার পুরনো জায়গায় বসান আর মোটামুটি ভাবে চাষবাস শুরু করানোই ছিল নতুন সরকারের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব। সেই সঙ্গে ভাঙা পরিবার জোড়া দেওয়া – সেটাও ছিল আর একটি কাজ।

এমনি অবস্থায় পাথরের মন্দিরের কথা কে ভাববে? কিন্তু আঙ্কর ভাট তো আর সাধারণ মন্দির নয়। সেটা তো মানুষের সভ্যতার এক অনন্য নজির। কল্যাণপ্রিয় গুপ্ত যা শোনালেন তা থেকে এক অদ্ভুত ছবি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কল্যাণবাবুরা আগে থাকতেন ঢাকা বিক্রমপুরে। সেখান থেকে ওঁর বাবা মা চলে আসেন গৌহাটি। সেখান থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে কল্যাণবাবু আসেন কলকাতা। স্কটিশ থেকে বি এ পাশ করে যান শান্তিনিকেতন। সেখানে এম এ ডিগ্রি নিয়ে আসেন দিল্লি। পুরাতত্ত্বের ডিগ্রিটা নেন দিল্লিতে। আর তারপরেই ঢুকে পড়েন আর্কিওলজিকাল সার্ভে অব ইন্ডিয়াতে।

আঙ্কর উদ্ধারের কাজ চলছে



প্রথমেই দায়িত্ব দেওয়া হয় নালন্দার ভেঙে পড়া বৌদ্ধ মহাবিদ্যালয় ও অন্যান্য স্তূপগুলি রক্ষার কাজ। পরবর্তীকালে দায়িত্ব পান দিল্লির মনুমেন্টগুলো রক্ষণাবেক্ষণের।

এমন সময়ই কাম্পুচিয়ার কলা ও সংস্কৃতি মন্ত্রী ছেঙ ফন, নিজে যিনি এক সময় নম পেনের কলাভবনে মাস্টারি করতেন, আবেদন জানালেন ভারত সরকারকে আঙ্কর পুনরুদ্ধারের কাজে সহায়তা করার জন্য। এক সময়ে ইউনেসকো টাকা দিয়েছিল এই কাজে। কিন্তু নতুন সরকারকে পশ্চিমী দেশগুলো যেহেতু স্বীকৃতি দেয়নি, তাই কাম্পুচিয়ার আঙ্কর-কে বাঁচাতে ওদের কোন সাহায্য পাওয়া যায়নি। তখন এগিয়ে এলেন ভারত সরকার। বিদেশ মন্ত্রণালয় দিলেন টাকা – ছ বছরে ছ কোটি টাকা। পাঠালেন ১৪ জনের এক দল। যে দলের নেতা কল্যাণপ্রিয় গুপ্ত। গত দু বছর ধরে তাঁরা কাজ করছেন কাম্পুচিয়ায়।

আঙ্কর পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মন্দির শৃঙ্খলা। স্থাপত্য শিল্পের এক বড় নিদর্শন। পুব থেকে পশ্চিমে দেড় কিলোমিটার লম্বা আর উত্তর থেকে দক্ষিণে সোয়া কিলোমিটার চওড়া এই মন্দির-শৃঙ্খলা বিশ্বকেই প্রতিবিম্বিত করে। রাজা সূর্য বর্মনের সময়ে শুরু হয়ে (১১১৩ থেকে প্রায় ১১৪৫ খৃস্টাব্দ), তারপর জয় বর্মনের সময়ে এই মন্দিরের কাজ শেষ হয়। প্রায় ৫০ বছর ধরে ৫০০০ ভাস্কর, ২৫০০ মজদুর আর ৫০০০ হাতি এই কাজে নিযুক্ত হয়েছিল। এছাড়া নৌকো আর অন্যান্য বাহন তো ছিলই।

কল্যাণবাবু দেখালেন এই মন্দির শৃঙ্খলার বিশেষ রূপ। বিরাট বিরাট পাথরের চাঙড় কেটে (এক একটার ওজন প্রায় ৭ থেকে ১০ টন) একটার ওপরে আর একটা বসিয়ে তৈরি হয়েছে এ মন্দিরগুলো। মধ্যের পাথরগুলো ল্যাটারাইট আর তার চারদিকে স্যান্ড স্টোন। কোথাও কোন সিমেন্ট বা অন্য মশলা ব্যবহার করা হয়নি। শুধু ভারের ওপরেই রয়েছে এই বিশাল শৃঙ্খলা। এ যেমন আশ্চর্য তেমনি আবার আঙ্কর ধ্বংসেরও মুখ্য কারণ।

এই এলাকায় অতিরিক্ত বৃষ্টি হয়। মন্দির শৃঙ্খলা বালুমাটির ওপরে। কাম্বোজ রাজাদের যখন থাইরা তাড়িয়ে দেয় এই এলাকা থেকে, এ মন্দিরগুলোর ধ্বংস শুরু হয়

তখন থেকেই। জল যাবার রাস্তাগুলো নষ্ট হয়ে যায়। চারদিকে জল জমতে শুরু করে। বৃষ্টির জল উপর থেকে চুঁইতে থাকে। জোর কমতে থাকে। পাখিরা বাসা তৈরি করে। ফলের ও অন্য গাছের বীজ থেকে বেড়ে ওঠে গাছ। মন্দিরের চূড়ো ভেঙে পড়ে। বাড়তে থাকে ফাটল।

সবচেয়ে বড় কথা নিচের বালু সরতে শুরু করে। লক্ষ লক্ষ পিঁপড়েও সরিয়ে ফেলে বালুকণা। ফলে যে ভিতের ওপর তৈরি হয়েছিল এই মন্দির শৃংখলা, সেটি ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। ওপরের পাথরের চাপে বাইরের দেওয়াল ফেটে ভেঙে যায়। খুলে যায় মন্দিরের ভেতর দেওয়াল।

সূর্য বর্মন এই মন্দির শৃংখলা বানিয়েছিলেন পৃথিবীর জ্যামিতিক ধাঁচে। কল্যাণপ্রিয় গুপ্ত বলেন, এ মন্দির শৃংখলা কোন দেবতার জন্য তৈরি হয়নি। এ ছিল রাজার রাজত্বের নিদর্শন। রাজা ছিলেন নিজেই দেবতা। অন্য দেশের মত দেবতার প্রতিনিধি নন। এই মন্দির শৃংখলা হচ্ছে মধ্যের কেন্দ্র মন্দির থেকে পর পর চারটে গ্যালারি করে বিস্তৃত। এক একটি গ্যালারির পরে আবার খালি জায়গা। তারপর আবার দু পাশে ঘর, যাকে বলা হয় লাইব্রেরি।

পূব দিকের দেওয়াল কাছে কাছে আর পশ্চিম দিকে দূরে দূরে। কল্পনা করা হয়েছে মেরু, তারপর বসতি আর সব শেষে সমুদ্র। মন্দির শৃংখলার চারদিকে ছিল গভীর জলাশয়। যদিও মন্দিরের বুনিয়াদি গঠন দক্ষিণ ভারতের মন্দিরের ধাঁচে ও প্রতিদিকের দেওয়ালে আছে গোপুরম, তবুও কল্যাণবাবু মনে করেন যে, এ মন্দির শৃংখলার আছে এক নিজস্ব রূপ।

এর গ্যালারিগুলো 'আর স্তম্ভগুলো বিচিত্র। একদিকের দেওয়াল জুড়ে আছে রামায়ণের কাহিনী খোদাই করা। কোথাও আছে সমুদ্র মন্থন। কোথাও আছে কংসবধ। কোথাও কৃষ্ণের গোবর্ধন ধারণ। এক জায়গায় আছে যমরাজা ও চিত্রগুপ্তের কাহিনী। আর নরকে অত্যাচারের দৃশ্য।

কল্যাণবাবু জানালেন, বাইরের দুনিয়ায় এ মন্দিরের কথা সবচেয়ে প্রথমে জানান এক জাপানি ভিক্ষু। তিনি ১৬৩২ খৃস্টাব্দে এসেছিলেন সেখানে। তাঁর কথা জাপানি ভাষায় খোদাই করা রয়েছে দেওয়ালে। ১৮৫০-এ এক ফরাসি পাদরি এসে পৌছন আংকরে। আর ১৮৬৩-তে আসেন হেনরি মুহ, যিনি ফিরে গিয়ে এই আশ্চর্য মন্দিরের বিস্তৃত বিবরণ লেখেন ফরাসি ভাষায়।

এই বছরেই ফরাসিরা দখল করে কাম্পুচিয়া। কিন্তু আংকর ১৯০৭ পর্যন্ত ছিল থাইল্যান্ডের দখলে। এক চুক্তির বিনিময়ে আংকর আর সিয়েমরিরা প্রদেশে ফিরে আসে কাম্পুচিয়া দখলে। এরপর আংকরের ব্যাপারে বাইরের দুনিয়ার কাছে এল আরও খবর।

১৯২০-তে তরুণ ফরাসি লেখক আঁদ্রে মালরো ধরা পড়লেন বানট্রি শ্রাই মন্দিরের মূর্তি চুরির দায়ে। তাঁকে আটকে রাখা হল নমপেনের কারাগারে। সেখানে মালরো লিখলেন – 'দি রয়াল ওয়ে' বা 'রাজার পদ্ধতি'। ১৯৩০-এ যখন এ বই প্যারিসে ছাপা হল, তখন হৈ চৈ পড়ে গেল সারা দুনিয়ায়। আংকর এল মানুষের কাছে এক ঐতিহাসিক সৃষ্টি হিসেবে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ফরাসিরা জাপানিদের হাতে মার খেয়ে পালিয়ে এল কাম্পুচিয়া ছেড়ে, কিন্তু জাপানিরা যখন শেষ পর্যন্ত মিত্র শক্তির কাছে হেরে গেল, তখন ফরাসিরা আবার দখল করল কম্পুচিয়া, ভিয়েতনাম আর লাওস। কিন্তু ততদিনে মুক্তি আন্দোলনে আলোড়িত হচ্ছে সারা ইন্দো-চায়না। হো চি মিন আর অন্য নেতারা নিয়ে এসেছেন নতুন যুগের স্বপ্ন। ১৯৪৬-এ হল ভিয়েতনামের আংশিক মুক্তি। লড়াই চলল আরও কয়েক বছর। দিয়েন বিয়েন ফু'র যুদ্ধের পরে ফরাসিরা হারিয়ে ফেলল ইন্দো-চায়নায় থাকার ক্ষমতা।

১৯৫৪-তে জেনেভা চুক্তি মারফত স্বীকৃত হল ভিয়েতনাম, কাম্পুচিয়া আর লাওসের সার্বভৌমত্ব। সিহানুক থাকলেন কাম্পুচিয়ার প্রেসিডেন্ট-রাজা হিসেবে। কিন্তু যখন আমেরিকানরা শুরু করল তাদের ভিয়েতনাম দখলের চাল, সিহানুক তাঁদের প্রকাশ্যে নিন্দা করলেন। ১৯৭০-এ আমেরিকার সাহায্যে জেনারেল লন নল এলেন ক্ষমতায়।

এই পর্যন্ত আংকরের দেখাশোনা করত ফরাসিরা। মন্দির পুনরুদ্ধারের কাজও চালাচ্ছিলেন তাঁরা। গ্রসলিয়ের ছিলেন এখানকবার কিউরেটর। তাঁর ছেলে ফিলিপ ছিলেন আরও দু বছর।

কিন্তু ১৯৭০-এর পর থেকেই শুরু হল যে যুদ্ধ, তার ফলস্বরূপ আংকর মিলিয়ে গেল মানুষের মন থেকে। প্রথমে শুরু হল আমেরিকানদের কাম্পুচিয়ার বিরুদ্ধে অঘোষিত যুদ্ধ, যাতে জিতলেন পল পট। ১৯৭৫ থেকে পল পট নেমে পড়লেন ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে। ১৯৭৯ হেঙ সামরিনের পার্টির সৈন্য আর ভিয়েতনামের সৈন্যরা একত্রে শেষ করলেন পল পটের দুঃস্বপ্নের রাজত্ব।

পল পট, সন সান, ইয়াং সেরি প্রমুখরা কাম্পুচিয়া ছেড়ে আশ্রয় নিলেন থাইল্যান্ডে। চীন এগিয়ে এল পল পটদের সাহায্য করতে। চীন আক্রমণ করল ভিয়েতনামকে। আর কাম্পুচিয়ায় চলল আবার ক্ষমতা দখলের সংগ্রাম। তবে পল পটরা আর কোন এলাকা দখল করে রাখতে পারল না। সীমান্ত এলাকা ছাড়া কোথাও আর গোলাগুলির আওয়াজ নেই।

আমি আর কল্যাণবাবু যখন কথা বলছিলাম আংকরের মধ্যে দাঁড়িয়ে, হঠাৎ তখন শোনা গেল গোটা ছয় গুলির আওয়াজ। এক আমেরিকান সাংবাদিক তো বলেই বসলেন, 'পল পটের লোকেরা আক্রমণ করেছে।' কিন্তু কল্যাণবাবু আর অন্য ভারতীয়রা এবং কাম্পুচিয়ার শ্রমিকরা বিন্দুমাত্রও বিচলিত হলেন না। কল্যাণবাবু বললেন, বারুদ ফাটিয়ে সৈন্যরা মাছ ধরে দুপুরের খাবার ব্যবস্থা করছে।

সার্ভেয়ার এস কে জৈন বললেন, যদিও আমাদের সংগে বন্দুকধারী সেপাই থাকে কিন্তু গত দু বছরে একবারও ওদের কোনদিন গুলি চালাবার দরকার হয়নি। কোনরকম আক্রমণ হয়নি। ভারতীয় আর কাম্পুচিয়ার লোকেরা সমবেতভাবে চালিয়ে যাচ্ছেন আংকর পুনরুদ্ধারের কাজ।

কাজটা বড় শক্ত। বাইরের দেওয়ালগুলো সব খুলে ফেলতে হবে। তার পর নিচে বালুর ভিত শক্ত করে আবার ঐ বিরাট বিরাট পাথরের প্যানেল আর দেওয়াল ঠিকমতো বসাতে হবে। ক্রেন ছাড়া ঐ পাথর সরানো সম্ভব নয়। তবে এখনও ক্রেন ভারতবর্ষ থেকে এসে পৌছয়নি।

তবে পশ্চিম দিকে কাজ অনেক এগিয়ে গেছে। জল যাতে আর শেষ দেওয়ালের নিচে না আসে সেজন্য বাঁধ দেওয়া হচ্ছে। সামনের গেট প্রায় তৈরি।

এছাড়া কাজ হচ্ছে ভাঙাচোরা অংশগুলি মেরামত করা, পাথরে যে নুন জমেছে তা ধুয়ে ফেলা, শ্যাওলা বন্ধ করা, পুরনো রঙ ফিরিয়ে আনা আর কেমিক্যাল দিয়ে অন্য ক্ষয় বন্ধ করা। কল্যাণবাবু বললেন, নতুন কিছু তৈরি করে জোড়ার কাজ তিনি করবেন না। যা আছে, তাকেই বাঁচিয়ে রাখতে হবে। তবে ভাঙাচোরা অংশগুলোকে মোটামুটি ঠিক করে দেবেন। তাঁর কাজ হচ্ছে আংকরকে পুরনো মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা।

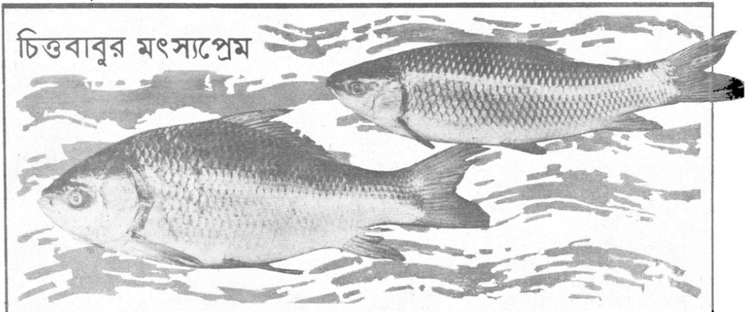
সময়ের বিচারে কাজ করতে হচ্ছে ধাপে ধাপে। কেননা, নভেম্বর থেকে জুন পর্যন্ত শুধু কাজ করা সম্ভব। তারপর এত বৃষ্টি যে কাজ করা সম্ভব নয়। থাওয়া-দাওয়া করাও বেশ মুশকিল। কল্যাণবাবু তবুও ভাত-মাছ দিয়ে চালাচ্ছেন কিন্তু অন্য ভারতীয়রা পড়েছেন অসুবিধায়। সবচেয়ে কষ্ট হচ্ছে বাড়ি থেকে চিঠি না পাওয়া। কল্যাণবাবুর স্ত্রী ডাক্তার (স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ)। দিল্লিতেই থাকেন দুই মেয়ে আর এক ছেলে নিয়ে। তিন মাস ধরে চিঠি পাননি স্বামীর। কল্যাণবাবুর চিঠি নিয়ে এসেছিলাম। সে কী আনন্দ।

অসুবিধা, কষ্ট, ঝামেলা সবই ঠিক। তবে কল্যাণবাবুরা কাম্পুচিয়ার গভীর জংগলে আংকর পুনরুদ্ধারের যে মহান কাজ করছেন তার জন্য শুধু কাম্পুচিয়া নয়, সারা পৃথিবীর মানুষ থাকবে কৃতজ্ঞ। সেটাই হবে ভারতের অবদান। □

সাধন মুখোপাধ্যায়

ফটো : লেখক

চিত্তবাবুর মৎস্যপ্রেম



'একটা কই মাছ আধ সের হয় দেখেছ?'

'দেখিনি, শুনেছি। বাওয়ালী মোড়ল জমিদারদের পদ্মপুকুর 'হোদ' হয়েছিল বহু বছর – তার থেকে আশুবাবুর বড়ছেলে নাকি পচা পিঁপড়ের ডিম দিয়ে কয়েকটা আধ সের ওজনের বড়বড় কই মাছ ধরেছিলেন। সে কাল গুজরে গেছে, আর কোথাও কোন পুরনো মাছের প্রাণ বাঁচানোর উপায় নেই। স্বাধীনতার পর থেকে লোক সংখ্যাও বাড়ছে। দ্রব্যমূল্যও ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। উৎপাদন বাড়লেও বিপুল জনসংখ্যার সঙ্গে সমান তালে খাদ্যাহার যোগানো যাচ্ছে না বলে অভাবী মানুষরা পুকুর-খাল-বিল সব ছেঁচে ফেলে পুরনো মাছের বংশ ধ্বংস করে ফেলছে, বীজ আর কোত্থেকে হবে? নদী আর সমুদ্রকেও যদি ছেঁচে ফেলতে পারত তাও ছাড়ত না মানুষ। এখন যদি বলে কেউ, আধ কেজি কই-মাগুর-শিঙি মাছ ধরেছি, তবে তা গালগল্প বলে বিশ্বাস করতে হবে। মোড়ল জমিদারদের চিড়িয়াখানার পশ্চিম পাশের গোলাপবাবুদের পুকুরটা ছেঁচে ছিল, তাতে সাত সের ওজনের বানমাছ পাওয়া গিয়েছিল। এক মণ ওজনের পোনামাছ ছিল। দীঘি থেকে একটা খুব বড় কাৎলা মাছ বর্ষাকালে কিভাবে যান দিয়ে উঠে গিয়ে ধানক্ষেতের মধ্যে আটকে গিয়ে মারা যায়। শিয়াল-শকুনে খেয়ে ফেলে; তার কানকোর ডালাদুটো ছিল বিড়ি-বাঁধা কুলোর মতো। গোলাপবাবুদের গোলকধাঁধা বাড়ির বৈঠকখানায় মাছের বড় বড় আঁশ দিয়ে পদ্মফুল, গোলাপ করে রেখেছেন জমিদার গিন্নিরা, আমি স্বচক্ষে দেখে এসেছি।'

চিত্তরঞ্জন হালদারের কেবল মাছের গল্প। মথুরাপুর থানার পাটকেলবেড়িয়া গ্রামের মানুষ, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হয়েও তিনি সাহসে ভর করে অনেক আশা নিয়ে গিয়েছিলেন কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিংসে তখনকার মৎস্যমন্ত্রীর কাছে। চিত্তবাবু প্ল্যান দিয়েছিলেন, 'পুরনো দেশি মাছ পুকুর ছেঁচে নষ্ট করে ফেলা আইন করে যদি বন্ধ করতে না পারেন স্যার, – গণতন্ত্রে যার যা খুশি করার অধিকার আছে বলে, তাহলে আমাকে অথবা অন্য লোককে পুরনো দেশি কই, মাগুর, শিঙি, পাঁকাল, বান, চেঙো, বেলে, খলসে, শোল, শাল, বোয়াল, চিতল, 'ভেকটি' (ভেকুট বা কুঁজো), ন্যাদোস, ল্যাঠা, চ্যাং, ট্যাংরা, পুঁটি, মৌরলা, চুনো, চিংড়ি, চাঁদা এইসব মাছ সংরক্ষণের জন্যে টাকা দিন – পুকুর কেটে মাছ কিনে বীজ রক্ষা করি। নইলে দেশি মাছ ক্রমেই দুষ্প্রাপ্য হয়ে যাবে। রোগীকে খাওয়াবার জন্যে মাগুর-শিঙি মাছ কেনা এখন শক্ত ব্যাপার। পঞ্চাশ টাকা কেজি।'

চিত্তরঞ্জন হালদার নাকি অতিভক্তি দেখিয়েও মন্ত্রীবাবুর হৃদয় ভেজাতে পারেননি। সাদা পোনা মাছ বাড়ানোর কথাই নাকি তাঁর প্ল্যান প্রোগ্রামে অনুমোদিত হয়ে আছে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে। অবাঙালিরা দিল্লি মন্ত্রিসভার কর্ণধার হলেও বহু বাঙালি তাঁদের সেক্রেটারি বা সহকারী হয়ে আছেন, তাঁরা কই-মাগুর চেনেনও – যদি পোনার বদলে কই মাগুর চাষে টাকা নিয়োগ করা হয় তবে মন্ত্রীর বিরুদ্ধে কড়া নোট দিলেই কাগজে সাংবাদিকরা লেখালিখি করে ছুঁচোর মল পর্বতে তুলতে পারেন।

অতবড় মন্ত্রী হয়েও চিত্তবাবুর দেশপ্রেমের আবেদন বোঝেননি তিনি। উল্টে নাকি মন্তব্য করে বসলেন, 'আপনি দেখছি এক পাগল! সেই যেমন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক' উপন্যাসে এক পাগল শহরের নার্শারি থেকে নানারকম মহীরুহের বীজ সংগ্রহ করে নিয়ে গিয়ে বিহারের লবটুলিয়ার জঙ্গলে ছড়াতে থাকেন, নানান গাছ হবে – আপনিও দেখছি তেমনি এক খামখেয়ালি লোক।...

চিত্তরঞ্জন হালদার বিমর্ষচিত্তে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করেছেন। তবুও ভাবনার জ্বর তাঁর কমেনি। শেষকালে সকালে বিকালে নিজে কোদাল ধরে এক চাপ এক চাপ করে মাটি কেটে শুকনো ডোবাটার চারপাড় বেঁধে পুকুর কেটেছেন। বেশ গভীর পুকুর। তিন মাস একটানা পরিশ্রম করেছেন। পিঁপড়ে যেমন তিলতিল করে মাটি তুলে বয়ে নিয়ে গিয়ে পাহাড় গড়ে তোলে তেমনি। হয়তো কখনো তাঁর স্ত্রী পদ্মাবতী বা মেয়ে তনুজা, ছেলে যশোদাদুলাল সাহায্য করেছে কিন্তু একাজে তারা তেমন উৎসাহ বোধ করেনি। কারণ যে মানুষ বীজ মরার আশঙ্কায় পুরনো কই-মাগুর এনে না খেয়ে মাঠের জলে বা অন্যের পুকুরে ছেড়ে দেন তাঁর মতো বোকার পিছনে মেহনত করে কোন লাভ আছে?

'এ যুগেও আদর্শের কথা বলে কেউ? ধর্মপুস্তক ছাড়া আদর্শ কোথাও বেঁচে আছে এখন? আছে একটা বাড়িতে কোথাও?' একথা পদ্মাবতীর। কাব্যিক দীঘল চোখে তাঁর নিদারুণ বিরক্তি। ক্লাস-নাইনে-পড়া ছেলে যশোদাদুলালকে চিত্তবাবু শিক্ষা দেন, 'মানুষের উপকারে লাগাই ধর্মের মূলকথা। উপকার করে যাও। প্রত্যুপকারের প্রত্যাশা কর না।'

পদ্মাবতী ঝংকার দিয়ে ওঠেন, 'কেন, ওকে ওসব শিক্ষা দিচ্ছ? জীবনটা মহাপুরুষদের মতো বেকার হবে? উপকার করলেই মানুষ ক্ষতি করে। কেন, মানুষের জ্বালা তুমি মেটাও নি? মানুষ একটা পৃথিবী পেয়েছিল, দুটো পৃথিবী পায়নি কেন সেটাই তার দুঃখ।'

মেয়েলি স্বরে তোতলামি করে বলেন চিত্তবাবু, 'দুঃখ নয় গো সীতেরানী, পরিতাপ। কথা যখন বলো শব্দটা ঠিক ঠিক প্রয়োগ

করো। যেমন কোন প্রেমিকা তার পেমিককে লিখল, তোমার জন্যে আমি অপেক্ষা করব। শব্দটা হবে, প্রতীক্ষা। এক সাধুকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আপনার গলার মালায় যে রুদ্রাক্ষ আছে তা কি খুব শক্ত! সাধুজী বললেন, না এটা নিরেট!'

চিত্তবাবু হাত দোলাতে দোলাতে দু-পাশে নজর ফেলে পথ চলেন। সামনেটা তাঁর অত দেখার দরকার নেই। কোথাও কেউ ছিপ ফেলে বা চৌকি গেঁথে মাছ মারছে দেখলেই বলেন, 'আরে আরে, মাছগুলো ধরে মেরে ফেলছ? এগুলো তো পুরনো হলে ডিম ছাড়ত। কত মাছ হত! পোনা চরানো শোল-শাল-ল্যাঠা-চ্যাং মারা খুবই অন্যায় কাজ। ওদের বাচ্চাগুলোকে অন্যমাছে সব খেয়ে নেবে। মেরো না, মেরো না। এটা পাপ কাজ। পুত্রকন্যা হত্যার সামিল।'

খালে বাগদি মেয়েরা যদি কাপড় পেতে 'ম্যাতা' মাছ ধরে তো আকাশ ভেঙে পড়ে চিত্তবাবুর মাথায়। তিনি চেঁচামেচি আরম্ভ করে দেন, 'তোমাদের কি আক্কেল-জ্ঞান কিছু দেয়নি ভগবান। হাঁ গো মেয়েরা, মায়েরা? কত লক্ষ কোটি মাছের ডিম তোমরা ধ্বংস করছ? এক বেলার একটা চচ্চড়ি খাবার জন্যে কত কোটি কোটি ডিম মারা পড়ছে তোমাদের হাতে। উঠে পড়ো - উঠে পড়ো সবাই।'

বাগদি মেয়েরা হাসাহাসি করে। 'পাগ্‌লা' বলে চিত্তবাবুকে আমলই দেয় না। ধানসেদ্ধ করা হাঁড়ির মতো কালো এক বুড়ি বলে, 'ভগমানের চ্যালা! জগৎ-সংসারের মাল 'অক্ষে' কত্তেচে। খাল কি তোমার বাবার?'

'আচ্ছা, আমি থানার বড়বাবুকে জানাব।' বলে চোখ রাঙিয়ে চিত্তবাবু সত্যই থানায় গিয়ে বড়বাবুকে অভিযোগ জানালেন। বড়বাবু সব শুনে বললেন, মাথার একগাছা চুলও আমি ছিঁড়তে অক্ষম ঐ বাগদি গরিব মেয়েদের, চিত্তবাবু – ম্যাতা মাছ ধরা অন্যায় এমন আইন পাশ করিয়ে আনুন আপনাদের এম এল এ-এর কাছে গিয়ে, তিনি বিধানসভা থেকে বিল পাশ করে আনলে তবেই ওদের বিধান করা যেতে পারে। এটা তো গণতান্ত্রিক দেশ। বাগদি মেয়েরা যদি ঘেরাও করে আমার প্যানটুল খুলে নেয় তখন কি আমার ইজ্জৎ রক্ষা করতে এসে আপনি বেনারসী ঘিরে ধরবেন।'

চিত্তবাবু চিত্তভরা পরিতাপ নিয়ে স্বগৃহে ফিরলে, চোখে পড়ে মায়ের কথামতো যশোদাদুলাল জাল ফেলে নতুন পুকুর থেকে মাছ ধরেছে। তাই কুটছেন এখন পদ্মাবতী। আগে তবু চুরি করে মাছ ধরে চিত্তবাবুকে আড়াল করতেন, এখন আর লুকোছাপাও করেন না।

চিত্তবাবু বলেন, 'মাছ মারছ তো কোথা থেকে আমি মাইনের অর্ধেক টাকা খরচা করে মাছ কিনে এনে চাষ করেছি – এখন তোমরাই তা খেয়ে নিচ্ছ!'

পদ্মাবতী বলেন, 'কেন, আমি কি বিধবা হয়েছি যে মাছ খাব না? ছেলে মেয়েরা কি বাপকে হারিয়েছে যে মাছের মুখ দেখতে না পেয়ে রোজ রোজ নিরামিষ খেয়ে তোমার মতো পেটে চড়া পড়ে যাবে?'

চিত্তবাবু অর্ধেক ভাত খেয়ে পাতের অর্ধেক ভাতটা পুকুরের মাছের পেটে দেন বলে পদ্মাবতী আজকাল থালা ভরে স্বামীকে ভাতও দেন না। ভাত চাইলে বলেন, 'পুকুরে ঢালার ভাত নেই। জমিতে ধান তোমার কত হয় খেয়াল রাখো? ঐ পুকুরটা জমির পাশে কেটে যদি জল দিয়ে বোরো ধান চাষ করতে তাহলে কি তিনমাস খোরাকির টান পড়ত বাজারের কাঁকর চাল খেয়ে আমার একটা দাঁত চটে গেল।'

চিত্তবাবু পদে পদে সবার কাছে হেরে যাচ্ছেন। পঞ্চায়েত প্রধান, বি ডি ও, মন্ত্রী কেউই তাঁর আবেদনে সাড়া দিলেন না। সবাই পাগল বলছেন।

পাগ্‌লা চিতবাবু দুটো বাগাতোক পুরনো শোলমাছ কিনে আনছেন বাজার থেকে দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে। দেখে, তাঁদের গ্রামের হরিমোহন বলে, 'চিত্তদা, মাছ দুটে আমাকে দেবেন নাকি, পুকুরে ছাড়ব।'

'তোমার আবার পুকুর কোথা

'আছে আছে। একটা ডোবা। তাতে রাখলে বাচ্চা ছাড়বে।'

'হাঁ, তোমার পেটে বাচ্চা ছাড়বে। অতটুকু ডোবায় এই বড়মাছ থাকতে পারবে না। জল কমলে উঠে পালাবার সময় কেউ মেরে দেবে।'

বর্ষা নামলে, যখন প্যাটকেল বেড়িয়ার গোটা মাঠ জলে থই থই করে চিত্ত হালদারের চোখে কেন ঘুম নামে না ভাবতে থাকেন পদ্মাবতী পানের বাটা কোলের কাছে নিয়ে সুপারি কুঁচোতে কুঁচোতে। তিনিও চর দিয়ে আছেন স্বামীকে। এক সময় বলেন, 'শোবে না তুমি?'

'কি রকম মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে।' বলেন চিত্তবাবু। অবশেষে শুয়ে পড়েন তিনি। বৃষ্টির গান শুনতে থাকেন। ঘুমোন না আদৌ। অপেক্ষা করেন পদ্মাবতী কখন ঘুমোবেন। স্ত্রী অনেকদিন পরে আজ এসে স্বামীর বিছানায় শুয়েছেন। ছেলেমেয়ে দুটি ওঘরে ঘুমোচ্ছে। কিছুক্ষণ পরে নাক ডাকতে লাগল পদ্মাবতীর। বৃষ্টিও তখন ধরে গেছে। আস্তে আস্তে বিছানা ছেড়ে উঠে গিয়ে টর্চ জ্বেলে গোলার নিচে থেকে কোদালটা বার করে নিয়ে অন্ধকারে চললেন নতুন পুকুরের পাড়ে। যানের কাছে এসে আলো জ্বেলে দেখলেন জমির জল নামছে অল্প অল্প। কই শিঙি মাগুর পাঁকাল পুঁটি শোল ল্যাঠা মাছগুলো উঠে পালাবার জন্যে বুক বেয়ে ছুটে ছুটে আসছে। দুটো জল ঢোলা সাপ। আলো জ্বেলে রেখে যেই পুকুরের যান কাটিয়ে দিতে চললেন কোদাল হাতে তুলে, হঠাৎ পিছন থেকে পদ্মাবতী তা ধরে ফেলে বলে উঠলেন, 'যান একদম কাটবে না। পুকুর ভরা মাছ তুমি বার করে দেবে?'

'পদ্মাবতী, সরে যাও তুমি। খোদার ওপর খোদকারী করো না। আমার পুকুর আমি কেটে দোব।'

পদ্মাবতীকে ঠেলা মেরে সরিয়ে দিয়ে কোদালের কোপ মেরে মেরে যানটা কেটে দিতেই বানের তোড়ের মতো জলা জমির জল এসে ঢুকতে লাগল পুকুরে হুড়হুড় শব্দ তুলে। পুকুর উপচে উঠলো।

পদ্মাবতী স্থির হয়ে সেই দৃশ্য দেখতে লাগলেন। আর তার ক্ষ্যাপা পাগল স্বামী তখন মনের আনন্দে বলছেন, 'যা বেটা বেটিরা, পুকুর ছেড়ে মাঠে-ময়দানে চলে যা। ডিম ছাড়গে যা। দু-হাজার টাকার মাছ -- এক লাখ টাকার মাছে পরিণত হবে। মানুষের মাছের কষ্ট যাবে।'

পদ্মাবতী দীর্ঘশ্বাস ফেলে চলে এলেন। পা ধুয়ে এসে ছেলেমেয়েদের জাগালেন। বললেন, তোমার বাপ পুকুরের যান কাটিয়ে দিয়েছে। মাছ সব বার করে দিচ্ছে। এমন পাগল মানুষ থাকে!' মেয়ে তনুজা বলল, 'তুমি যান বন্ধ করে দেবার ভয়ে তো বাবা এখন সারারাত পুকুর পাড়ে বসে থাকবে। যান খোলা থাকলে মাছ যাবে ও যেমন, আবার আসবেও।'

পদ্মাবতী বললেন, 'আমার বয়ে গেছে যান বন্ধ করতে যাবার। ঠাকুরের দিব্যি, আমি আর ঐ পুকুরের মাছ খাবও না, ছোঁবও না। তুই তো তোর বাপের টান টানিস। বোঝা যাবে তোর বিয়ের সময় মাছ কোথা পায়। পোনাচাষ করলে কাজে লাগত না, দেশি মাছ বাড়াচ্ছে।'

যশোদাদুলাল শুয়ে পড়ল।

পদ্মাবতীও শুয়ে পড়লেন।

তনুজা তখন হ্যারিকেন হাতে নিয়ে গিয়ে বাবার কাছে গেল বাগানটা পার হয়ে। গিয়ে দেখল বাবা দাঁড়িয়ে আছেন। বলল, 'এসো বাবা, শুয়ে পড়বে এসো। 'আসলা'র দিন, সাপে কামড়ে দেবে।'

'তোর মা, যশোদাদুলাল শুয়ে পড়েছে

'হাঁ।'

'চল্ তবে। এতক্ষণ প্রায় সব মাছ বেরিয়ে গেছে। খবরদার ওরা যেন বাঁধ বেঁধে না দেয়। তাহলে মাথা ফাটিয়ে দোব।'

তনুজা বলল, 'মা আর এই পুকুরের মাছ ছোঁবে না খাবে না, বলেছে ঠাকুরের দিব্যি দিয়ে।'

'বলেছে?' চিত্তবাবু যেন মহা আশ্বস্ত। বললেন, 'যাক, বাঁচা গেল।'

তিনি এসে শুয়ে পড়তেই আবার বৃষ্টি নামল। বৃষ্টির গান শুনতে শুনতে পরম আনন্দে এক সময় ঘুমিয়ে পড়লেন। □

আবদুল জব্বার

'গর্ভপাতের বিজ্ঞাপন এখনই বন্ধ করা উচিত

এই তো, বিতর্ক বেশ জমে উঠেছে। কেউ বলছেন, গর্ভপাতের বিজ্ঞাপন জনকল্যাণকর, এই বিজ্ঞাপনদাতারা মানব প্রেমিক। কেউ বলছেন এই বিজ্ঞাপন সমাজের গালে দুষ্ট ব্রনের মত, এটা সামাজিক অবক্ষয়ের দলিল। আবার কেউ বলছেন, গর্ভপাত না ঘটিয়ে এইসব অবৈধ সন্তানকে সামাজিক স্বীকৃতি দেওয়া হোক আপনি কী বলেন?

আমরা লক্ষ্য করছি, এই বিতর্কে মহিলারা খুব বেশি অংশ গ্রহণ করছেন না। অথচ মূলত তাঁদের কেন্দ্র করেই এই বিতর্ক। তাঁরা কি চুপ করে থাকবেন না সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে মতামত জানাবেন?

এই স্বেচ্ছাচার চলতে দেওয়া যায় না

গর্ভপাত একটি বিষম বিষয়। অনেক পরিবার ২টি বা ৩টি সন্তানের পর আর একটি সন্তান গর্ভে আসার সংগে সংগে চিন্তায় ভেঙে পড়েন। ভাবতে থাকেন হয়ত আর সুখে থাকা যাবে না। অতিরিক্ত সন্তানটি সব তছনছ করে দেবে। অতএব সন্তানটিকে আর আলো-বাতাসের মুখ দেখতে দিলে চলবে না। গর্ভপাত করানোর জন্য অলিতে গলিতে 'মুক্তি ক্লিনিক' 'পলি ক্লিনিক' ইত্যাদি গড়ে উঠেছে, জোরদার আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে দু'হাত তুলে ডাকছে। সন্তানটিকে নষ্ট করার জন্য বেচারা স্বামী স্ত্রীকে গর্ভপাত ক্লিনিকের অন্ধকার ঘরে পৌছে দেয়। গর্ভপাত কখনও কখনও আবশ্যক হয়ে ওঠে। চিকিৎসক তা নির্ধারণ করবেন। প্রসূতির অবস্থা বুঝে সে ব্যবস্থা তিনি নেবেন। কিন্তু বর্তমানে তা বিবেচনা করা হয় না। যেহেতু দুটি বা তিনটি সন্তানের পর আর একটি সন্তান এসেছে, অতএব সুখ বিঘ্নিত হবার আশঙ্কা, তাকে হঠাও, গর্ভপাত ঘটাও। কেন? তা কেন করা হবে? সন্তান যখন আর কাম্য নয় তখন গর্ভ-সঞ্চার যাতে না হতে পারে সে ব্যবস্থাই কি নেওয়া যুক্তিযুক্ত নয়? গর্ভপাতে কি স্ত্রীর শারীরিক ক্ষতি হয় না?

আজ গর্ভপাতের বহু ক্লিনিক গজিয়ে উঠেছে। বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে তারা নিরন্তর ডাক দিচ্ছে। আর বহু মহিলা সেই ফাঁদে পা দিচ্ছেন। গর্ভপাত সহজলভ্য হয়ে যাওয়ায় গ্রাম-গঞ্জ থেকে শহর পর্যন্ত প্রতিটি স্তরের ১৩/১৪ বছরের মেয়েরাও খোলামেলা মেলামেশায় আজ দুর্বার। অজ্ঞানতার জন্য তারা বিপদে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে। দিশেহারা হয়ে উদ্ধার পাবার জন্য বিজ্ঞাপন নির্দেশিত পথে পা বাড়ায়। সেখানকার চিকিৎসক তাদের দুর্বলতার সুযোগে নিজেদের আখের গোছায়। গর্ভপাত করে যেন স্বস্তি পেল এই আনন্দে মেতে ওঠে বহু অবিবাহিত যুবতী। নিজেদের সর্বনাশ করে সব বিকিয়ে বসে। আমাদের মত দেশে এই স্বেচ্ছাচার চলতে দেওয়া যায় না। সমাজ ক্ষয় রোগে পংগু হবে। সামাজিক মান-মর্যাদা ক্ষুন্ন হবে। নানান সমস্যার উদ্ভব হবে।

অনেকের কাছে শোনা গেছে, তারা সংসারকে ছোট রাখার জন্য ২/৩ বার গর্ভপাত ঘটিয়েছেন। এক্ষেত্রে গর্ভপাত পাপের আসনে ঠাঁই পেল। পাপ এইজন্য যে, দ্বিতীয়বার গর্ভপাত ঘটানর অর্থ স্ত্রীর প্রতি অমানবিকতা। প্রথম গর্ভপাত অনিচ্ছা সত্ত্বেও মেনে নিতে হয়। অজ্ঞানতা বা নিজ ভুলের মাশুল দিতে হয়। দ্বিতীয়বার ওপথে না গিয়ে পূর্বাহ্নেই সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

অতএব মনে করি, বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে গর্ভপাতকে সহজলভ্য না করে এখনই তা বন্ধ করা হোক।



রফিকুল হাসান
মাদপুর, হুগলি

শুধু বিজ্ঞাপন বন্ধ করে কোন লাভ হবে না।

আজকাল রাস্তাঘাটে চলার সময় ও বিভিন্ন সংবাদপত্রে আর দশটা পণ্যসামগ্রীর মত গর্ভপাতেরও হরেক রকম বিজ্ঞাপন চোখে পড়ে। তার কোনটাতে 'সবচেয়ে কম খরচে', 'নিরাপদে' গর্ভপাত করানর প্রতিশ্রুতি; কোনটাতে বা 'না, আর নয় অনাকাঙ্ক্ষিত মাতৃত্ব' প্রভৃতি।

বস্তুত এসব বিজ্ঞাপনের দ্বারা মানুষের আদিম সুপ্ত কামনা-গুলোকে উস্কে দেওয়া হচ্ছে যার ফলে আমাদের জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সংঘটিত হচ্ছে অনেক অপরাধ। বর্তমানে অনেক যুবক যুবতী প্রেমের নামে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনে অতিমাত্রায় আগ্রহী। তাদের কাছে প্রেম মানে প্রাথমিকভাবে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন। অথচ তাদের অনেকেরই যৌনশিক্ষার একান্ত অভাব। ফলে অনেক যুবতী অবৈধ মাতৃত্বের অধিকারিণী হয়ে পড়ে। তার প্রমাণ গর্ভপাতের ক্লিনিক-গুলোতে অবিবাহিত যুবতীদের ক্রমাগত ভিড় করা। আর সেই অনাকাঙ্ক্ষিত মাতৃত্ব মোচনের ফলে কেউ বা ভবিষ্যতে সন্তান ধারণের ক্ষমতা হারাচ্ছে কেউ বা শিকার হচ্ছে অন্য কোন জটিল ব্যাধির, এর বাইরেও যে এ ধরনের কত অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে তার হিসাব আমরা ক'জন রাখি।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, বিজ্ঞাপন বন্ধ করেই কী এ সমস্যার সমাধান সম্ভব? মোটেই না। তাছাড়া গর্ভপাত আইন-সিদ্ধ রেখে বিজ্ঞাপন বন্ধ করার যুক্তি হাস্যকর-ও বটে। কেননা ইতিপূর্বে সরকার মাতৃদুগ্ধের ব্যবহার বাড়ানোর জন্য বেবিফুডের বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ করেছেন। তাতে কোন লাভ হয়নি। কারণ যার যা প্রয়োজন সে তা খুঁজে বার করবেই। তাই আমার মতে যুব সমাজকে এই অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করতে হলে বিজ্ঞাপন নয়, হয় গর্ভপাত নিষিদ্ধ করতে হবে (বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া), নয়তো আমেরিকার মত অবৈধ সন্তানদের সরকারি ও সামাজিক স্বীকৃতি দিতে হবে।



অশোককুমার ভৌমিক
কলকাতা-৬০

বিজ্ঞাপনদাতারা মানবপ্রেমিক

গর্ভপাত করানর বিজ্ঞাপনেরও একটি বিশেষ প্রয়োজন আছে।

জীবনের ছন্দকে যাঁরা কাব্যে রূপ দেন তাঁরা কবি বা সাহিত্যিক কিন্তু যাঁরা জীবনের সমস্যাকে সমাধান করেন তাঁরা কবিও নয় সাহিত্যিকও নয়। এঁরা তাহলে কি? সে কথাই এখানে লিখছি

ভয়ংকর জীবনসংগীতের আলাপ শুধু কোন জীবনেরই নয়, তা সমাজের পক্ষেও খুব ক্ষতিকর। কেন না অবৈধ উষ্ণতার তীব্র আকাঙ্ক্ষা নারী-পুরুষকে কিভাবে যে বিচলিত বেসামাল করে তোলে তা বলা দুষ্কর। এই অনাকাঙ্ক্ষিত অভিশাপ নারীজীবনকেই ব্যাথাতুর করে তোলে বেশি। ফলে সেই নারী বা মেয়ের হয় জীবন মরণ সমস্যা। সমাজে তখন তাঁর বেঁচে থাকা দায় হয়ে পড়ে। সেই নারীকে বা মেয়েকে যাঁরা

গর্ভপাতের জন্য বিজ্ঞাপন দিয়ে সাদর আমন্ত্রণ জানায়, পৃথিবীতে তাঁদের গৌরবের সঙ্গে পূর্ণ নারীত্বের মর্যাদায় বেঁচে থাকার অধিকার করে দেন তাঁদেরকে মানবপ্রেমিক না বলে অন্য কিছু বলার ভাষা আমার নেই।

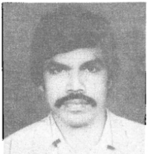
কৌতূহল চেপে যে সব মেয়েরা ব্রহ্মচারিণী হয়ে থাকতে চান বা পারেন তাঁদের কথা আলাদা। কিন্তু যাঁরা কৌতূহল চেপে ব্রহ্মচারিণী হয়ে থাকতে পারেন না তাঁদের জন্য (অবৈধ সন্তান) গর্ভপাতের বিজ্ঞাপন বন্ধ করা উচিত নয়।



গিরিশ রায়বর্মন
খড়্গপুর

সামাজিক অবক্ষয়ের দলিল

বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য সভ্যতার নিম্নচাপে উদ্ভূত অনেক কিছু প্রাসঙ্গিক, অপ্রাসঙ্গিক জীবন-চর্যার ঝড়ো বাতাস আমাদের শান্তিপ্রিয় জীবনের নিস্তরঙ্গ বায়ুমণ্ডলে এসে বাসা বেঁধেছে, সেই রকম একটি পাশ্চাত্য সভ্যতার ঝড়ো বাতাসের নাম গর্ভপাত। কয়েকবছর আগেও গর্ভপাত শব্দটি উচ্চারণ করার আগে আমাদের জিভের তলায় এই অপ্রিয় শব্দোচ্চারণের জড়তা যেন গন্ধমাদন পর্বতের আকৃতি নিয়ে আটকে থাকতে চাইত। কিন্তু আজ এই কম্পিউটারের হাত ধরে চলা যুগে এ শব্দটি যেন সব কিছু জড়তার ঊর্ধ্বে। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার সরকারি মদতেই বেসরকারি বহু প্রতিষ্ঠান গর্ভপাত প্রতিষ্ঠানের কারবারে ফুলে ফেঁপে লাল। উঁচুহারের দক্ষিণার দাক্ষিণ্যে তাদের কারবারে আজ অর্থনৈতিক দখিণা-পবনের সমারোহ, একথা আজ সর্বজনস্বীকৃত যে গর্ভপাত-প্রতিষ্ঠানগুলি আজ জন্মনিয়ন্ত্রণের আদর্শের নামাবলীটি ছেড়ে এককথায় অবৈধ সন্তানের যমাগার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ব্যাঙের ছাতার মত অলিগলিতে গজিয়ে ওঠা এইসব প্রতিষ্ঠান যেনতেন প্রকারেণ অর্থনৈতিক মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে বিবেকবোধশূন্য মানবিকতাহীন হয়ে উঠছে ক্রমশ, আর এদের সাহায্যে নামীদামী থেকে পেটোয়া এবং হাতুড়ে ডাক্তার নার্স ধাত্রীদের সনোটস্থ উদারতার কথা তো আজ কারো অজানা নয়, আর এ ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য কতই না বাহারী বিজ্ঞাপন। লাইট পোস্ট, ট্রেনের কামরা, বাস, ট্রাম, ট্রেনের স্টেশন চত্বর, পথেঘাটের মূত্রাগার, এমনকি অফিস, বাড়ির দেওয়ালেও গর্ভপাতের বিজ্ঞাপনের বিজয় রথযাত্রা অব্যাহত। হিন্দি, ইংরেজি ছায়াছবির অশ্লীল পোষ্টারের মতো এইসব পোষ্টার সামাজিক অবক্ষয়ের এক একটি দলিল। সত্যিকথা বলতে কি এইসব বিজ্ঞাপনের অনৈতিক প্ররোচনায় কত যে যুবক যুবতী বিপথগামী হয়ে সমাজের চারিত্রিক বিশুদ্ধতা দিনকে দিন কলুষিত করে তুলছে তা সহজেই অনুমেয়। উদ্দেশ্য-বিহীন গর্ভপাতের আর এক নাম মাতৃত্বের প্রবঞ্চনা। সর্বোপরি মাতৃজাতির অবমাননা। এই কথাটা মনে রেখে সরকারের এখনই প্রয়োজন গর্ভপাতের যাবতীয় বিজ্ঞাপনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা। সুস্থ সমাজ গড়তে হলে অসুস্থতার মূলোৎপাটন অতি আবশ্যক।



প্রবীর হালদার
বরানগর

বিজ্ঞাপনগুলি জনকল্যাণকর

সন্তানকে পৃথিবীতে আনা একটা আনন্দের ঘটনা অথচ মাঝে মাঝে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যখন তাই সন্তান গর্ভে এলে বাবা-মা অথবা পরিবারের অন্যান্য লোক বিব্রত হয়ে পড়েন এবং তারই ফলস্বরূপ অনেক মেয়েই গর্ভপাত ঘটাতে বাধ্য হন।

গর্ভপাত এখন আইনত স্বীকৃত। প্রতিদিনই খবরের কাগজ, বিভিন্ন পত্রপত্রিকা অথবা ট্রেনের কামরায় এই বিজ্ঞাপনের ছড়াছড়ি দেখতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন রকমের আশ্বাসের বাণী এই বিজ্ঞাপনগুলিতে দেখতে পাওয়া যায়। অনেক সময় মেয়েরা বিরূপ পরিস্থিতির শিকার হয়ে অবাঞ্ছিত গর্ভ-সঞ্চার এড়াতে পারে না। তখন মেয়েটি এই বিজ্ঞাপনের সাহায্যে খুব সহজেই একটি নির্দিষ্ট ঠিকানায় গিয়ে গর্ভপাত ঘটিয়ে অবাঞ্ছিত গর্ভসঞ্চারের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারে।

এছাড়াও আমাদের দেশে জনসংখ্যা যে পরিমাণে বেড়ে চলেছে তাতে গর্ভপাতের বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ না করাই উচিত। কারণ এই বিজ্ঞাপনগুলি জনসাধারণকে আকৃষ্ট করে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের সুষ্ঠু পথ দেখাবে। বিজ্ঞাপনগুলি প্রচার না হলে মানুষ জানতে পারবে না কোথায় গেলে সুষ্ঠুভাবে এবং বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে গর্ভপাত ঘটাতে পারবে। এবং এই অজ্ঞতার দরুন অনেকেই হাতুড়ে ডাক্তারের কাছে গর্ভপাত করাতে গিয়ে জটিল পরিস্থিতির শিকার হন অথবা মৃত্যু মুখেও পতিত হন। সুতরাং গর্ভপাতের বিজ্ঞাপন বর্তমান যুগের পরিস্থিতিতে একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিজ্ঞাপণ এবং জনকল্যাণকর। তাই গর্ভপাতের বিজ্ঞাপন কখনই নিষিদ্ধ করা উচিত নয়।



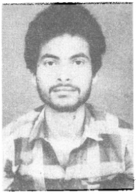
মধুশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়
কলকাতা-২৮

এই বিজ্ঞাপন বিবাহিত অবিবাহিত সবার উপকারের

"গর্ভপাতের বিজ্ঞাপন এখনই বন্ধ করা উচিত"–নয় বলে আমি মনে করি। আর এও মনে করি এটা কখনই বন্ধ করা উচিত নয়। গর্ভপাতের বিজ্ঞাপন বা ব্যবস্থা আছে বলে যে সবাই অবাঞ্ছিত সন্তানের জন্ম দেন তা নয়। এই ঘটনা হঠাৎ ঘটতে পারে। বিবাহিত নারী পুরুষেরা নিজেদের জৈবিক ব্যাপারকে সংযত করতে পারেন এবং নিজেদের সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকেন। কিন্তু যাঁরা অবিবাহিত তাঁদের উপর এই জোর চলে না বা এঁদের অনেকের সংযম থাকে না। যাঁরা পারেন তাঁরা যথার্থ মানুষ কিন্তু যাঁরা পারে না তারা মানুষ হয়েও মান আর হুঁসকে হারিয়ে ফেলে, সামাজিক দোষাচারে–জড়িয়ে পড়ে।

কারণ হিসাবে বলা যায় যে, বিবাহিত কোন নারী কোনো কারণে সন্তান না চান তাহলে তিনি কোন জায়গা থেকে সহজেই গর্ভপাত করাতে পারেন। আবার যদি অবিবাহিত বা অপরিণত বিবাহযোগ্য নারী সামাজিক নিরাপত্তাকে অতিক্রম করে শারীরিক সংযম হারিয়ে নতুন যৌবনকে বুঝতে না পেরে 'মা' এর আকার ধারণ করে তাহলে তারা দিশেহারা হয়ে পড়ে। সমাজের কাছে হেয় প্রতিপন্ন হবার ভয় নিয়ে কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে পড়ে। লজ্জা, ভয়ে কাউকে কিছু বলতে পারবে না আবার কোন হাতুড়ে ডাক্তারকে দেখাতে সাহস করে না। যদি গর্ভপাতের নির্দিষ্ট কোন ব্যবস্থা না থাকত, শেষে হাতুড়ে ডাক্তারদের শরণাপন্ন হতে বাধ্য হত। এর ফলে হাতুড়ে ডাক্তারদের চিকিৎসায় শেষ পর্যন্ত কপালে হাত উঠে যায়। এমন কি জীবন সংশয় পর্যন্ত ঘটতে পারে। তাই গর্ভপাত যেখানে সরকার স্বীকৃত, সেই স্থানে গিয়ে গর্ভপাত ঘটানো উচিত।

তাই গর্ভপাতের বিজ্ঞাপন বা গর্ভপাতের নির্দিষ্ট ব্যবস্থা থাকলে বিবাহিত এবং অবিবাহিত সবরাই উপকারে আসে।



মৃণাল কান্তি অধিকারী
বাইনাল, হাওড়া

দেবশ্রী রহস্য

অনন্ত তদন্তের শেষ কোথায় ?



ডাঃ শ্যামাপদ রায়চৌধুরীর অস্বাভাবিক মৃত্যুর পর পুলিশ প্রশাসন যেভাবে নড়ে-চড়ে উঠেছিলেন, তাতে আমাদের সংগত ধারণা হয়েছিল, নিখোঁজ দেবশ্রী-সত্যনারায়ণের হদিশ এবার মিলবে। আরও মিলবে শ্যামাপদবাবুর হোটেলে অস্বাভাবিক মৃত্যুর গুঞ্জিত রহস্যের কিনারা। না, কোনটাই মেলেনি। বরং গোটা ব্যাপারটাই এখন ধামাচাপার অন্ধকারে নিমজ্জিত। রাজ্যের পুলিশ মহলের বিরুদ্ধে যত অভিযোগই থাক না কেন, তাঁরা অতীতে অনেক কঠিন রহস্য উন্মোচনে নিপুণ দক্ষতা দেখিয়ে জনগণের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। এই তো কিছুদিন আগে কলকাতা পুলিশের তরুণ অফিসার তপন বসু হারিয়ে যাওয়া এক শিশুকে সুদূর বাংলাদেশের গন্ডগ্রাম থেকে উদ্ধার করে আনলেন। তাঁর সেই সাহসী অভিযান নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য। এ রকম হাজার হাজার উদাহরণে গর্বিত পুলিশ প্রশাসন আজও সন্ধান পেলেন না নিখোঁজ দেবশ্রী ও সত্যনারায়ণের। কিন্তু কেন? এই জিজ্ঞাসা শুধু আমাদের নয়, লক্ষ জনতার। সেই সংগত জিজ্ঞাসার সঠিক উত্তর খুঁজে পেতে পরিবর্তন নিউজ ব্যুরো যোগাযোগ করেছিল সংশ্লিষ্ট মহলের সংগে।

তাঁদের সেই একই কথা, তদন্ত চলছে। সেই তদন্ত কবে শেষ হবে, তা কেউ বলতে পারছেন না। এই নিয়েই বর্তমান প্রতিবেদন। সংগে আছে দেবশ্রীর মা শক্তি দেবীর সাক্ষাৎকার।

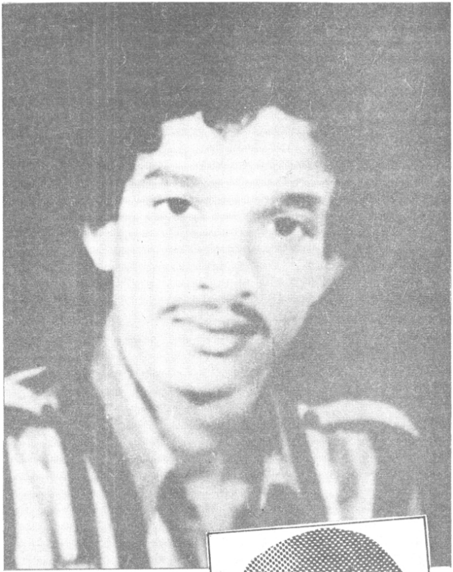
পাঁচ মাস অতিক্রান্ত। হাওড়া পুলিশ এখনও পর্যন্ত ডাঃ শ্যামাপদ রায়চৌধুরীর মৃত্যু রহস্যের কোন কিনারা করে উঠতে পারল না। শ্যামাপদবাবুর মৃত্যুকে ঘিরে যে রহস্যের সূত্রপাত হয়েছে তা কবে শেষ হবে, তা কেউ জানে না। হত্যা না আত্মহত্যা—এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতেই পুলিশের এতদিন চলে গেল। তাই গত ১৬ সেপ্টেম্বর হাওড়ার মেঘদূত হোটেলের ৬১৮ নম্বর ঘরের সেই রহস্য ঘিরেই ইতিমধ্যে চারিদিকে নানা ধরনের অভিযোগ তৈরি হচ্ছে। বলা বাহুল্য, অভিযোগের কেন্দ্রবিন্দু হাওড়া পুলিশ। অনেকেই তাই প্রশ্ন তুলেছেন, শ্যামাপদবাবুর মৃত্যুর ঘটনা কি পুলিশ চেপে দিতে চাইছে?

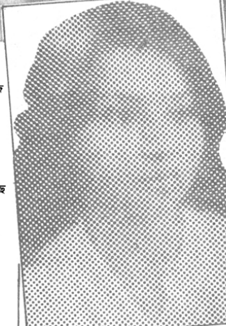
গত বছর সেপ্টেম্বর মাসের ১৫ তারিখে নিখোঁজ দেবশ্রী রায়চৌধুরীর বাবা ডাঃ শ্যামাপদ রায়চৌধুরী মুখরাম কানোরিয়া রোডের মেঘদূত হোটেলের ৬১৮ নম্বর ঘরে এসে ওঠেন। পরদিন সকালে বেয়ারা এসে দরজা ঠেলে শ্যামাপদবাবুর সাড়া পায় না। পরে হোটেলের মালিক পুলিশে খবর দেন। পুলিশ এসে দরজা ভেঙে শ্যামাপদবাবুকে মৃত অবস্থায় দেখতে পায়। শ্যামাপদবাবুর বিছানা থেকে পুলিশ দুটি মরফিনের ভাঙা অ্যাম্পুল ও একটি ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জ পায়। পুলিশ থেকে প্রাথমিকভাবে দাবি করা হল, শ্যামাপদবাবু আত্মহত্যা করেছেন। কিন্তু পুলিশ এই দাবির পিছনে এখনও পর্যন্ত কোন অকাট্য যুক্তি দিতে পারেনি।

শ্যামাপদবাবুর মৃত্যুকে অস্বাভাবিক মৃত্যু বলে চিহ্নিত করে গোলাবাড়ি থানায় একটি ডায়েরি করা হয়। ডায়েরি নম্বর ইউ. ডি. ১৬/৮৭।

নিয়মমত শ্যামাপদবাবুর দেহ ময়না তদন্তের জন্য হাওড়া জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠান হয়। সেখানে ময়না তদন্ত করেন হাওড়া হাসপাতালের ডাক্তার ডাঃ লাহিড়ী। জানা গেছে ইতিমধ্যেই ডাঃ লাহিড়ী ময়না তদন্তের রিপোর্ট তৈরি করে ফেলেছেন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত তিনি তাঁর মতামত দেননি। শ্যামাপদবাবুর মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান করার জন্য ফিজিসিস্ট এবং টক্সিকোলজি বিশেষজ্ঞদের সাহায্য চাওয়া হয়। জানা গেছে, এই দুই বিশেষজ্ঞ ডঃ পাহাড়ী ও ডঃ পি. সিনহা এ ব্যাপারে অনুসন্ধান চালান। ইতিমধ্যে হাওড়া পুলিশ ডাঃ শ্যামাপদবাবুর নিকট আত্মীয়স্বজন, তাঁর পাড়ার লোকজন ও নিখোঁজ সত্যনারায়ণ সেনের প্রথম পক্ষের স্ত্রীকে শ্যামাপদবাবুর মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধানের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে।

হাওড়া পুলিশের দাবি, তাঁরা অনুসন্ধানের কাজ শেষ করে ফেলেছেন। তাই স্বাভাবিক কারণেই প্রশ্ন ওঠে, তাহলে কেন এখনও পর্যন্ত মৃত ডাক্তারের মৃত্যু-রহস্যের কিনারা হল না? এর উত্তরে হাওড়া পুলিশের এক মুখপাত্র জানালেন, বিশেষজ্ঞদের অভিমত পাওয়ার পরেই এ ব্যাপারে সঠিক করে সব কিছু বলা যাবে। ঐ মুখপাত্র এও জানান, কয়েকদিনের মধ্যেই বিশেষজ্ঞরা তাঁদের



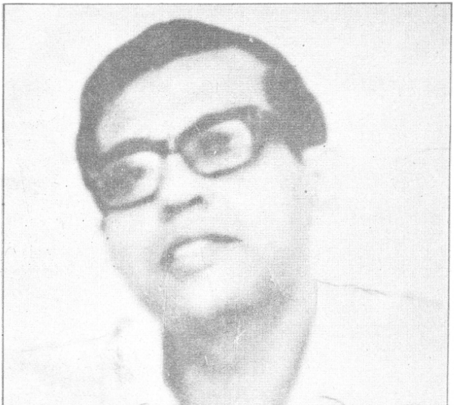


মতামত জানিয়ে দেবেন।

এখনও পর্যন্ত ফিজিসিস্ট ও টক্সিকোলজি বিশেষজ্ঞরা তাঁদের মতামত জানাননি। বিশেষজ্ঞদের চূড়ান্ত মতামত পেলে হয়তো শ্যামাপদবাবুর মৃত্যু রহস্যের কিনারা হবে।

এদিকে শ্যামাপদবাবুর মৃত্যু ও দেবশ্রী-সত্যনারায়ণ-এর নিখোঁজ হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে একদিকে যেমন রহস্য সৃষ্টি হয়েছে তেমনি কয়েকজন উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসারের মন্তব্যকে কেন্দ্র করেও দেখা দিয়েছে নানা প্রশ্ন। রাজ্য পুলিশের একজন অভিজ্ঞ পুলিশ অফিসার সরাসরি রাজ্যের প্রাক্তন আই. জি. (ক্রাইম) অমল দত্তের মন্তব্যের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। ঐ অফিসার বলেন কিসের ভিত্তিতে অমলবাবু ঘোষণা করেছিলেন যে দেবশ্রী সত্যনারায়ণ এখনও বেঁচে আছে? অমলবাবু কেন দেবশ্রী-সত্যনারায়ণের নিখোঁজ হওয়ার আসল ঘটনাকে উদ্ঘাটন করতে সমর্থ হলেন না? ঐ অফিসার বলেন—ধরে নেওয়া যাক, অমলবাবু সরকারি চাকরির শর্ত অনুযায়ী চাকরিতে থাকাকালীন বিভিন্ন কারণে আসল ঘটনা প্রকাশ করতে পারেননি। কিন্তু বর্তমানে তিনি তো চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন। তা হলে কেন জনস্বার্থে তিনি আসল ঘটনা প্রকাশ করছেন না? ঐ অফিসার আরও বলেন যে তাহলে কি ধরে নিতে হবে এর পিছনে অন্য কোন কারণ রয়েছে?

এদিকে রাজ্যের উচ্চপদস্থ অফিসারদের হস্তক্ষেপের পরেও কেন শ্যামাপদবাবুর মৃত্যু রহস্যের কিনারা হচ্ছে না—এ প্রশ্ন বহু সাধারণ মানুষের। মাত্র কয়েকদিন আগের ঘটনা। গত ১ ফেব্রুয়ারি। মেঘদূত হোটেলের





পাশের এক হোটেলে রীনা ভক্ত নামে এক বিবাহিতা তরুণী খুন হল। এই ঘটনার ২৪ ঘন্টার ভেতর পুলিশ রীনা ভক্তের হত্যাকারীকে গ্রেপ্তার করে। অথচ আজ পাঁচ মাস হয়ে গেল রাজ্য পুলিশের প্রায় সব বড় কর্তা শ্যামাপদবাবুর মৃত্যুস্থলে এসে সরজমিনে তদন্ত করে গেলেন, কিন্তু আজ পর্যন্ত তাঁর মৃত্যু রহস্যর কিনারা হল না। শ্যামাপদবাবুর মৃত্যুর পর ডি. আই. জি., প্রেসিডেন্সি রেঞ্জ,ডি. আই. জি.,সি. আই. ডি, ডি. আই. জি,হেড কোয়ার্টার্স,আই. জি. ক্রাইম এবং সর্বোপরি রাজ্যের পুলিশ প্রধান নিরুপম সোম পর্যন্ত বিভিন্ন সময় হাওড়ায় এসে তদন্ত করেন। তা হলে প্রশ্ন জাগে এতজন উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে তদন্ত করা সত্ত্বেও শ্যামাপদবাবুর মৃত্যুর কেন কোন কিনারা হচ্ছে না? তাহলে কি ধরে নেওয়া যেতে পারে আর পাঁচটা মামলার মত ডাঃ রায়চৌধুরীর মৃত্যুর ঘটনাকেও পুলিশ ধামা চাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে?

এ সম্পর্কে হাওড়ার এক উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসারকে জিজ্ঞাসা করা হয় হলো তিনি জানান, তদন্তের কাজ ঠিক মতই করা হয়েছে। বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের রিপোর্ট পাবার পরই এ সম্পর্কে চূড়ান্তভাবে সব কিছু বলা যাবে। তিনি ডাঃ রায়চৌধুরীর মৃত্যুর ব্যাপারে পুলিশের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলি অস্বীকার করেন ও বলেন পুলিশ এ মামলার তদন্ত নিয়মমত করছে। ডাঃ রায়চৌধুরীর মৃত্যু হত্যা না আত্মহত্যা–এ সম্পর্কে তিনি কিছু জানাতে অস্বীকার করেন।

কয়েকদিন আগে ভবানীভবনে সি আই ডির একজন সাব ইন্সপেক্টরকে জিগেস করেছিলাম–দেবশ্রীর কেসটা কী হল বলুন তো। তিনি বলেন, সংবাদপত্রের রিপোর্ট থেকেই আমরা যেটুকু জানতে পারি। এখন আর সি আই ডি অফিসে কোন আলোচনাই হয় না। আগে বহু কেসে দেখা গেছে তদন্ত কারী অফিসাররা কোন কেসের কিনারা না করতে পারলে অন্য অফিসারদের সঙ্গে আলোচনা করতেন। দেবশ্রী কেস মানেই একটা চাপা ব্যাপার। কোন আলোচনা নেই। আরেকজন অফিসারের কাছে এ প্রসঙ্গ তুলতেই তিনি বললেন, ওটা ওপরতলার খেয়োখেয়ি। আমরা কিছুই জানতে পারি না।

৮৬ সালের জুন মাসে দেবশ্রী-সত্যনারায়ণ নিখোঁজ হয়। বছর গড়িয়ে গেল। পুলিশের তদন্ত শেষ হল না। খোঁজ মিলল না দেবশ্রীর। তা হলে দেবশ্রী গেল কোথায়? শেয়ে শেয়ে কেসের মীমাংসা পুলিশ করে ফেলছে। শুধু করতে পারছে না দেবশ্রী কেস। এটা বিশ্বাস করতে পারছে না পুলিশের অনেকেই। ঝানু গোয়েন্দা বলে যাঁদের এখনও কলকাতা এবং রাজ্য পুলিশে নাম আছে তাঁদের অনেকেই এ ব্যাপারে বিস্ময় প্রকাশ করছেন।

সংবাদপত্রে বেরিয়েছে দেবশ্রী কেস নাকি ধামা চাপা পড়ে গেছে। এ বিষয়ে সরাসরি এই প্রতিবেদক প্রশ্ন রেখেছিল ডি আই জি সি আই ডি কমল মজুমদারকে। তিনি স্পষ্ট বলেছেন সে প্রশ্ন ওঠে না। তদন্ত যেমন চলছিল, তেমনই চলছে। বন্ধ করে দেওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। দেবশ্রী সম্পর্কে এর বেশি কিছু তিনি আর বলতে চাননি। তিনি বলেন, সংবাদপত্রে যেভাবে দেবশ্রী সম্পর্কে খবর বেরোচ্ছে তা সব সত্যি নয়। এতে তদন্তের কাজে অসুবিধা হচ্ছে। কমলবাবু এর বেশি আর কোন কথা বলতে রাজি হলেন না। তিনি বললেন, যে টিম তদন্ত করছে তারা এর পিছনেই পড়ে রয়েছে।

এদিকে জানা গেল দেবশ্রী সম্পর্কিত সংবাদ পরিবেশনের জন্য সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে পুলিশ কর্তৃপক্ষ কড়া মনোভাব নিয়েছেন। বিকৃত এবং অসত্য সংবাদ পরিবেশনের জন্য সংবাদপত্র-গুলির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার অধিকার সি আই ডিকে দেওয়া হয়েছে। সি আই ডির এক অফিসার জানালেন প্রয়োজন হলে পুরনো জের টেনেও সংবাদপত্রগুলিকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হবে। তাই সি আই ডির বড় কর্তারা কোন রিপোর্টারের সঙ্গেই দেখা করেন না। জানা গেল দেবশ্রী সত্যনারায়ণ সম্পর্কে প্রতিটি রাজ্যের পুলিশকেই জানানো হয়েছে। এমনকি বাংলাদেশ নেপাল ভূটানেও এঁদের সন্ধান চলেছে। কিন্তু সেখানেও দেবশ্রী-সত্যনারায়ণের কোন হদিশ মেলেনি। এখনও সেখানকার পুলিশ এব্যাপারে কোন হদিশ দিতে পারেনি। তা হলে দেবশ্রী গেল কোথায়? এ প্রশ্নের উত্তরে একজন সি আই ডি অফিসার বলেন যতক্ষণ না দেবশ্রী সত্যনারায়ণকে ধরা যায় ততক্ষণ কিছুই বলা যাবে না। একমাত্র ওরাই বলতে পারবে এতদিন কোথায় ছিল, কিভাবে ছিল। তাহলে কি দেবশ্রীর কোন হদিশই পাওয়া যাবে না। তিনি বললেন, আর কিছু বলতে পারব না। তিনি বললেন, যাদের ধরা হয়েছিল তারা জামিন পেয়েছে ঠিকই কিন্তু তাদের ওপর গোয়েন্দাদের নজর সবসময়ই আছে। সি আই ডি অফিসারের শেষ কথা, হাজার হাজার ছেলেমেয়ে হারিয়ে যাচ্ছে। এত বড় দেশের কোথায় রয়েছে তা কি চট করে খুঁজে বার করা সম্ভব?





‘স্বামী হারিয়েছি, মেয়ে ফিরে পেলাম না চাকরি দিয়ে মুখ বন্ধ করা যাবে না’



‘কোনও খবর আছে   দরজা খুলে এই প্রতিবেদককে দেখেই জিজ্ঞেস করলেন শক্তি দেবী। বললাম ‘আপনার কাছ থেকেই তো খবর নিতে এলাম, আপনাকে চাকরি দিয়েছে শুনলাম।’

নিখোঁজ দেবশ্রীর মা শক্তি রায়চৌধুরীকে খুব শ্রান্ত অসুস্থ মনে হচ্ছিল। ছেলে দীপ বিছানায় বসে পড়ছিল। তাকে পাশের ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে তিনি বসলেন। বললেন, ‘হ্যাঁ, সরকার একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। স্বামী হারালাম, মেয়েকে ফিরে পেলাম না, পেলাম একটা চাকরি   যেন আমার স্বামীর হত্যাকারীদের ধরার দরকার নেই, আমার মেয়েকে ফিরে পাবার দরকার নেই, চাকরি পেয়েই সব চুকে গেল।’

১৯৮৬ সালে বন্ধুদের সংগে বইমেলায় গিয়েছিল ডঃ শ্যামাপদ রায়চৌধুরী ও শক্তি রায়চৌধুরীর অষ্টাদশী সুন্দরী মেধাবী কন্যা দেবশ্রী। সেখানেই পরিচয় পুরুলিয়ার মানবাজারের সুদর্শন তরুণ সত্যনারায়ণের সংগে। সত্যনারায়ণ তখন থাকে ভবানীপুরের এক মেসে। দেবশ্রীকে সত্যনারায়ণ বলেছিল, সে কম্টিং পড়ে। এরপর ওই বছরের 30 জুন হঠাৎই দেবশ্রী নিখোঁজ হয়। সেদিন সন্ধ্যার মুখে দেবশ্রী দোকানে গিয়েছিল মাকে বলে। বাড়ির সামনেই দোকান। কিন্তু আর ফিরে আসেনি সে। বেহালা থানায় সত্যনারায়ণের নামে এফ আই আর করেন দেবশ্রীর বাবা ডঃ শ্যামাপদ রায়চৌধুরী এবং তিনি নিজে মেয়ের খোঁজে নানা জায়গায় ছোটাছুটি শুরু করেন। এদিকে এক চিঠির সূত্রে পুলিশ জানতে পারে যে দেবশ্রীকে নিয়ে সত্যনারায়ণ কটকে আছে। ১১ জুলাই পুলিশ কটকে গিয়ে জনৈক সাধন মিত্রের বাড়ি থেকে ওদের দুজনকে গ্রেপ্তার করে ডাউন জগন্নাথ এক্সপ্রেসে কলকাতার পথে রওনা হয়। কিন্তু পুলিশের হাত থেকে ওরা পালায়। পুলিশ বলে, ওরা চলন্ত ট্রেন থেকে ঝাঁপ দিয়ে মহানদীতে পড়ে মরেছে। কিন্তু তদন্তে প্রমাণিত হয়, পুলিশের ওই রিপোর্ট মিথ্যে, বানানো গল্প। ওরা বেঁচে আছে। দেবশ্রীর বাবা ডঃ শ্যামাপদ রায়চৌধুরী পাগলের মতো ছুটে বেড়িয়েছেন বিহার, কটক, বেনারস। এর মধ্যে বহুবার তাঁর প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়েছে টেলিফোনে। শেষ পর্যন্ত ’৮৭ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর দেবশ্রীর বাবাকে হাওড়া স্টেশনের কাছে মেঘদূত হোটেলের ঘরে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। আবার রহস্য। শুরু হয় নতুন তদন্ত। ডি জি নিরুপম সোম নিজে দায়িত্ব নিলেন। তাও প্রায় পাঁচ মাস হয়ে গেল।

পরিবর্তন ঃ কিন্তু তারপর   তারপর কী হল   আপনাকে চাকরি দিয়ে পুলিশ কি সব চাপা দিয়ে দিল

শক্তি দেবী ঃ কী বলব বলুন। আমার চাকরির সংগে তদন্তর কোন সম্পর্ক তো থাকতে পারে না। আমার স্বামী খুন হলেন, মেয়ে নিখোঁজ। ছোট ছেলে রয়েছে, ক্লাস সেভেনে পড়ছে। ওকে তো মানুষ করতে হবে, আমার সংসার চলবে কী করে ? ডঃ চৌধুরী বেঁচে থাকতে আমি কলেজের চাকরি পেয়েছিলাম, করিনি। এখন বাধ্য হয়েই ওদের দেওয়া স্কুলের চাকরিটা করতে হচ্ছে। কাছেই স্কুল, বাসুদেবপুর হাই স্কুল। হ্যাঁ, জয়েন করেছি, জানুয়ারি মাসের ২ তারিখ থেকে। না, আমার চাকরির জন্যে স্কুলের অন্য কোনও শিক্ষকের কোনও অসুবিধে হয়নি। মন্ত্রী কান্তি বিশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন এবং স্কুলের শিক্ষকতার পদপ্রার্থী হিসেবে আবেদন করতে বলেছিলেন। আমি তা করেছিলাম। ওই স্কুলে পদ শূন্য ছিলই। স্কুলের সকলেই আমার সহমর্মী, তাঁরা সবাই সহানুভূতি-সম্পন্ন। আমার চাকরিতে তাঁরা সবাই খুশি।

হ্যাঁ, যা বলছিলাম, একটা অল্পবয়সী ছেলে আমার জ্বলজ্যান্ত মেয়েটাকে বলতে গেলে কিডন্যাপ করে নিয়ে গেল, পুলিশই বলছে তারা বেঁচে আছে, অথচ প্রায় দু বছর হতে চলল ওদের কোনও হদিশ করতে পারছে না কলকাতা পুলিশ – বলুন এটা বিশ্বাসযোগ্য কিনা। পুলিশ এতসব কঠিন কেস সমাধান করছে আর এটার বেলায় কিছু হচ্ছে না। এই রহস্য জানার অধিকার তো সাধারণ মানুষেরও আছে। আজকে আমার কপালে যা ঘটেছে, কাল অন্য এক পরিবারের তো একই ঘটনা ঘটতে পারে। পুলিশ ও সরকারি প্রশাসনের ওপর মানুষের আস্থা থাকবে কি করে বলতে পারেন ! আর আপনাদের, সাংবাদিকদেরও দায়িত্ব আছে। এত বড় একটা অপরাধমূলক ঘটনা, পুলিশ ও সরকারি প্রশাসনের এমন রহস্যজনক গাফিলতি   এর বিরুদ্ধে কোনও সংবাদপত্রের সম্পাদক   আজ পর্যন্ত কলম ধরলেন না। আমাকে চাকরি দিয়ে আমার মুখ বন্ধ করা হয়েছে বললে ভুল হবে। তা কখনই নয়। তবে তদন্ত বন্ধ করে দেবার জন্য যদি কোনও সরকারি নির্দেশ জারি হয়ে থাকে তা হবে নিতান্ত দুর্ভাগ্যজনক। এর বেশি আমি আর কী বলতে পারি

পরিবর্তন ঃ পুলিশ বা গোয়েন্দা দপ্তরের সংগে এর মধ্যে আপনার আর কোনও কথা হয়নি

শক্তি দেবী ঃ গত মাসে, মানে ফেব্রুয়ারির পাঁচ তারিখে ডি জি নিরুপম সোম আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। তিনি বললেন, তদন্তর কাজ চলছে। ছেলেটা নিশ্চয়ই কোথাও আছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আমার মেয়ে তবে কোথায়   নিরুপমবাবু বললেন, সেও তার সংগে আছে কোথাও। খুঁজে পাচ্ছেন না। তবে তাঁরা আশা ছাড়েননি।

পরিবর্তন ঃ কিন্তু আপনার কী মনে হয়

শক্তি দেবী ঃ আমার আর কী মনে হবে সবাই যা ভাবছেন আমিও তাই ভাবছি – জানি না এই রহস্যের জট কোনও দিন খুলবে কিনা। □

সাক্ষাৎকার ঃ জীবন ভৌমিক

দূরদর্শন ঃ দূরত্ব বাড়াচ্ছে আপনজনদের মধ্যে

এ রাজ্যে দূরদর্শনের বয়স হল তের। দেখতে দেখতে দূরদর্শন পরিবারের একটি চরিত্র হয়ে উঠল। এখন প্রশ্ন উঠেছে, ঐ বাক্সোটি নাকি এমনই সাংঘাতিক যে, সামাজিক সম্পর্কে ফাটল পর্যন্ত ধরিয়ে ছাড়ছে। কেউ বলছেন, টি ভি-র জন্যে ছেলে-মেয়েদের কৈশোর হারিয়ে যাচ্ছে। এমন বিস্ফোরক সব প্রোগ্রাম, যা সপরিবারে দেখা যায় না। তাহলে কি এই আলোক-বাক্সোটি আমাদের অন্ধকারেই টানছে?

শোনেন—এই তোর কথাই ভাবছিলাম, (একবার দেওয়াল ঘড়ির দিকে তাকিয়ে) কদ্দিন আসিস না, হয়তো ভুলে গেছিস। বোস, অমিতাভ-রেখার আজ একটা বই দিয়েছে টি ভিতে। দেখে, খেয়ে-দেয়ে তারপর যাবি।'

এ সংলাপ শুনে নিশ্চয়ই কেউ ভাববেন না যে আপনার পুরনো বন্ধু তাঁর বাড়িতে আপনার উপস্থিতি এক গ্লাস পেস্তা-বাদাম দেওয়া নিমফুলের সরবতের মত নিচ্ছেন। কী করেই বা বুঝবেন—কথায় সোহাগ, না সোহাগার খাদ? যথেষ্ট আন্তরিকতা কথায়। কিন্তু কথা বলতে বলতে ঐ দেয়াল ঘড়ির দিকে তাকানো—তখনই আপনার বোঝা উচিত ছিল।

পুরনো সেই বিদেশি ঠাট্টাটা মনে আছে? পশ্চিম দেশে কারো বাড়িতে আড্ডা দিতে দিতে সময়ের দিকে খেয়াল না থাকলে



গৃহস্বামী বিনীত হয়ে বলেন—মশাই, ডিনারটা আজ আমার বাড়ি সেরেই যাবেন। এ কথা শুনে কোনও আহম্মক যদি সেই ডিনারে জিভ ঠেকায় তবে তাঁর মত ডবল আহম্মক আর নেই। অর্থাৎ গৃহস্বামীর গদগদ বিনয় দেখে আড্ডাধারী মোটেই বোঝেননি যে, গৃহস্বামীর এবার ডিনারে বসার সময় হয়েছে, অতএব এখন আসুন।

সাগরপারের এ ঠাট্টা আমাদের মেট্রোপলিটন সোসাইটিতে এখনো এসে পৌঁছয়নি। তবে টি ভি-র কল্যাণে বোধহয় এল বলে। সত্তর দশকের স্ট্যাটাস সিমবল এখন মোজেইক ফ্লোর থেকে নেমে এসেছে বস্তির টালির চালে।

ফোনের রিসিভারটা নামানো

কেউ কেউ বলছেন, বাক্সোটি বেশ কালচার্ড।.কেউ বলছেন, একেবারেই ইডিয়ট। কিন্তু ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, বাক্সোটি দূরকে নিকট করছে না নিকটকে দূর। বন্ধু দূরে সরে যাচ্ছে, আত্মীয়রা আর সেরকম বাড়িতে আসছে না। তাহলে তো আমাদের পারিবারিক জীবনে টি ভি-ও একটি চরিত্র হয়ে উঠেছে। সে, আমি বা আমরা এবং টি ভি। টি ভি-র কথা শুনতে হবে, মান্য করতে হবে। তার প্রভাব এখন অক্টোপাসের শুঁড়। গেরস্তকে জড়িয়ে জড়িয়ে বেশ নিজের দিকে টেনে নিচ্ছে।

কিছুকাল আগের এক রোববার সন্ধ্যে। টি ভি-তে এককালের বক্স অফিস ফাটিয়ে ফেলা একজন হট ম্যাটিনি আইডলের বই। একজন নয়, দুজন—রাজেশ আর অমিতাভ। ব্যস, বাড়ির গিন্নির গ্যাসে তড়িঘড়ি রুটি হয়ে গেল। কর্তার দিকে তাকিয়ে বললেন—গরম গরম দুখানা খেয়ে নাও। কর্তা আমতা-আমতা করে বললেন—এই তো সাড়ে তিনটেয় ভাত খেয়েছি। কিন্তু না, তাতে কোন কাজ হল না। ভরপেটেই খানচারেক রুটি বেগুন ভাজায় মুড়ে পেটে চলে গেল। একটু পরেই রাজেশ, অমিতাভ সংগে রেখাকে নিয়ে পড়বে। কর্তা আইঢাই করতে করতে সোফায় বসে পড়লেন। গিন্নির কথামত ফোনের রিসিভারটা নামানো। না, সিনেমা দেখার সময় ফোনে ডিস্টার্বড হতে চান না।

'শনি-রোববার বিকেলে বিজি থাকব, আসবেন না, এ শনিবার আবার সুচিত্রা-উত্তমের বই আছে। বরং রোববার সকালেই আসুন। ও হ্যাঁ, সাড়ে দশটার পর আসবেন, মানে রামায়ণের পরে।'

এই সংলাপটি কি কাল্পনিক? হতে পারে। আবার কারো হয়তো এরকম সংলাপ শোনার অভিজ্ঞতা হয়েছে। তবে এরকম ঠোঁট-কাটা কথা না শুনলেও যদি কোনও শনি-রবিবার বিকেলে আত্মীয়-বন্ধুর বাড়ি গিয়ে

ওভার টু দিল্লি

বই শুরু হয়েছে ঘন্টাখানেক। টেনশন বাড়ছে দর্শকের। অ্যাকশনের চূড়ান্ত। এমন সময় ডোর বেল ঝনঝনিয়ে উঠল। ব্যাজার মুখে গিন্নি কর্তাকে বললেন–যাও, দেখ, কে এল। আমার আর সময় পেল না!

কর্তা উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিলেন। এক-মুখ হাসি। শালী এসেছে, গিন্নির পিসতুতো বোন। শালীর আর্থিক অবস্থা ইদানীং খারাপ চলছে।

গিন্নি একবার বোনের দিকে তাকিয়ে অমিতাভর দিকে তাকালেন। দিদির দিকে তাকিয়ে বোনও বুঝল টি ভি-তে অমিতাভ। অতএব........। কিন্তু কিছুই করার নেই, টাকার দরকার, স্বামী হাসপাতালে।

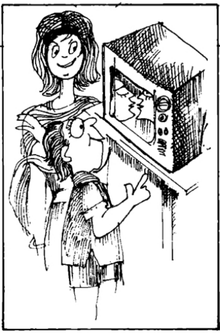
দিদি বোনকে ইশারায় বসতে বললেন, ছোটবোন বসে উসখুস করতে লাগল। একবার দিদিকে কিছু বলার জন্যে যেই 'দিদি' বলে ডেকেছে, অমনি অমিতাভ হেঁকে উঠল–খামোশ, বেতমিজ। দিদিও হাত তুলে বোনকে থামিয়ে দিলেন। ছোটবোন ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছে, কখন সাড়ে-সাতটা বাজবে। বাংলা খবরের আগে দিদি কিছুই শুনবেন না।

ছোটবোনের উসখুশুনিতে দিদি বারকয়েক দৃষ্টির চাবুক হেনে টি ভি-র দিকে তাকালেন। সাড়ে সাতটায় দিদির মুখে হাসি এল। বাংলায় খবর। দিদির কথায় আন্তরিকতা–তুই এই রাতে ছুটতে ছুটতে কেন এলি? সিনেমার পর ওকে (স্বামী) পাঠাচ্ছিলাম। তোর কর্তা আছে কেমন?

আন্তরিকতার ঘাটতি নেই দিদির কথায়। কিন্তু আর দেরি নয়। সাতটা পঁয়তাল্লিশে দিদি 'ওভার টু দিল্লি'-তে ভেসে যাবে বম্বের অমিতাভর কাছে। দরকার মিটিয়ে পৌনে আটটার আগে সরে পড়াই ভাল।

ছেলেমেয়েদের কৈশোর হারিয়ে যাচ্ছে

প্রতিমা বিশ্বাস থাকেন ভবানীপুরে। তাঁর এলগিন রোডের বাড়িতে তাঁকে এই ঘটনাটি শুনিয়ে বলেছিলাম–আচ্ছা, বলুন তো, টি ভি বাক্সোটি কি মানুষের সঙ্গে মানুষের হৃদ্যতায় চিড় ধরাচ্ছে? তিনি সহাস্যে জবাব দিলেন–আপনি যে ঘটনার কথা বললেন, ওটা আপাত-নিরীহ হলেও সাংঘাতিক। কিন্তু আমার বাড়িতে আজ ছ'বছর টি ভি এসেছে—পিসতুতো-মাসতুতো কেন, বাইরের কোন অচেনা মহিলার সঙ্গেও এমন ব্যবহার করতে পারতাম না। এই তো আপনি এসেছেন, আজ শনিবার, সিনেমা দেখতে দেখতে উঠে এলাম আপনার সঙ্গে কথা বলতে। আমাকে কি দেখে মনে হচ্ছে, আমি বিরক্ত হয়েছি? তবে টি ভি আসার একটা খারাপ জিনিস হচ্ছে, আমাদের ছেলেমেয়েদের জীবন থেকে কৈশোর হারিয়ে যাচ্ছে, তারা তাড়াতাড়ি অ্যাডাল্ট হয়ে উঠছে। চলতি কথায় পেকে যাচ্ছে। নিষ্ঠুর হচ্ছে। এগুলো সরকারের ভাবা উচিত। এই



তো শুনছি, মাঝরাতের সিনেমা আবার আসছে। কিন্তু ছেলেবেলাটা ছেলেবেলার মত না হলে কী ফল হয়, বেহালার কেসটাতে তো দেখলেন। এক কিশোর তার বন্ধুর বাড়ি গিয়ে খুন হল। মারপিট, খুন, সিন্দুক ভাঙার কায়দা টি ভি-তে দেখানো হচ্ছে, এমনকি রেপ পর্যন্ত। এসব সিনে বাবা-মাকেও টি ভি-র সামনে থেকে উঠে আসতে হয়। এর চাইতে বস্তাপচা বাংলা বই অনেক ভাল। বাইরের মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক চিড় ধরার কথা কী বলছেন, মা-বাবার সঙ্গে ছেলেমেয়ের দূরত্ব এনে দিচ্ছে এই টি ভি বাক্সোটি। সর্বনাশ যেটা হচ্ছে সেটা পরিবারের মধ্যেই, অর্থাৎ ঘরে, বাইরে নয়।

একথা যদি অনেক মহিলা-পুরুষের মনের কথা হয় তাহলে ধরে নিতে হবে টি ভি বাক্সোটি আস্তে আস্তে আমাদের পারিবারিক সম্পর্কের প্যাটার্ন পালটে দিচ্ছে। তাহলে আগামী শতাব্দীতে এমন একটি প্রজন্মর সৃষ্টি হবে যাদের বিচার বুদ্ধি হয়ে উঠবে অন্যের ওপর নির্ভরশীল, এবং কিঞ্চিৎ আত্মকেন্দ্রিক।

কেন একথা লিখতে হল তা একটি ঘটনার মধ্যে দিয়ে বোঝা যাক। টি ভি-তে তখন একটি ওয়ান-ডে ম্যাচ টেলিকাস্ট হচ্ছে। দারুণ টেনশন। একটি বাড়িতে কয়েকজন তরুণ একরকম জোর করেই গৃহস্বামীর ঘরে ঢুকে পড়েছেন। গৃহস্বামী চুপ করে আছেন, কারণ এখনকার তরুণদের ঘাঁটানো মানে আগুনে হাত দেওয়া। এমন সময় একটা ঘটনা ঘটে পাশের ফ্ল্যাটে। এক ভদ্রলোক হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তাঁকে তখুনি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। কিন্তু তাঁর সেরকম লোকবল ছিল না। তখন এ-ফ্ল্যাটের তরুণ দলকে অনুরোধ করা হয়। কিন্তু ওয়ান-ডে ম্যাচের উত্তেজনা থেকে সরে আসতে রাজি হল মাত্র দু'জন।

টি ভি-কে দোষ দিয়ে লাভ নেই

আগামী শতাব্দীতে এরকম একটা আত্মকেন্দ্রিক প্রজন্মর কথা তুলতে এক অধ্যাপক ভদ্রলোক এ যুক্তি মানলেন না। বললেন–আমার কাজটাই ছেলে চরানো। আমার মতে টি ভি মেয়েদের ওপরে প্রভাব বিস্তার করছে বেশি। ভোগ্যপণ্যের বিজ্ঞাপন তাদের প্রভাবিত করছে। অবশ্য নারী-পুরুষ নির্বিশেষে অন্য ক্ষতি যেটা হচ্ছে সেটা হল–বইপড়ার হ্যাবিট নষ্ট হচ্ছে। এ জিনিসটা মারাত্মক। এমনিতেই আমাদের দেশে অশিক্ষিতের হার আকাশ-ছোঁয়া। তবে রিলেশান ব্রেকের কথায় আমি একমত নই। আমাদের সামাজিক পরিকাঠামো তো দিনদিন পালটাচ্ছে। সম্পর্কে চিড় ধরার জন্যে টি ভি-কে দোষ দিয়ে লাভ নেই। আমার মতে পঞ্চাশ দশকের শেষ থেকে অর্থাৎ টি ভি আসার বছর দশ-বারো আগে থেকেই আমাদের সামাজিক সাংস্কৃতিক অর্থনৈতিক সব দিক থেকে একটা পালাবদল চলছেই। এখন টি ভি এর মধ্যে ঢুকে পড়েছে। বহু ছোট পরিবার অর্থাৎ ফ্ল্যাটবন্দী পরিবারের জন্ম হয়েছে। বেশ কিছু মধ্যবিত্তর লাইফ-স্টাইল পালটেছে। বদল হয়েছে মানসিকতার। আমরা বিক্রি হয়ে যাচ্ছি কতকগুলো ভোগ্যপণ্য বিক্রেতা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের কাছে। টি ভি এই জিনিসটাকেই আরো দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

টিভি-ই দায়ী

রেলের ইঞ্জিনিয়র অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু সামাজিক সম্পর্কে ফাটল ধরানোয় টি ভি-র ভূমিকা অস্বীকার করলেন না। বললেন–সত্যিই এখন শনি রবিবারে কারো বাড়িতে বিকেলে যেতে সংকোচ হয়। কেউ যদি আসে তখন নিজেদেরও মনে হয় একটু অপেক্ষা করুক। এই তো কিছুদিন আগে বেস্পতিবার হলেই যাদের বাড়ি কলকাতা থেকে দূরে তারা ছুটির আগেই অফিস থেকে বেরিয়ে যেত তের পার্বন সিরিয়াল দেখবে বলে। এবার ভাবুন তো, যদি কোন বন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয়-স্বজন তাঁদের সেই সিরিয়াল দেখার বাধা হয়ে দাঁড়ায় তাহলে ঐ যা বললেন, সম্পর্কে চিড় ধরবেই। এই তো দেখুন না, প্রতি রোববার সকালে কিছুক্ষণের জন্যে যেন বাজারে হরতালের অবস্থা হয়। এমনকি দোকানদাররা পর্যন্ত দোকান ফেলে হাওয়া। সবাই তখন টি ভি-র সামনে রামায়ণ দেখছে।

পোর্ট ট্রাস্টের শ্যামল মুখার্জি গায়ে কাঁটা দেওয়া কথা শোনালেন। তাঁর এক সহকর্মীর ভিডিও আছে। সহকর্মীর স্ত্রী-ও চাকরি করেন। ভিডিও থাকায় তাঁরা স্বামী-স্ত্রী অনেকসময় মাঝ রাতে নীল ছবি দেখেন। কীভাবে যেন সেই সন্ধান পেয়ে গেল তাঁর একমাত্র ছেলে। বয়স সতের-আঠার। মা-বাবার অবর্তমানে সে বন্ধুবান্ধব নিয়ে আসর বসিয়ে ফেলল ঘরের মধ্যে। বেশ চলছিল। বিস্ফোরণ ঘটল একটি মেয়েকে সেই আসরে আনায়। মেয়েটি তাদে.. গার্ল ফ্রেন্ড। এর পরের ব্যাপারটা আঁচ করে নিন। মা-বাবার এখন মাথায় হাত। ভাবতে পারেন, এইভাবেই প্রতিদিন তিলতিল করে আমাদের সমাজ-শরীরে ঢুকে পড়ছে ইয়াংকি কালচার। এর পরিণতি কিন্তু মারাত্মক।

আঞ্চলিক সংস্কৃতির গলা টিপে মারছে

ছোটমাপের রাজনৈতিক নেতা সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। সোসিওলজির ছাত্র ছিলেন। বললেন—সব জিনিসেরই ভাল-মন্দ দুটি দিক আছে, টি ভি-রও তাই। বাক্সোটি সবার ঘরে ঘরে পৌঁছে গেলে ঐ যে বললেন 'রিলেশন ব্রেক', সে সবের প্রশ্ন থাকবে না, হবে অন্যভাবে। আমার মতে টি ভি-তে যে হারে ভোগ্যপণ্যের বিজ্ঞাপন দেওয়া হচ্ছে মানুষকে সেসব কিনতে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। আমার মতে, মানুষ (যাদের হাতে পয়সা আছে) ভোগ্যপণ্য-প্রিয় হয়ে যাচ্ছে দিনদিন। যেটা আজ আমেরিকায় হয়েছে। এই তো ১৯৬৬ সালে ঐ দেশ টিভি সমেত বিজ্ঞাপন বাবদে খরচ করেছে ২000 কোটি ডলার। এখন নিশ্চয়ই আরো বেশি। ওদের দেশের গোটা সমাজটাই তো এখন একটা ডিসিপ্লিন্ড মার্কেট হতে চলেছে। ভাবতে পারেন! আর আমাদের দেশে টি ভি নিয়ে যেটা সবচেয়ে বেশি খারাপ হচ্ছে সেটা হল হিন্দিওয়ালারা আঞ্চলিক সংস্কৃতির গলা টিপে মারছে। 'বাংলা প্রোগ্রাম দিনে কতক্ষণ দেখেন? বড় জোর দুই থেকে আড়াই ঘন্টা। রোববারে কয়েক মিনিট। মাত্র ১০ মিনিটের জন্যে বাংলায় খবর। কিছুদিন আগে কাগজে দেখলেন তো—বাংগালোর টি ভি কেন্দ্রে হামলার খবর। কন্নড় ভাষার প্রায় হাজারখানেক সমর্থক টি ভি কেন্দ্রে ঢুকে ভাঙচুর করে। তাদের দাবি ছিল—কন্নড় ভাষায় অনুষ্ঠানের সময় আরো বাড়াতে হবে। ভারতের ঐক্য বজায় রাখতে নেতারা মাথা ফাটিয়ে ফেলছেন অথচ সেটি বজায় রাখার অন্যতম উপায় সকল অঞ্চলের সংস্কৃতিকে সমান মর্যাদা দেওয়া। কিন্তু সে ব্যাপারে টি ভি যে মারাত্মক ভূমিকা নিয়েছে এর ফল কিন্তু শুভ নয়।

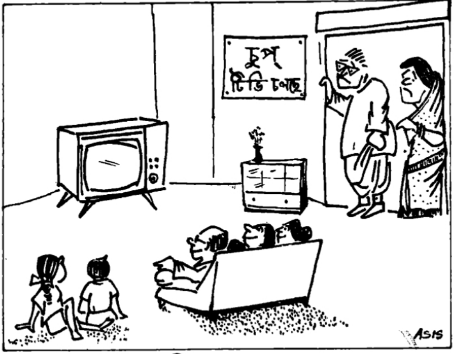
একটু থেমে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় বললেন—কেন আমরা প্রতি সপ্তাহে ছেলে-বৌ নিয়ে ঐ নচ্ছার হিন্দি সিনেমা দেখব বলতে পারেন?

—ভাল সিনেমাও তো দেয়।

—দেয়, তাবে সেটা গাঁটে গোন যায়। বেশিরভাগইতো সপরিবারে বসে দেখা যায় না। জুয়া খেলা, খুন, দাংগা, মেয়েদের ওপর অত্যাচার আর বিলাসিতার বিজ্ঞাপন। এতে হচ্ছে কী, গোটা সমাজ-ব্যবস্থাটাই একটি বিকিকিনির হাটে পরিণত হচ্ছে। একদিন দেখবেন সব সম্পর্কের মূলেই থাকবে একটা লেনদেনের ব্যাপার। পার্সোনাল রিলেশন ব্রেকটা সত্যিকারের ঘটবে তখনই। আর সেখানে টি ভির ভূমিকা থাকবে অনেকটাই।

তাহলে? তাহলে কি মুঠো মুঠো হতাশা? ঐ আলোক-বাক্সো প্রতিদিন ঠেলে নিয়ে চলেছে অন্ধকারের দিকে? কথাটা বোধহয় সবটা ঠিক নয়। গোবিন্দ নিহালনির 'তমস'—এর মত প্রোগ্রাম বেশি হলেই অন্ধকার থেকে আলোয় ফেরা যায়।

সৌরেন মিত্র।।



আপনার আবিষ্কার আমাদের যন্ত্রণা

মি: জন লোগি বেয়ার্ড,

আপনি ছিলেন গরিব ঘরের ছেলে। কষ্টে কেটেছে আপনার শৈশব-কৈশোর। কিন্তু পড়াশোনার প্রতি আপনার দারুণ আগ্রহ ছিল। তাই এত দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও লেখাপড়াটা চালিয়ে গেছেন। লেখাপড়া শেষ করার পর আপনার মাথায় ঢুকলো আবিষ্কারের পোকা। আর মনে ছিল গবেষণার মাধ্যমে একটা হেস্তনেস্ত করার অদম্য বাসনা। তারই ফলশ্রুতিতে আপনি একদিন জগৎকে চমকে দিয়ে আবিষ্কার করলেন টেলিভিশন, এদেশে যার আটপৌরে নাম দূরদর্শন। বিশ্বের বিদগ্ধ মানুষ বেইমান নয়। তারা আপনার আবিষ্কারকে স্বীকৃতি দিল নোবেল প্রাইজ দিয়ে। প্রাইজের টাকায় দুঃখ-কষ্ট ঘুচল, অনটন মিটল, আপনার সংসারে শান্তি এল। তা, নিজের সংসার তো গুছোলেন; কিন্তু আপনার উদ্ভাবিত যন্ত্রটি অন্যের সংসারে কীভাবে অশান্তির সবাক প্রতীক হয়ে উঠল, সেটা আপনাকে কেউ জানায়নি—জানাবার প্রয়োজনও মনে করেনি। সেই দায়িত্বটা আপাতত আমার ওপর বর্তেছে।

আসুন, তাহলে শুরু করা যাক। আপনার যন্ত্র নিয়ে যখন আলোচনা তখন আপনাদের, মানে সাহেবদের প্রথা-প্রকরণ রীতি-নীতি দিয়ে শুরু করাই বাঞ্ছনীয়। তাই নয় কি? আপনারা সাহেবরা জগৎ-সংসারে দুটো মেজর ভাগ তো করেই রেখেছেন— 'হ্যাভ' এবং 'হ্যাভনট'। যাদের আছে এবং যাদের নেই। 'হ্যাভ'দের আলোচনাই সাধারণত বেশি হয়। স্বার্থের প্রয়োজন না হলে বা বিপাকে না পড়লে 'হ্যাভনট'দের নিয়ে বড় একটা কেউ মাথা ঘামায় না। আমরা কিন্তু এই দুই মানব-গোষ্ঠীর হালই তুলে ধরব। কারণ আপনার উদ্ভাবিত সলিড স্টেট বাক্সোটি 'হ্যাভ'দের যেমন বিব্রত করছে, 'হ্যাভনট'দেরও তেমন বিপাকে ফেলছে।

'হ্যাভ'দের হাল

দোজ হু হ্যাভ, মানে যাদের টেলিভিশন আছে, তাদের কথাই প্রথমে বলা উচিত। এ ব্যাপারে কোন দ্বিমত থাকা উচিত নয়। তাই ওদের কথাই আগে আসুক।

লাখ কথা না হলে যেমন বে' হয় না, তেমনি এক কথায় কারো বাড়িতে টেলিভিশন ঢোকেনি। সলিড মান-অভিমান ঝগড়া-ঝাঁটির পর সলিড স্টেট যন্ত্রটি মৌরসিপাট্টা পেয়েছে। মান-অভিমান বা ঝগড়া-ঝাঁটি সবটাই অকারণে নয়। কর্তার চিন্তা, টাকাটা কোত্থেকে আসবে, গিন্নির চিন্তা, টেলিভিশন কোথায় বসবে। কর্তা ভাবছেন-ফিক্সড, না রেকারিং, কোনটা ম্যাচিওর করলে কিনবেন। ক্যাশ ডাউন, না কিস্তি। গিন্নি ভাবেন, ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট, না কালার। কর্তা চান, দু'মাস পরে কিনতে। গিন্নি বলেন, এখনই। এই নিয়েই সূত্রপাত, ব্যবধান বাড়ে, মান-অভিমান ঝগড়া-ঝাঁটির শুরু হয়। কিন্তু এই মানভঞ্জন পালা একদিন শেষ হয়, হোমফ্রন্ট কোয়ায়েট হয় টিভি-র গৃহপ্রবেশে।

টিভি-র গৃহপ্রবেশের পর সবচেয়ে হাল খারাপ হয় সেই লোকটির, যাঁর ঘাম ঝড়ানো ট্যাঁকের কড়িতে ঐ যন্ত্রটি বাড়িতে এসেছে। মানে বাড়ির কর্তা। তিনি তখন আর কর্তা থাকেন না, হয়ে যান বাড়ির একজন। কখনও অবাঞ্ছিতও। কথাটা যে অতিরঞ্জন নয়, জনৈক কর্তার এক শনিবারের অভিজ্ঞতা নিবেদন করলেই সেটা বুঝতে পারবেন।

সপ্তাহের অন্যান্য দিনের মত শনিবার দিনও কর্তা টিফিন-বক্স ব্যাগে পুরে গিন্নিকে বললেন, আমি বেরোচ্ছি। গিন্নি বেশ কমান্ডিং টোনে বললেন, তুমি কিন্তু খবরের সময় এসো। (হায় হতভাগ্য গৃহকর্তা, টিভি কেনার পর বাড়িতে ফেরার অবাধ স্বাধীনতা টুকুও হারালেন)। 'খবরের সময়ে এসো'-র কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা প্রয়োজন। শনিবার টিভিতে বাংলা ছবি দেখানো হয়। বাংলা সংবাদের সময় বিরতি। ঐ বিরতির সময়টুকুর মধ্যে যদি বাড়িতে ঢোকেন তাহলে চা-জলখাবারটা হাতের কাছে ঝটপট পেয়ে যাবেন। একটু আগে পরে হলেই বাড়ির অবস্থা হাইলি ইনফ্লেমেবল। গিন্নির মেজাজ তিরিক্ষে, ছেলেমেয়েদের উসখুস। কর্তার দুর্গতি। কর্তার মনে হয়, নিজের বাড়িতে তিনি অনধিকার প্রবেশকারী। অনেক চেষ্টা চরিত্র করে কর্তা যখন বাড়িতে ঢুকলেন, তখন 'ছায়াছবির শেষাংশ' কিংবা 'হাল্কা হাল্কা'র বিজ্ঞাপন। কিন্তু কর্তার অনুপ্রবেশে বাড়ির পরিবেশ আর হাল্কা থাকে না। গিন্নির মুখ ভারি হয়। দপদপ করে উঠে গিয়ে জলখাবারের ডিশটা তিনি ঠকাস করে টেবিলে রাখলেন। কর্তা ওমলেটটা মুখে পুরে দেখলেন, ওটা হিম-শীতল, বিস্কুটটা মিয়োনো। অর্থাৎ খাবারটা ফ্রিজে রাখা ছিল। 'খবরের সময়ে' গিন্নি কাজ গুছিয়ে রেখেছেন। তাই কর্তার দুর্গতি।

কর্তার এই দুর্গতি শুধু শনিবারেই সীমাবদ্ধ নয়। অন্য দিনেও সমানভাবে পরিব্যাপ্ত। কর্তা একটু লো ভল্যুমে টিভি দেখতে চান, যাতে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার ক্ষতি না হয়, প্রতিবেশীরা যাতে বিরক্ত না হন। গিন্নির আবার লো ভল্যুম পছন্দ নয়। তিনি নব ঘুরিয়ে ভল্যুম বাড়ান। পড়াশোনার ক্ষতি বা প্রতিবেশীর বিরক্তির কথা তাঁর মাথায় থাকে না। ভুরু-কুঞ্চিত কর্তার মনে তখন প্রশ্ন জাগে, নিজের মেহনতের পয়সায় এই শব্দ-দৃশ্য যন্ত্রটি কেন বাড়িতে ঢোকালাম? আয়তকার এই যন্ত্রটি মনোরঞ্জনের, না মন-কষাকষির?

বেয়ার্ড সাহেব, আপনি হয়তো বলবেন তোমাদের ঘরে কোঁদল সৃষ্টি করার জন্য তো আমি এই যন্ত্র আবিষ্কার করিনি। সেকথা আমরা অস্বীকার করি না। তাই আপনার বিরুদ্ধে আমরা কোন অভিযোগ উত্থাপন করছি না। আমরা জেনে-শুনে যে বিষ পান করেছি সেই বিষক্রিয়ার কথাই শুধু আপনাকে জানাচ্ছি। ভাই কানাই ভেবে দুঃখের কথা নিবেদন করছি। অনুগ্রহ করে আপনি এটাকে অন্যভাবে নেবেন না।

শনিবারের কথা তো শুনলেন, এবার রবিবারের এক সুখী গৃহকোণের হালটা দেখুন। রবিবার আপনাদের মত আমাদেরও ছুটির দিন। বকেয়া কাজকর্ম সারতে হয়, ধোয়া-মোছা আছে, লেখাপড়া একটু বেশি করে করার দিন। সকাল থেকেই চালানো শুরু হল আপনার যন্ত্র। ছেলেমেয়েরা কানখাড়া করে পড়া বন্ধ করল, না হয় গুটিগুটি এসে টিভির সামনে বসলো। আর

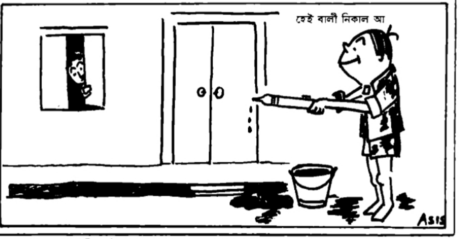


'রামায়ণ' শুরু হওয়ার পর তো টিভির সামনে চাঁদের হাট। কাজকর্ম ডকে, লেখাপড়া শিকেয়। বসার ঘরটাকে মনে হয় ছোটখাটো সিনেমা-হল। ওটা শেষ হওয়ার পর সিরিয়াল শুরু হল সিরিয়াল। নাওয়া-খাওয়ার টাইম চেঞ্জ বিশ্রামের বারটা। দুপুর গড়িয়ে বিকেল। বাড়ির কর্তা সব কটা কাগজ নিয়ে বসেছেন। অমনি গিন্নি হাঁক পাড়েন, শুনছো? তুমি আবার ওঘরে লাইট পাখা চালিয়ে বসে আছ কেন? এঘরে এসো না। এঘরে মানে টিভি-র ঘরে। এটা খরচ কমানোর ইঙ্গিত। ঐ সময় হিন্দি ছবি চলে। এস্টাব্লিশমেন্ট কস্ট কমানোর আহ্বানে সাড়া দিয়ে বাধ্য হয়ে কর্তাকে বসতে হয় 'ঘরমে রাম গলিমে শ্যাম' মার্কা কোন হিন্দি ছবি দেখতে। তিতিবিরক্ত কর্তা হয়তো এক সময় ঘুমিয়ে পড়েন। তাই নিয়ে ঐ মুহূর্তে ঘরে হাসির কোরাস, ঘুম-ভাঙা কর্তা বেইজ্জত বেপথুমান। ইলেকট্রিক বিলের কথা ভেবে রুচি বিসর্জন দিয়েও কর্তাকে বসে থাকতে হয় টিভির সামনে। এটাকে কী বলবেন—খাল কেটে কুমির আনা, না ট্যাঁক ভেঙ্গে অশান্তি কেনা?

আমাদের শাস্ত্রকাররা বলেছেন, বিদ্যারম্ভে গুরু শ্রেষ্ঠ, অবিদ্যায় বুধ। অর্থাৎ লেখাপড়া শুরুতে বেস্পতি এবং অন্যবিদ্যার ক্ষেত্রে বুধবার শুভ। দূরদর্শনের বুধ-বেস্পতির নিবেদন বিদ্যা, না অবিদ্যা—সেটা আপনাকে ঠিক বলতে পারছি না। কারণ একদিন 'হার' একদিন 'মালা'। মানে বুধবার 'চিত্রহার', বোম্বাই দূরদর্শনকা ভেট। বেস্পতিবার কলকাতা দূরদর্শনের নিবেদন 'চিত্রমালা'। তবে এই 'হার' আর 'মালা'য় ফারাক খুব কমই। তবু 'হার'-এর কাছেই হার মানে 'মালা'। বোম্বাইয়ের কাছে কলকাতা।

বোম্বাই দূরদর্শন কা এই ভেট প্রায় সব বাঙালি পরিবারের মাথা হেঁট করে দেয়। বাবা-মায়ের মাথা হেঁট করে দেয় কান্ডজ্ঞানসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের। মূলত এটা গানের অনুষ্ঠান। ছায়াছবির গান। শ্রাব্য। সংগীত বিশারদদের কাছ থেকে আপনি অনুগ্রহ করে জেনে নেবেন এই ভেট-এর গান সুখশ্রাব্য, না অশ্রাব্য। আমি শুধু এর দৃশ্য অংশ সম্বন্ধেই রিপোর্ট করছি। দৃশ্য-অংশটি 'হ্যাভ'দের শোবার ঘরে কিংবা বসার ঘরে যে দৃশ্য তৈরি করে তার কিঞ্চিৎ বিবরণ দিচ্ছি।

চামড়ায় সাঁটা এবং ছোটখাটো পোশাক পরা বোম্বাই চিত্র-জগতের ধেড়ে ধেড়ে ছেলে-মেয়েরা, থুড়ি তারকারা, যেভাবে জড়াজড়ি এবং গড়াগড়ি করে গান গায় এবং লাফায় নাচে তাতে আমার মত অনেক সংগীত-অজ্ঞ লোকের মনে প্রশ্ন জাগে—গান গাইবার জন্য ঐ ধরনের পোশাক বা আচরণ আবশ্যিক কিনা? সে কথা থাক। আমি



অন্যের গোয়ালে ধুনো দেব কেন? যেটা বলছিলাম সেটাই বলি। গান এখানে মুখ্য নয়। মুখ্য হচ্ছে বাসের নামে অন্তর্বাস-পরা নারী দেহ প্রদর্শনী এবং যৌন উত্তেজনা ছড়ানো। এই ধেড়েদের জড়াজড়ি গড়াগড়ি দেখতে গিয়ে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সামনে বাবা-মায়ের অবস্থাটা কেমন হয় ভাবুন তো। বাবা-মা ছেলেমেয়েদের মুখের দিকে তাকাতে পারে না, ছেলেমেয়েরা বাবা-মায়ের দিকে। দু'পক্ষেরই চোখ সেঁটে থাকে টি-ভির ছোট পর্দায়। এই অস্বস্তিকর অবস্থা ফি বুধবার, হর মাহিনা, থ্রু আউট দ্য ইয়ার। এই নিয়ে বচসা হয়, মতানৈক্য হয়, আবার ছেলে-মেয়েদের সংগে একই সংগে বসে দেখতেও হয়।

কলকাতা দূরদর্শনের 'চিত্রমালা' পরিচালকরাও অনেক সময়ই বোম্বাইয়ের সংগে টেক্কা দিতে চেষ্টা করেন। তবে বেশির ভাগ সময় এ ব্যাপারে তাঁরা 'সফল' হন না। আরব সাগরের ঢেউয়ের কাছে গংগার কুলকুল! নদীতে-সাগরে অনেক তফাৎ।

বেয়ার্ড সাহেব, আপনি নিজে লেখাপড়ায় তুখোড় ছিলেন। তাই শিক্ষার্থীদের দুরবস্থার কথা শুনলে স্বভাবতই আপনি দুঃখ পাবেন, জানি। তবু এই অপ্রিয় কাজটি আমায় করতে হচ্ছে। আমাদের দূরদর্শন শিক্ষার্থীদের জন্য যখন অনুষ্ঠান করে তখন বেশির ভাগ শিক্ষার্থীই শিক্ষায়তনে বসে মাস্টার বা প্রফেসরদের বক্তৃতা গেলে। আর তাদের পড়ার সময় বিজ্ঞাপনদাতা-আয়োজিত সিরিয়াল চলে। ওরা সিরিয়ালে কৌতূহলী হয় পড়াশোনায় মনোসংযোগ হারিয়ে। টিভি-শোভিত অনেক বাড়িতেই এই সমস্যা। এই নিয়ে অশান্তি। ছেলেমেয়েদের পড়ার সময় সিরিয়াল দেখায় মা সমর্থন করলে বাবা-কাকা রেগে যান। আবার বাবা-কাকা সমর্থন করলে মা-কাকিমারা রেগে কাঁই হয়ে বলেন, আদিখ্যেতা দেখিয়ে ছেলে-মেয়েগুলোর মাথা খাচ্ছ, ভবিষ্যৎ ঝরঝরে করছ। এই চিত্রনাট্য প্রায় সব টিভি-গৃহে।

সকাল-সন্ধ্যের কথা বলেছি। আসুন এবার রাতের কথা বলি। রাত মানে বেশি রাত—লেট নাইট। যখন ছেলে ঘুমোয় পাড়া জুড়োয়, তখন দূরদর্শন প্রেজেন্টস লেট নাইট মুভি। প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য ছায়াছবি, মার্কা 'এ'। এটা নিয়ে সব পরিবারে গোল বাধে না। গোল বাধে যেসব পরিবারে প্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়ে থাকে। বাবা দেখতে চাইলে মেয়ে গোসা করে ঘরে খিল দেয়। ছেলে দেখতে চাইলে মা বিছানায় শুয়ে গজগজ করে। এটা একদিন নয়, সব লেট নাইট মুভির দিন। থ্যাংক গড। আপদ বিদেয় হয়েছে—ওটা আর এখন হয় না। তাই ওটা নিয়ে আর আপনাকে বোর করব না।

পাছে ভুলে যাই, চিঠিটাই কখন টুক করে শেষ করে ফেলি, তাই তার আগে বাড়ির কাজের লোকদের সম্বন্ধে একটু বলে নিই। বাড়িতে কাজের লোক পাওয়া একটা সমস্যা। তবে টিভি থাকলে সমস্যাটা কিঞ্চিৎ সহজ হয়। রঙিন টিভির মালিক বা মালকিনরা



মেয়ের খুব শখ বিয়েটা ভিডিও-তে ধরে রাখার

প্রাধান্য পান। ঠিকে বা স্থায়ী দু'ধরনের কাজের লোকই গৃহকর্ত্রীকে কসম কাড়িয়ে নেয়— টিভি দেখার অবাধ সুযোগ দিতে হবে। নির্দিষ্ট থাকবে তার বসার জায়গা। টিভি দেখার এবং বসার জায়গার ব্যাপারে সামান্যতম অসুবিধে হলে গিন্নিমাকে পথে বসিয়ে বাড়ির কাজের লোক কাজের সন্ধানে অন্য বাড়িতে ঢুঁ মারবে। তখন গৃহিণীকে ইসি বাহানে বা জিন্দেগি ছেড়ে মাজতে হবে বাসন। 'হোনি আনহোনি' ছেড়ে কাচতে হবে জামাকাপড়। আর কর্তা 'মুক্তবন্ধ' ছেড়ে মুক্তকচ্ছ।

কাজের লোক অন্য বাড়িতে ঢুঁ মারতে চাইলেও বাড়ির গিন্নি কিংবা ছেলেমেয়েরা নিতান্ত প্রয়োজনেও অন্য বাড়িতে যাওয়ার পাট প্রায় চুকিয়ে ফেলেছে। অজুহাত টিভি প্রোগ্রাম। তেমনি অন্য কেউ টিভি চলাকালীন বাড়িতে এলেও বাড়ির লোকজন অখুশি হয়। ওদের মনে হয়, 'কেন এলে মোর ঘরে আগে নাহি বলিয়া'। এতে পারিবারিক ব্যবধান বাড়ছে। সামাজিকতায় ফাটল ধরছে।

ভাগ্যিস, আপনার আবিষ্কৃত যন্ত্র আমাদের দেশের সব পরিবারে এখনও ঢোকেনি। ঢুকলে যে কী হাল হত সেটা অনুমানে বোধগম্য। কিন্তু তাই বলে আপনি যেন ভাববেন না, যে পরিবারে টিভি নেই সেখানে টিভি সংক্রান্ত কোন সমস্যা নেই। আছে, সাহেব, আছে। আর একটু ধৈর্য ধরে এবার তাদের কথা শুনুন।

'হ্যাভনট'দের করুণ কাহিনী

'হ্যাভনট'রা তো সংসারে যাবতীয় সমস্যায় নাকানি-চোবানি খাচ্ছে। গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মত টিভি যন্ত্রটি তাদের আরো কিছু বাড়তি সমস্যা উপহার দিয়েছে। এর জন্য টিভি না থাকা পরিবারের কোন বৃদ্ধা মাকে অনাহূত হয়েও রামায়ণ দেখতে যেতে হয় অন্যের বাড়ি, কুণ্ঠিত চরণে ঢুকতে হয় টিভির ঘরে, সন্ত্রস্তভাবে। পাছে টিভিওয়ালাদের কোন অসুবিধে হয়। এই বৃদ্ধার কাছে এটা নিছক টি-ভি দর্শন নয়,

একেবারে মরে যাব স্যার



ধর্মাচরণ। ছেলে টিভি কিনতে পারলে ধর্মাচরণের জন্য মায়ের এই কুণ্ঠা থাকতো না। ছেলের অস্বস্তি হত না। অস্বস্তি শুধু মায়ের জন্যই নয়—গিন্নির জন্য, ছেলেমেয়েদের জন্যও। না থাকার দৈন্য চাপা দিতে অস্বস্তিকর অবস্থাই মেনে নিতে হয়। নতুবা ঘর্মাক্ত কলেবরে কর্মস্থল থেকে বাড়ি ফেরার পর গৃহিণীকে বাড়িতে না দেখেও কর্তা রাগ করতে পারেন না। কারণ ঘরে বসে টিভি দেখার স্বাচ্ছন্দ্যটুকু দিতে পারলে ওই সময় গৃহিণী পাশের ফ্ল্যাটে টিভি দেখতে যেতেন না। কর্তার মরমের ব্যথা মরমে গুমরি কাঁদে।

টিভি না থাকা কোন বাড়ির ছেলেটি হয়তো খেলা পাগল—বিশেষ করে ক্রিকেট। ওয়ান-ডে ম্যাচ চলছে। চতুর্দিকে উত্তেজনা। ঘরে ঘরে সব হুমড়ি খেয়ে পরেছে টিভির সামনে। আর এই ছেলেটি তখন বইখাতা নিয়ে হাপুস নয়নে অমনোযোগী। লেখাপড়ায় মন নেই অথচ খেলা দেখতেও পারছে না বাবার ভয়ে। অক্ষম বাবা সেটা বুঝেও না বোঝার ভান করেন। অস্বস্তিকর অবস্থাটা এড়াবার জন্য তাড়াতাড়ি অফিস বেরোন। তখন ছেলেও বইখাতা তুলে রেখে গুটিগুটি হাজির হয় বন্ধুর বাড়িতে কিংবা পাশের ফ্ল্যাটে। সেখানেও সে যে বঞ্চিত নয়, সেটা ঐটুকু ছেলেও বোঝে। কিন্তু গাভাসকার কিংবা রিচার্ডসের ব্যাটিং দেখার দুর্লভ সুযোগটুকুর জন্য ঐ অপমান সে গায়ে মাখে না।

'হ্যাভনট'দের এমন অনেক করুণ কাহিনী আপনাকে অনায়াসেই শোনাতে পারি। কিন্তু শোনাব না, কারণ আমাদের দৈন্য বিক্রি করে আপনারা ধনী হন। নিজে হাতে করে সেই মেটিরিয়াল-আপনার হাতে তুলে দেব না। শুধু আবিষ্কর্তা হিসাবে সম্মান জানিয়ে আপনার যন্ত্রটি কীভাবে আমাদের পারিবারিক অশান্তি সৃষ্টি করছে তার কিঞ্চিৎ বিবরণ আপনার কাছে নিবেদন করলাম। এটা পুরোপুরি নয়, আংশিক।

মি: বেয়ার্ড, এই দীর্ঘ চিঠি পড়ার জন্য আপনার অনেকটা অমূল্য সময় নষ্ট হল। তার জন্যে ক্ষমা করুন। কিন্তু উপসংহারে আর দুটো কথা না জানালে আপনার প্রতি অবিচার করা হবে। তা হল আপনার উদ্ভাবিত যন্ত্রের কল্যাণে আমাদের দূরদর্শন-কর্তৃপক্ষ কোটি কোটি টাকা কামাচ্ছেন, প্রযোজকরা লাখ লাখ, শিল্পীরা হাজার হাজার। ফয়দা লুটছেন বিজ্ঞাপনদাতারা। অথচ পারিবারিক অশান্তির জন্য আইনগতভাবে তাঁদের কোনভাবে দায়ী করাও যাচ্ছে না। তাই যাঁদের রক্ত জল করা পয়সায় টিভি কেনা, সেই গৃহকর্তারা গুনে চলেছেন বাড়তি ইলেকট্রিক বিল আর চা জলখাবারের বাড়তি খরচ। এই পত্রলেখক সেই ভুক্তভোগীদের একজন, আপনি তার সশ্রদ্ধ নমস্কার নিন।

ইতি ভবদীয়
ঊষা ভৌমিক

ব্যংগচিত্র: রাজা, আশিস ভট্টাচার্য

'সামাজিক সম্পর্কের মধুর দিকগুলি নিশ্চয়ই নষ্ট হচ্ছে'

দূরদর্শন কি আপনজনদের মধ্যে দূরত্ব বাড়াচ্ছে? এ সম্পর্কে আমাদের প্রতিবেদক কয়েকটি প্রশ্ন রেখেছিলেন কলকাতা থেকে যাঁরা দূরে থাকেন, তাঁদের কাছে।



অনুভা কুণ্ডু : গৃহস্থ বধূ

সামাজিক সম্পর্ক নষ্ট করছে না। বরং টি ভির কল্যাণে মধুর সম্পর্ক তৈরি হচ্ছে। আগে যে প্রতিবেশীরা ছায়াও মাড়াতেন না, তাঁর এখন দিব্যি আসছেন টিভির নেশায়, ডেকে জিজ্ঞাসা করছেন; 'ও দিদি, এ শনিবার কী বই গো?' সিনেমা চলার সময় বাড়িতে কেউ এলে একটু বিরক্ত হই বৈকী, বিশেষ করে তাঁরা যদি একটি সিনেমা রসিক না হন–তখন সিনেমার ঘটনায় ডুবে থাকি, অন্য প্রসংগ নিয়ে বাড়িতে এলে খারাপই লাগে। বাচ্চাদের জন্য উপযুক্ত ছবি তো দেখানোর ব্যবস্থা হয় মাঝে মাঝে। সুতরাং সব ছবিই বাচ্চাদের সংগে দেখার উপযুক্ত হতে হবে–আমার কাছে এটা অসংগত দাবি। খেলাধূলো সম্পর্কে আমার কোন উৎসাহ নেই। আর চিৎকার হৈ চৈ আমি খুব একটা পছন্দ করি না। হয়তো ঐ সময়টা বিশ্রাম নিতে চাই। কিন্তু হয়ে ওঠে না।

শ্যামলী দত্ত : গৃহস্থ বধূ

বর্তমানে টি ভি এমন এক পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে তাতে আত্মীয়স্বজনের কাছে অপ্রিয় হতে হচ্ছে। রোববারের সকালটাতো হাঁফ ফেলার সময় পাই না। নানান জনের তাড়া রামায়ণের জন্য। টি ভি দেখে ছেলেমেয়েদের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটছে ঠিকই তবে বাড়ির অভিভাবকদের একটু সতর্ক থাকতে হবে এই কারণে যে সব সিনেমাই ওদের দেখতে দেওয়া যেতে পারে যদি কাহিনী এবং বিষয়বস্তু জানা যায়।

বন্দনা গুপ্ত : শিক্ষিকা

টি ভি শিক্ষামূলক হলেও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ভীষণ ক্ষতিকর। ছেলেমেয়েদের পড়াশুনোতো শিকেয়। ঘরে টি ভি থাকা সত্ত্বেও আমি টি ভি খুলি না। এমনকি রামায়ণ পর্যন্ত না। রামায়ণে মাঝে মাঝে এমন নানান দৃশ্য দেখানো হয় তা মূল রামায়ণে নেই। তবে হ্যাঁ, এসব দেখার জন্য আমি আগ্রহী তবে টি ভি খুললেই তো জনস্রোত। এ সম্পর্কে কিছু বললেই মধুর সম্পর্কের পূর্ণচ্ছেদ। ছুটির দিনে ঘরে চুপচাপ বসে থাকা, আমারও কোথাও যাওয়া হয় না এবং অন্যেরাও কেউ আসেন না। টি ভি দিনে দিনে আমাদের আত্মীয়তা নষ্ট করে দিচ্ছে। খেলাধূলোর ব্যাপারে বিরক্ত বোধ করি না, কারণ ওতে মানসিক নির্মলতা প্রকাশ পায়। আমি টি ভির বিজ্ঞাপনের বিরোধী। আপত্তিকর বিজ্ঞাপনের দৌলতে ছেলেমেয়েদের বয়স যেন লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে যাচ্ছে।



মানিক সিমলাই : সরকারি কর্মচারী

টি ভি এখন আমাদের কাছে দিল্লি কা লাড্ডুর মতন। বিশেষ করে সামাজিক সম্মান রাখতেই টি ভি কেনার প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়। আর এই টি ভি এখন সমস্ত সামাজিক সম্পর্ক নষ্ট করে দিচ্ছে। শনি-রবিবার সিনেমা চলাকালীন বাড়িতে কেউ এলেই বিরক্ত বোধ করি। তাছাড়া টি ভির দৌলতে আমরা ক্রমশ আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়ছি। ছুটির দিনেও এখন আর কোথাও যাওয়া হয়ে ওঠে না। টি ভির জন্য ছেলেমেয়েদের মানসিকতা পাল্টাচ্ছে কিনা বলতে পারি না। তবে মানসিকতা টি ভি কেন্দ্রিক হয়ে যাচ্ছে। টি ভি সিনেমা এবং বিশেষ করে বিজ্ঞাপনের কার্যক্রম ছেলেমেয়েদের সংগে বসে দেখা যায় না। আর খেলা চললে বিশেষ করে ক্রিকেট, বাড়িতে তো থাকাই যায় না।



বিনয় চক্রবর্তী :
চাকদহ কলেজের
বাণিজ্য বিভাগের প্রধান অধ্যাপক

ব্যক্তিগত ও পারিবারিক মেলামেশাটা আজ শুধু সৌজন্যবোধ ছাড়া কিছু নয়, এ অবস্থায় টি ভি-কেন্দ্রিক পরিবারে সামাজিক সম্পর্কের মধুর দিকগুলি নিশ্চয়ই নষ্ট হচ্ছে। টি ভির দৌলতে মানসিকতা একেবারে ঘটছে না বলি কী করে? টি ভি আসার পর থেকেই প্রতিদিন সন্ধ্যায় ছেলেমেয়েরাও টি ভির সামনে বসে পড়ে। ওদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে পড়ার ঘরে পাঠাতে রীতিমত তাড়া লাগাতে হয়। শেষ বিকালে আমেজভরা চায়ের কাপটি নিয়ে সবেমাত্র বসেছি প্রিয় ছবিটি দেখব বলে, এমন সময় মূর্তিমান উপদ্রবের মতন কেউ প্রয়োজনে দেখা করতে এলে বেশ বিরক্তই লাগে। টি ভির সব ছবি সপরিবারে উপভোগের নয় মোটেই। মধ্যবিত্ত মানসিকতা আজও মূলত একটু নীতিবাগীশ। তাই সব ছবি ছেলেমেয়েদের সংগে মোটেই দেখা যায় না। আমার মতে, দেখা উচিতও নয়। আর খেলা দেখার ব্যাপারে উত্তেজনা আছে স্বীকার করি কিন্তু মাঝে মাঝে তা এমন পর্যায়ে চলে যায়, তখন খুবই বিরক্ত হই।

সাক্ষাৎকার : প্রীতম দেচৌধুরী

সুন্দরবন ঃ ঝুঁকি সত্ত্বেও ভটভটিই ভরসা

সুন্দরী সুন্দরবন। দু-চোখ জুড়নো ঘন সবুজ বনাঞ্চল। মাঝে মধ্যে অসংখ্য ছোট বড় নদী। মোহিনী প্রকৃতি আর তার রূপ সৌন্দর্যের ডালি সাজিয়ে যেন ইশারা দিয়ে ডাকে। নদীবহুল আর অরণ্যসংকুল এই এলাকাকে এক পলকেই তাই ভাল লেগে যায়। কিন্তু সুন্দরী তন্বী যেমন কখনো কোন পুরুষের জীবনে হয়ে দাঁড়ায় একরাশ দুঃখের কারণ, তেমনি রূপসী বনানী সৌন্দর্যের মায়াজালে আবদ্ধ লক্ষাধিক মানুষের জীবনে হয়ে উঠছে অভিশাপ। নদীবহুল সুন্দরবন প্রকৃতির খেয়ালের কাছে বশ্যতা স্বীকার করে এলাকার মানুষের জীবনে নিয়ে আসছে মৃত্যু আর শোকের কালছায়া। প্রতিটি নদী যেন মৃত্যুর এক-একটা হাতছানি।

প্রতি বছর একাধিক নৌকাডুবির ঘটনা এলাকার মানুষের কাছে নতুন কোন খবর নয়। এভাবেই ঘটছে বহু লোকের সলিল সমাধি। কেউ কেউ অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে গেলেও দিন কাটাচ্ছেন সেই ভয়াবহ স্মৃতিকে বুকে নিয়ে। আর বেঁচে গেলেও তো স্বস্তি নেই। প্রাণটাকে আবার হাতের মুঠোয় নিয়ে সেই লাইসেন্সবিহীন ভটভটিতেই উঠতে হচ্ছে। কারণ ওগুলিই এলাকার একমাত্র যান। তাই ওর বিকল্প নেই। সরকার, প্রশাসন, রাজনৈতিক দল ও তাদের দোর্দণ্ড প্রতাপশালী নেতারা – সবাই এখানে অসহায়। যেন কারুর কিছু-ই করার নেই। আর করবেনই বা কি? করতে গেলে যে অনেক টাকার ধাক্কা! রাজ্য সরকারের টাকা নেই। কেন্দ্রীয় সরকার টাকা দেবে না। সুতরাং যেমন চলছে, তেমনি চলুক। শুধু মাঝে মধ্যে মানুষকে সান্ত্বনার আপ্তবাক্য শোনাতে হবে। তারপর আবার যে কে সেই! এই হল সুন্দরবন এলাকার জল পরিবহনের চলতি অবস্থা।

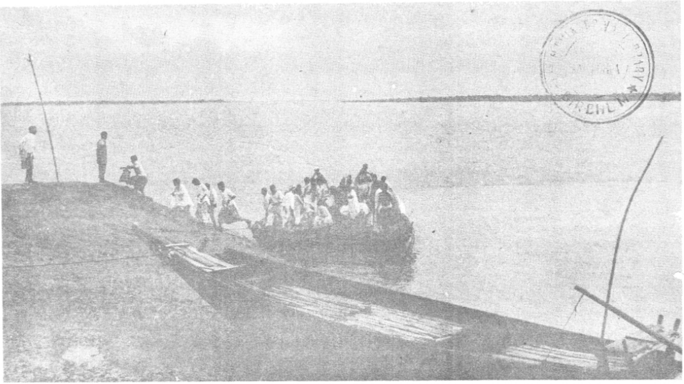
গত ১৮ ফেব্রুয়ারি ক্যানিং থেকে ৩০ কিলোমিটার দূরে কাছারিঘাটের কাছে মাতলা নদীতে যে নৌকাডুবি হয়েছিল তার জের এখন আর অবশিষ্ট নেই। এসব ঘটনা এলাকার মানুষের কাছে গা সওয়া হয়ে গেছে। ক্যানিং, ডকঘাট, সোনাখালি, বাসন্তী, গোসাবা – এই সব এলাকাতে রমরম করে চলছে লাইসেন্স-বিহীন অসংখ্য ভটভটি। এই ভটভটিগুলির কোনটাতেই ব্রেক বা গিয়ার নেই। মাঝিরা হাল ধরে দিক নির্দেশ করে। একটু বেসামাল হলেই এগুলি উল্টে যায়। খরস্রোতা নদীর টানে ভেসে যায় প্রচুর মানুষ। এসবকে উপেক্ষা করে এই এলাকার পরিবহন ব্যবস্থা টিকে আছে এই ভটভটিগুলিকে নির্ভর করেই। কেননা আধুনিক লঞ্চ চলার মত গভীরতা সবসময় এই নদীগুলিতে থাকে না। নাব্যতা কম থাকায় পারাপার ও যোগাযোগ রক্ষার মুখ্য দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে এই ভটভটিকেই।

ভটভটি দেখতে নৌকার মত। আসলে মোটর চালিত নৌকার নামই ভটভটি। মোটর চালালেই নৌকা চলতে শুরু করে। সংগে দিক নির্দেশ করার জন্য আছে মাঝির হাল। ব্রেক ও গিয়ার না থাকায় যখন তখন থামানো বা গতি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। এই জন্য এই ভটভটিগুলির লাইসেন্স পাবার কোন যোগ্যতা নেই।

মাতলা নদীতে নৌকাডুবির পর উদ্ধারকার্য চালিয়েছেন এমন একজন পদস্থ পুলিশ অফিসার ক্যানিং থানায় বসে এই প্রতিবেদককে জানালেন, নৌকাতে ১২৫ জন ছিল বলে বেসরকারি সূত্রে যে দাবি করা হচ্ছে, তা ঠিক নয়। কেননা, এ পর্যন্ত ৭২ জনের হদিশ পাওয়া গেছে। তার মধ্যে মারা গিয়েছে ১১ জন। অনুমান করা হচ্ছে, নৌকাতে ৭৫ জন ছিল। এর বেশি নিখোঁজ হওয়ার খবর মিসিং স্কোয়াড থেকে তাঁদের কাছে আসেনি। সুতরাং ৭৫-এর বেশি লোক নৌকাতে ছিল, তা মেনে নেওয়া যায় না। তবে নিহতদের সংখ্যা আরও বেশি হতে পারে বলে তাঁর ধারণা। কেননা এখনও তিনজনের কোন হদিশ খুঁজে পাওয়া যায়নি।

দুর্ঘটনার কারণ জানতে চাইলে তিনি জানালেন, এলাকার নদীগুলির নাব্যতা কমে আসছে। চর পড়াতে আধুনিক লঞ্চ চলতে

ব্রেক ও গিয়ারহীন ভটভটি-ই সুন্দরবন এলাকার মানুষদের একমাত্র যান



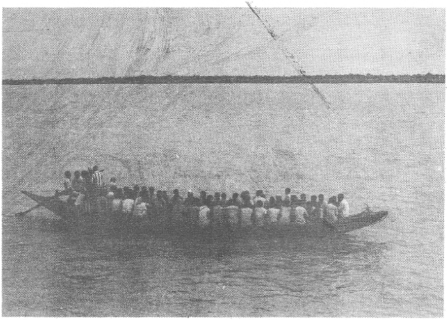
পারছে না। ভাঁটার টানে নৌকা আটকে যায়। পাল তোলা নৌকা জোয়ার না এলে এগুতে পারে না। এসব কারণেই এই ভটভটিগুলি এলাকার যোগযোগের ক্ষেত্রে অপরিহার্য যান হয়ে উঠেছে।

প্রসংগক্রমে তিনি জানালেন, এই এলাকায় বছরে দু'একটি নৌ-দুর্ঘটনা লেগেই আছে। শুধু তাই নয়, প্রয়োজনের তুলনায় মোটর বোটের সংখ্যাও কম। ঝড়খালি থেকে ক্যানিং আসার নৌকা তিন ঘণ্টা অন্তর একটা করে ছাড়ে। দেবুবাড়ি থেকে ক্যানিং-এর পথ প্রায় বন্ধ হতে চলেছে চর পড়ে যাওয়ার জন্য। এইভাবেই পরিবহনের বিরাট সমস্যা ঘাড়ে নিয়ে এই এলাকার মানুষ দিন যাপন করছেন।

বাসন্তী থানার ও সি এ এফ রসিদ জানালেন, তাঁর এলাকায় কোন লাইসেন্সবিহীন ভটভটি নেই। এই ধরনের ভটভটি তিনি তাঁর এলাকায় ঢুকতে দেন না। তবে ব্রেক ও গিয়ার ছাড়া ভটভটি যাতে চলাচল করতে না পারে, তার জন্য প্রশাসনকেও দেখতে হবে বলে তিনি মনে করেন।

ক্ষোভের সুরে তিনি বলেন, এই এলাকায় যানবাহন সমস্যা তীব্র আকার ধারণ করেছে। প্রয়োজনের তুলনায় বাস যেমন কম, তেমন নদীবহুল সুন্দরবনের মোটর বোটের সংখ্যাও অপ্রতুল। তারপর নদী সংস্কারের কাজ কিছুই হয়নি। ভাটার সময় বিস্তৃত এলাকায় চড়া পড়ে যায়। এর ফলে যে কোন দিন আরও ভয়ংকর রকমের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে তাঁর আশংকা।

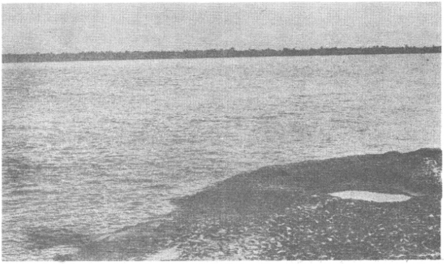
ক্যানিং-এর বি ডি ও বিজন নাথ ভটভটি যে লাইসেন্স ছাড়া চলছে, তা অস্বীকার করে বলেন, এ ব্যাপারটা তাদের গোচরে যখনই আসে, তখনই তারা প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেন। তবে এই এলাকার যানবাহন সমস্যা অত্যন্ত জটিল আকার ধারণ করার ফলে তারা এই ব্যাপারে দৃঢ় পদক্ষেপ নিতে পারছেন না বলে তিনি মন্তব্য করেন।



ভটভটি ছাড়া গতি নেই

সুন্দরবন মোটর লঞ্চ সিন্ডিকেটের সদস্য প্রদীপ ঘোষ অভিযোগ করে বলেন, সুন্দরবন এলাকা থেকে সরকারের প্রচুর আয় হওয়া সত্ত্বেও এই এলাকা আজও অবহেলিত হয়ে রয়েছে। মাতলা নদীর দুই পারে চড়া পড়া বিস্তীর্ণ এলাকার দিকে তাকিয়ে প্রদীপবাবু বললেন, নদী আস্তে আস্তে শুকিয়ে যাচ্ছে। ড্রেজার দিয়ে খনন করে নদী সংস্কারের কাজ সরকার হাতে নেননি। অথচ নদী সংস্কারের কাজ না হলে এই সমস্যার সমাধান করা অসম্ভব বলে তিনি মনে করেন।

প্রদীপবাবু জানালেন, বর্ষাকালে এখানকার নদীগুলির অবস্থা ভয়ংকর হয়ে ওঠে। ভটভটি চলাচল বন্ধ করার জন্য তাঁরা কোনরকম উদ্যোগ নিয়েছিলেন কিনা, এই প্রশ্নে প্রদীপবাবু জানান, তাঁরা ভটভটি চলাচল বন্ধ করার জন্য বহু আবেদন নিবেদন করেছিলেন। তাঁরা চালকদের বলেছিলেন, আপনারা নৌকা চালান, কিন্তু ব্রেক ও গিয়ার হীন ভটভটি চালাবেন না। কিন্তু এতে কোন ফল হয়নি। বরং তাঁরা ইউনিয়ন করে আন্দোলন করার ফলে ব্যাপারটা থিতিয়ে গিয়েছে।



সি পি আই এমের ক্যানিং আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক হরিপদ বসু জানালেন, নদী সংস্কারের জন্য প্রচুর টাকা দরকার। এই অর্থ কেন্দ্রীয় সরকারই একমাত্র বহন করতে পারে। আমরা ৮৪ সালের মগরাহাটে কৃষক সম্মেলনে দাবি তুলেছিলাম, মান সিং পরিকল্পনা কার্যকর করতে হবে। ড্রেজার দিয়ে মাটি কেটে নদী খনন কাজ শুরু না করলে সুন্দরবনের নদীগুলিকে বাঁচানো সম্ভব নয়। তবে ভটভটি যাতে ব্রেক ও গিয়ার নিয়ে চলতে পারে, তার জন্য আমরা প্রশাসনিক উদ্যোগ নেব। লাইসেন্স দেওয়ার ক্ষেত্রে যাতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি মেনে চলা হয় তাও আমরা দেখব বলে হরিপদবাবু মন্তব্য করেন।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা শাসক অরুণ ভট্টাচার্য মনে করেন, ইনল্যান্ড ভেসেলস্ অ্যাক্ট সংশোধন করা দরকার। তা না করলে তাঁরা আইনের সীমাবদ্ধতার মধ্যে পড়ে যাচ্ছেন।

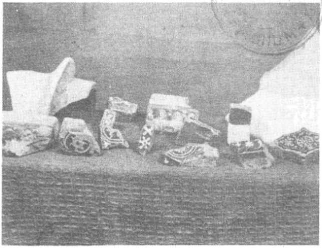
অরুণবাবু জানান, এই আইন সংশোধন করা হলেই ভটভটিকে লাইসেন্স দেওয়ার ক্ষেত্রে একটা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি মেনে চলা সম্ভব। বোটগুলি তৈরি করা থেকে শুরু করে যাত্রী সংখ্যা নির্ধারণ ও নাবিকদের যোগ্যতা পর্যন্ত সবকিছুই পরীক্ষা-নিরীক্ষা তখনই করা সম্ভব।

তবে অরুণবাবু স্বীকার করেন, নদী সংস্কারের কাজ না হলে সুন্দরবনের আসল সমস্যার সমাধান হবে না। নদী সংস্কারের কাজটা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। কেন্দ্রীয় সরকারের গংগা অ্যাকসন প্ল্যানের মতই এটার জন্যও দরকার কোটি কোটি টাকা। □

স্বপন বসু

ছোট সাগরদীঘিতে শশাঙ্কের আমলের নিদর্শন উদ্ধারের অপেক্ষায়

মালদার ইংলিশবাজার থেকে বাসে মহদিপুর যাওয়ার পথে নাজিরখানি ও বিলমারি মৌজার ছোট সাগরদীঘি জায়গাটা তেমন জমজমাট নয়। এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে কয়েক ঘর গরিব মানুষের বাস। খাল, বিল, নদীতে মাছ ধরে আর পরের জমিতে কাজ করে এদের দিন গুজরান করতে হয়। গ্রামে অনেক কিছুই নেই। নেই জলের জন্য কল-কুয়ো। টলটলে জলের দীঘিই ছোট সাগরদীঘির মানুষের তেষ্টা মেটায়। চৌকো নয়, উত্তর-দক্ষিণ বরাবর লম্বাটে এই দীঘি। বারমাসই জল থাকে এতে। দীঘির চারদিকে প্রচুর আমগাছ সবসময়ই একটা ছায়াঘন পরিবেশের সৃষ্টি করে রেখেছে। মন ভরে ওঠে চোখ জুড়ানো সবুজের সমারোহে।



ফটো : যোগেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর সৌজন্যে

সাগরদীঘিতে পাওয়া গেছে এই প্রাচীন ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলি

গত বছরের জুলাই মাসে প্রচণ্ড বর্ষায় গোটা মালদা জুড়ে যে ভয়াবহ বন্যা হয় তার হাত থেকে সাগরদীঘিও রেহাই পায়নি। তখনই কোন একদিন দীঘির দক্ষিণ-পশ্চিম পাড়ের বিরাট এক আমগাছ শেকড় আলগা হয়ে গোড়া সুদ্ধু হেলে পড়েছিল। আমগাছটা ছিল বড়সড় একটা ঢিপির ওপর। হেলে পড়া আমগাছের চাপে আর শেকড়ের টানে গোড়ার ঢিপি ফুটিফাটা হয়ে বেরিয়ে পড়ে পুরনো আমলের কিছু ছোট ছোট লাল ইঁট আর অজস্র পাথরের টুকরো টুকরো অংশ। কোন পাথরের গায়ে সাদা রং দিয়ে আঁকা ফুল, কোনটার গায়ে ঘন নীল রঙের বর্ডার, কোনটাতে আবার যত্ন করে আঁকা ফুল-লতা-পাতার চোখ জুড়নো আলপনা। ঢিপির নীচ থেকে আরও বেরিয়ে পড়েছিল পোড়ামাটির তৈরি পয়ঃপ্রণালীর কিছু ভাংগা অংশও। এগুলির গায়ে সাদা রং-এর প্রলেপ।

জুলাই থেকে অক্টোবর – এই টানা চারমাস মূল্যবান এই প্রাচীন প্রত্ন নিদর্শনগুলো অবহেলায় পড়ে থাকল লোকচক্ষুর নজর এড়িয়ে। ছোট সাগরদীঘির কয়েকঘর গরিব মানুষ নিজেদের রুটি-রোজগার নিয়েই ব্যস্ত। এগুলির প্রত্নতাত্ত্বিক মূল্য যাচাই-এর সময় কোথায় তাদের? শেষপর্যন্ত মালদার যোগেন চৌধুরী নামে এক ভদ্রলোক হঠাৎই আবিষ্কার করে ফেলেন এগুলি।

মাছ ধরার দারুণ নেশা যোগেনবাবুর। হাতে সময় পেলেই কাছে-দূরে নানা জলাশয়ে ছুটে যান। বন্ধু-বান্ধব নিয়ে সারাদিন চুটিয়ে মাছ ধরেন। নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি যোগেনবাবু হঠাৎই সাগরদীঘিতে এসেছিলেন মাছ ধরতে। মাছ ধরার ফাঁকে দীঘির পাড়ে ঘোরাঘুরির সময় নজর পড়ে উপড়ানো আমগাছের তলার ঢিপিটা। ঢিপির ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়া ইট ও পাথরের টুকরোগুলো হাতে নিয়ে নাড়াচাড়ার 'পর যোগেনবাবু বুঝলেন এগুলো ফেলনা জিনিস নয়। সন্ধানী চোখে এগুলোর ঐতিহাসিকমূল্য ধরা পড়ল। গভীর যত্নের সংগে সংগ্রহ করে নিলেন ইঁট আর পাথরের টুকরোগুলো।

ইংলিশবাজারে নেতাজী মোড়ের কাছে যোগেনবাবুর বাড়ি। প্রচুর জমি জায়গা আর বেশ কয়েকটা আমবাগান আছে ওঁর। এলাকায় করিৎকর্মা মানুষ হিসেবেও নামডাক আছে। অবসর সময়ে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সম্পর্কিত নানা বইপত্র পড়াও তাঁর নেশা। দীঘির পাড় থেকে খুঁজে পাওয়া ঐ ইঁট আর পাথরের টুকরোগুলো গৌড়ের প্রবল পরাক্রান্ত রাজা শশাংকর আমলের বলে যোগেনবাবু মনে করেন। শশাংকর আমলের নানা ঐতিহাসিক নিদর্শনের সংগে যোগেনবাবুর উদ্ধার করা জিনিসগুলির অদ্ভুত সাদৃশ্যই তাঁর এই বিশ্বাসের ভিত্তি। যোগেনবাবু আরও জানালেন, ঢিপিটাকে ভাল করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে প্রায় হাজার চারেক বর্গফুটের বিশাল আয়তনের কোন বাড়ির ধ্বংসাবশেষ এর নীচে লুকিয়ে রয়েছে। তাঁর দাবি উদ্ধার করা ইঁট, পাথরের টুকরো এবং পয়ঃপ্রণালীর অংশগুলো ভাল করে পরীক্ষা করার পর যদি এগুলো রাজা শশাংকর আমলের বলে প্রত্নতাত্ত্বিক বিশেষজ্ঞ ও গবেষকরা একমত হন, তাহলে মাটির নীচে প্রায় ১৪০০ বছরের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ এখন আবিষ্কারের অপেক্ষায়।

প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগকে এই আবিষ্কারের কথা জানানো হয়েছে কিনা জানতে চাওয়ায়, যোগেনবাবু জানালেন, সরকারি পর্যায়ে মালদার জেলাশাসককে তিনি একথা জানিয়েছেন। জেলা বন আধিকারিককেও খবর দিয়েছেন। কিন্তু জেলাপ্রশাসনের তরফ থেকে এপর্যন্ত উল্লেখযোগ্য কোন উদ্যোগই নেওয়া হয়নি।

অবশ্য ক্ষোভ একা যোগেনবাবুর নয়। যোগেনবাবুর সুরে সুর মিলিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন আরও অনেক মানুষ। গোটা মালদা জেলার নানা জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে এমনি বহু ঐতিহাসিক নিদর্শন। খোলা আকাশের নিচে, ঝড়-জল মাথায় নিয়ে শত শত বছরের পুরনো দেব দেউল, মন্দির-মসজিদ, রাজ-রাজড়াদের অমূল্য কীর্তিগুলি আজ উপযুক্ত সংরক্ষণের অভাবে জরাজীর্ণ। এগুলো রক্ষা করার তেমন কোন চেষ্টাই সরকারি তরফে হয়নি। ফলে মূল্যবান ঐসব ঐতিহাসিক নিদর্শন আজ ধ্বংসের পথে।

সুমন গুপ্ত

নদীয়া

রানাঘাট কুপার্স ক্যাম্পে বেকারি বাড়ছে

দেশ বিভাগের ঠিক পরেই ওপার বাংলা থেকে আসা প্রায় ৬৩ হাজার উদ্বাস্তুকে পুনর্বাসিত করা হয়েছিল নদীয়া জেলার রানাঘাটের কাছে কুপার্স শরনার্থী শিবিরে। পশ্চিম-বংগের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বিরোধী সদস্যদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, এখানকার বাসিন্দাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা এবং অর্থনৈতিক পুনর্বাসন দেবার জন্য কুপার্সকে একটা শিল্পাঞ্চল হিসেবেও গড়ে তোলা হবে। কিন্তু কিছুদিন আগেও কুপার্স-এর বাসিন্দাদের দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়ে শুনে এসেছিলাম একরাশ অভিমান-ভরা অভিযোগ। না, বিধান রায়ের পর পশ্চিমবংগে কংগ্রেস-বামপন্থী মিলিয়ে পাঁচজন মুখ্যমন্ত্রী বদল হয়েছেন, কিন্তু রাণাঘাটের কুপার্স শিল্পাঞ্চল হিসেবে গড়ে ওঠেনি। বদল হয়নি হতভাগ্য উদ্বাস্তুদের ভাগ্যের। বরং আর আই সি পরিচালিত যে সিরামিক কারখানাটি গড়ে উঠেছিল কুপার্সের বাসিন্দাদের অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের দায়িত্বভার কিছুটা কাঁধে নেওয়ার জন্য, গত ১৯৬৭ সালে তা কিছু দিনের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। তারপর ১৯৭২ সাল থেকে আজ পর্যন্ত তা পুরোপুরি বন্ধ হয়েই রয়েছে।

আর আই সি পরিচালিত ওই সিরামিক কারখানার পরিচালক মণ্ডলী কুপার্স উদ্বাস্তু সংগ্রাম কমিটির নেতা দশরথ বিশ্বাস থেকে শুরু করে সব সাধারণ বাসিন্দাকে জানিয়ে দিয়েছেন, এ কারখানা থেকে

আর আই সি-র কোন লাভ হচ্ছে না, তাই এর দরজা চিরকালের জন্য বন্ধ হয়ে গেল। অথচ প্রায় ১১ একর জায়গা নিয়ে গড়ে ওঠা এই কারখানায়, দশরথবাবুর মতে, কুপার্সের প্রায় ৮০ ভাগ বাসিন্দার কর্মসংস্থান হয়েছিল।

এলাকার বাসিন্দা নদীয়া জেলা কংগ্রেসের শ্রমিক সেল ও উদ্বাস্তু সংগ্রাম পরিষদের নেতা সুশীল কুমার রায় জানালেন, 'বর্তমানে এই কারখানা দুর্গাপুর ও বনহুগলীতে সরে যাওয়ায় এখানকার মানুষের ঐ কারখানায় নতুন করে চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা একেবারেই মুছে গেছে। বন্ধ কারখানার বিশাল এলাকায় এখন শুধু তিন/চার জন দারোয়ান যক্ষের ধন আগলাবার মত করে ঘুরে বেড়ান। কিন্ত তাতে চুরি আটকান যায়নি। ইতিমধ্যেই চুরি গেছে বেশ কিছু মেশিনপত্র।'

প্রফুল্ল সেন মুখ্যমন্ত্রী থাকা কালীন আর আই সি-র তিন একর জমি নিয়ে একটি বেসরকারি পেপার মিল চালু হয়েছিল। তা এখনও চলছে। কুপার্স ক্যাম্পের জনা পঞ্চাশ মানুষ ঐ মিলে কাজ করছেন। দশরথ বিশ্বাস এবং সুশীল রায় উভয়েরই মতে মাত্র ৫০/৬০ জনের কাজ হলে সমস্যা মিটবে না! এখাকার বাসিন্দাদের চাষযোগ্য কোন জমি নেই। তাঁত বুনে, মাঠে জন খেটে আর রাজমিস্ত্রীর যোগানদার হয়ে এখানকার মানুষ অনেক কষ্টে সংসার চালান।

১৯৮২ সালে পশ্চিমবঙ্গের পাঁচজন কংগ্রেসী লোকসভা সদস্য রাজেন্দ্রকুমারী বাজপেয়ীর মাধ্যমে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর কাছে আর আই সির কারখানাটি কো-অপারেটিভের হাতে তুলে দেবার জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন। এতে বহু মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ ঘটবে। এই পরিপ্রেক্ষিতেই দশরথবাবুরা কুপার্স মালটিপারপাস ইন্ডাস্ট্রিয়াল কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড নামে একটি সমবায় গঠন করেছিলেন। কো-অপারেটিভের সদস্যদের কাছ থেকে ৫০ টাকা করে চাঁদাও তোলা হয়। দশরথবাবুর মতে, 'সিরামিক কারখানা নয়, আমরা রোলিং মিলের কারখানা করতে চাই। এখানে সিরামিক কারখানা করা টেকনিকালি ভুল। কারণ, কাঁচা মাল আনতে হয় বিহার থেকে। তাছাড়া গত ৩০ বছরেও এখানে সুষ্ঠু পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। ফলে উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রির সমস্যা রয়ে গেছে।' দশরথবাবু জানালেন, ১৯৮৪ সালের জুলাই মাসে রোলিং মিল-এর স্কিম কেন্দ্রীয় সরকার পাস করে দেবার পরও আর আই সি-র শেড সহ ১১ একর জমি হস্তান্তর হয়ে আমাদের হাতে আসেনি। কারণ, আর আই সি-র শর্তগুলি সম্পর্কে চূড়ান্ত কোন সিদ্ধান্ত এখনও নেওয়া হয়নি। তারা এ বাবদ যে বার্ষিক ভাড়া দাবি করেছে তা আমাদের এবং ভ্যালুয়ারের আলোচনার মাধ্যমে স্থির না হওয়া পর্যন্ত এবং কটা মেশিন কি অবস্থায় আছে তার সঠিক তথ্য না জানা পর্যন্ত এ হস্তান্তর সম্ভব নয়।

অন্যদিকে, অবিলম্বে এখানে যদি কোন নতুন শিল্প স্থাপন না করা যায় তবে এখানকার মানুষের ক্রমবর্ধমান বেকারত্বও দূর করা সম্ভব নয়। রাজ্য সরকারের তরফে প্রত্যক্ষ কোন উদ্যোগ ও লক্ষ্য করা যায়নি বলে এখানকার মানুষের অভিযোগ। এঁদের ক্ষোভ, সার্বিক উন্নয়নের ব্যাপারে কিছু করা তো দূরের কথা, আমরা নিজেরা যখন নিজেদের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করছি, তখনও রাজ্য সরকার আমাদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসছেন না। □

শুভেন্দুকুমার ভৌমিক

পরবাস

চন্দ্রপুরার উদ্বাস্তুরা আবার বাস্তুচ্যুত হতে বসেছেন

বাঙালি উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্যে মধ্যপ্রদেশের দন্ডকারণ্যে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু তাঁদের একাংশকে মহারাষ্ট্রের চন্দ্রপুরার এক ক্যাম্পে পাঠানো হলেও বেশ একটা বড় অংশ এখনও কোন পুনর্বাসন পাননি। অবশ্য চন্দ্রপুরা ক্যাম্পের বেশ কিছু উদ্বাস্তুকে চন্দ্রপুরার ৯০ কিলোমিটার দূরে গাওচেরোলি জেলার মূলচেরায় পুনর্বাসন দেওয়া হয় জঙ্গল কেটে বৃষ্টিহীন উঁচু জমিতে।

অনেকের মত আমাদেরও ধারণা ছিল যে, উদ্বাস্তুদের সব পুনর্বাসন হয়ে গেছে। কিন্তু চন্দ্রপুরায় গিয়ে প্রথমেই বাঙালি ক্যাম্পের কথা শুনতে পেলাম। বর্তমান শহরের এক প্রান্তে বাঙালি কলোনি, বাঙালি বাজার, বাঙালি ছাত্রদের জন্য বাংলা মিডিয়াম স্কুল আছে। স্থানীয় লোকেদের সংগে কথা বলে জানতে পারলাম, এখনও বহু লোক এলাকার বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। কিছু লোককে ৫ হাজার টাকা কাঠা দরে জমি দেওয়া হচ্ছে বাড়ি তৈরি করার জন্য। কিন্তু যাঁদের সামর্থ্য নেই, তাঁরা থাকবেন কোথায়? কারণ কিছুদিন বাদেই ঐ ভগ্নপ্রায় শিবিরগুলো ভেঙে দেওয়া হবে। কোন স্থায়ী চালা নেই বাজার বসাবার জন্য, যদিও এই বাজারকে কেন্দ্র করেই বহুলোকের জীবিকা নির্বাহ হয়।

বাঙালি ছাত্রছাত্রীদের জন্য ১৯৬৪ সালে গড়ে উঠেছিল চাঁদা বেংগলি মিডিয়াম স্কুল। প্রতিবছর ঝড়-জলে স্কুলের কাঁচা দেওয়াল ভেঙে যেত, সেই কারণে এ বছর স্কুল কমিটি নিজেদের পয়সায় পাকা দেওয়াল করেছে, দরজা জানালা তৈরি করেছে। ব্ল্যাক বোর্ড হয়েছে নিজেদের পয়সায়। ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৩৩০ জন, কিন্তু তাদের বসার জন্য কোন বেঞ্চ নেই এবং মাত্র ছ'টা ঘর ভরসা। স্কুলের টিনের চাল ঝড়ে উড়ে যায়। কোন বিদ্যুৎ-সংযোগ নেই, ছাত্রছাত্রীদের জন্য কোন বাথরুম নেই। সরকারের এই দিকে কোন দৃষ্টি নেই। এখানকার ছাত্রছাত্রীরা সপ্তম শ্রেণী অব্দি পড়ার পর স্থানীয় হাই স্কুলে সরাসরি ভর্তি হতে পারে। এই একটাই যা সুবিধে।

মারাঠি না জানলে উচ্চশিক্ষা বা চাকরির অসুবিধে হয় বলে বল্লারপুরের প্রাথমিক (বাংলা) স্কুলটি ছাত্রাভাবে বন্ধ হয়ে যায়।

বাঙালি উদ্বাস্তু যাঁরা হিন্দি-ভাষাভাষী এলাকায় উদ্বাস্তু থাকাকালীন স্কুল-কলেজ জীবন সমাপ্ত করছেন এবং পরবর্তীকালে মহারাষ্ট্রে পুনর্বাসিন পেয়েছেন, তাঁদেরকে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে নাম নথিভুক্ত করতে গেলে নন লোকাল মার্ক করে দেওয়া হচ্ছে। এমন কি এস টি সুযোগ-সুবিধেও দেওয়া হচ্ছে না। সমস্ত বাঙালি উদ্বাস্তু অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। তাঁদের আশংকা, আবার না তাঁদের বাস্তুচ্যুত হতে হয়! □

গৌতম দাস

হিন্দুজা পরিবারে বিবাহোৎসব

ঠাকুরমার ঝুলি থেকে কি বেরিয়ে এল রূপকথার দেশ ?

সিংগাপুর থেকে উড়ে এল ফুলহার, পৃথিবীর সেরা পেস্তা-বাদাম এল ক্যালিফোর্নিয়া থেকে, সুইজারল্যান্ড থেকে এল চকলেট আর আমন্ত্রিতরা এলেন ভুবন জুড়ে, উড়ে। অশোক লেল্যান্ড অধিগ্রহণ করার পরও তাঁদের পরিবারের সম্পদ (দাবি করা হয় বার্ষিক বাণিজ্যের পরিমাণ ১৪,৩০০ কোটি টাকা) এবং আন্তর্জাতিক প্রতিপত্তি সম্বন্ধে যদি কারো আর কোন সন্দেহের অবকাশ থেকে থাকে তবে তা ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবার জন্যই যেন পরিবারের প্রধান শ্রীচাঁদ হিন্দুজার কন্যার বিবাহ উৎসবে তাঁদের বোম্বের জুহু বিচের পারিবারিক প্রাসাদে এক অত্যাশ্চর্য রূপকথার আসরই বসালেন তাঁরা।

হিন্দুজাদের অশোক লেল্যান্ড অধিগ্রহণের ঘটনা বোম্বের ব্যবসায়ী মহলে সাড়া ফেলে দিয়েছিল। কিন্তু শ্রীচাঁদ ও মধু হিন্দুজার ২৩ বছরের কন্যা সানুর সংগে লন্ডনের প্রতিষ্ঠিত আরেক সিন্ধি ব্যবসায়ী পরিবারের নার্সি ও জানকী মুখীর ২৫ বছরের পুত্র সুরেনের বিবাহোৎসবের অলৌকিক জাঁকজমক তাঁদের অনেক বেশি অবাক করে দিয়েছে। বিখ্যাত শিল্পী এম এফ হুসেনকে দিয়ে আঁকানো হয়েছে চারটি পেইন্টিং এবং এই পেইন্টিং-এর রিপ্রোডাকশন থেকে তৈরি হয়েছে ক্যালেন্ডার সাইজের আমন্ত্রণপত্র। সেই মধ্যযুগের পারসিক পাশাদের বৈভব প্রদর্শনীর সভাগৃহও হার মেনে গিয়েছিল এই বিবাহোপলক্ষ্যে আয়োজিত ককটেল পার্টিকে ঘিরে।

হিন্দুজা পরিবারের তৃতীয় প্রজন্মে এই প্রথম কোন বিবাহ অনুষ্ঠিত হল। শোনা যায়, শ্রীচাঁদ এবং তাঁর তিন ভাই এই বিবাহোপলক্ষ্যে বৈভবের এমন জাঁকজমক পেশ করতে চেয়েছিলেন, যা গ্রিক জাহাজ-সাম্রাজ্যের অধীশ্বরের চোখকেও ধাঁধিয়ে দেবে। বোম্বের বন্দরে এসে ভিড়বে বিশ্বের সেরা প্রমোদতরণী কুইন এলিজাবেথ – সেখানে এসে উঠবেন অতিথিরা। আমন্ত্রিতদের অভ্যর্থনা-সভায় গান গাইবেন আমেরিকার বিখ্যাত পপ সিংগার লারনেল রিচি, যাঁর পারিশ্রমিক ৫০ লক্ষ টাকা। মেটাল ডিটেক্টার বসিয়ে সমস্ত এলাকাকে করা হবে নিরাপত্তার দিক দিয়ে নিচ্ছিদ্র। কনের বিয়ের পোশাকটির দাম নাকি পড়েছে ৬ লক্ষ টাকা, তাঁর হীরের নেকলেসটির দাম ৫০ লক্ষ টাকা। এবং সমস্ত বিয়ের খরচ – হ্যাঁ, পিলে চমকে দেবার মত – ৫০ কোটি টাকা!

চার দিনের এই বিবাহ অনুষ্ঠান দারুণ জাঁকজমক এবং ঘড়ির কাঁটার মত নিখুঁতভাবে



সম্পন্ন হলেও শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা কিন্তু অ্যান্টি ক্লাইম্যাক্সের মত হয়ে গেল এবং সংবাদপত্রের শিরোনামে উঠে আসতে ব্যর্থ হল। 'ওই সমস্ত, সবই গুজব। আমাদের ওরকম কোন পরিকল্পনাই ছিল না।' খুশিতে উচ্ছল কন্যার পিতা জানালেন, 'বিয়ের খরচ খুব একটা বেশি হয়নি – কেন না আমরা খুব ইকোনোমি কনসাস। সমস্ত অনুষ্ঠানটিই করা হয়েছে পুরাতন বৈদিক প্রথা মেনে।'

যেমন শ্রীচাঁদ সরাসরি নাকচ করলেন ২০,০০০ আমন্ত্রণপত্রের খরচ পড়েছে ২ কোটি টাকা, তার মধ্যে হুসেন চারটি ছবি করতে নিয়েছেন ৫ লাখ টাকা। 'গণেশের ফোল্ডার সহ চারটি কার্ডের এক একটি প্যাকেজে খরচা হয়েছে মাত্র ২৮.৯৫ টাকা।' উনি জানালেন, 'লুপ্তপ্রায় বৈদিক প্রথার ওপর চারটি কাজ করতে হুসেন রাজি হন – এবং আমি তাঁর এই চারটি কাজকে পৃথিবী জুড়ে প্রমোট করব।'

কিন্তু সে যাই হোক, যে ১০,০০০ আমন্ত্রিত এই অনুষ্ঠানের যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের অধিকাংশের কাছেই মনে হয়েছে কখনো এমন জাঁকজমকপূর্ণ বিবাহোৎসব তাঁরা দেখেননি। বিয়ের অনুষ্ঠান বসেছিল পারিবারিক ভদ্রাসন জুহু বিচের ওপর পরম-জমুনা প্রাসাদে। বাড়ি থেকে সমুদ্র পর্যন্ত প্রায় পুরো সৈকত জুড়ে পড়েছিল উৎসবের ম্যারাপ। ম্যারাপ তৈরি করতে কলকাতা থেকে উড়ে এসেছিলেন নিপুণ কারিগররা। পুরো অনুষ্ঠানটাই যেন এক বৈভব-পূর্ণ মেলায় পরিণত হয়েছিল। মেহেদি অনুষ্ঠানের দিন বসেছিল মিনাবাজার। সার সার দোকান বসেছিল। দোকানে ছিল নানারকম ব্যাগ, অলংকার, অন্যান্য মনোহারি সম্ভারের সমারোহ, আমন্ত্রিতরা যাতে নিজের পছন্দ মত জিনিসটি তুলে নিতে পারেন সেখান থেকে অনায়াসে। বিদেশি অতিথিদের আনার জন্য একটা গোটা জেট প্লেন ভাড়া করা হয়েছিল। তাঁদের সিল্কের চুড়িদার-কুর্তা দিয়ে অভ্যর্থনা করা হল। সাপুড়েরা সাপের ঝাঁপি খুলে সাপ নাচাতে বসেছিল। আর হিন্দি ছবির সংগীতকার কল্যাণজী-আনন্দজী এবং গায়ক অমিতকুমার, মহেন্দ্র কাপুর ও নীতীন মুকেশ নানারকম গানের অনুষ্ঠান পেশ করলেন। ঘোষণায় ছিলেন তাবাসুম।

একটা ব্যাপার বেশ পরিষ্কার বোঝা গেল, হিন্দুজা পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা পরমানন্দ হিন্দুজা যিনি ইরানে হিন্দি ছবি রপ্তানি করার ছোট ব্যবসা নিয়ে জীবন শুরু করেছিলেন, সেই সময় থেকে হিন্দুজারা অনেক অনেকখানি পথ পেরিয়ে এসেছেন। বিভিন্ন রাজ্য সরকার ও রাজ্যপালদের কাছ থেকে এসেছিল অভিনন্দন বার্তা। এমন কি অভিনন্দনবার্তা পাঠিয়েছিলেন স্বয়ং রাষ্ট্রপতি আর ভেংকটরামন। প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর প্রতিনিধিত্ব করেন দলের সাধারণ সম্পাদক গোলাম নবী আজাদ। উপস্থিতদের মধ্যে যাঁরা বিশেষ অতিথি ছিলেন তাঁরা হলেন লোকসভার অধ্যক্ষ বলরাম জাখর, মানব সমাজ উন্নয়ন দপ্তরের কেন্দ্রীয়মন্ত্রী পি ভি নরসীমা রাও, বোম্বে আঞ্চলিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি মুরলী দেওরা, মহারাষ্ট্রের অর্থমন্ত্রী সুশীলকুমার সিন্ধে, অমিতাভ বচ্চন এবং সুনীল দত্ত।

পারিবারিক প্রথা অনুযায়ী আমন্ত্রিতদের শুধুমাত্র ফলের রস ও নিরামিষ আহার পরিবেশন করা হল। এরপর শুরু হল আতসবাজি ও লেসার রশ্মির খেলা। ঐ অত্যাশ্চর্য প্রদর্শনী পুরো এলাকার মানুষদের কয়েক ঘণ্টা জুড়ে মোহাবিষ্ট করে রেখেছিল।

নববিবাহিত দম্পতি হনিমুনে যাবেন থাইল্যান্ডের নতুন সমুদ্র উপকূল-আবাস-ফুকাট-এ। যাবার পথে হরিদ্বারের পুণ্যতোয়া গংগায় অবগাহন করে আশীর্বাদ চাইবেন। দেখে শুনে মনে হচ্ছে, হিন্দুজা পরিবার তাঁদের অতুল বৈভব দিয়ে নিজেদের জন্মভূমির দেশে এবার একটা স্থায়ী গুরুত্ব পাবার দিকে এগোচ্ছেন। □

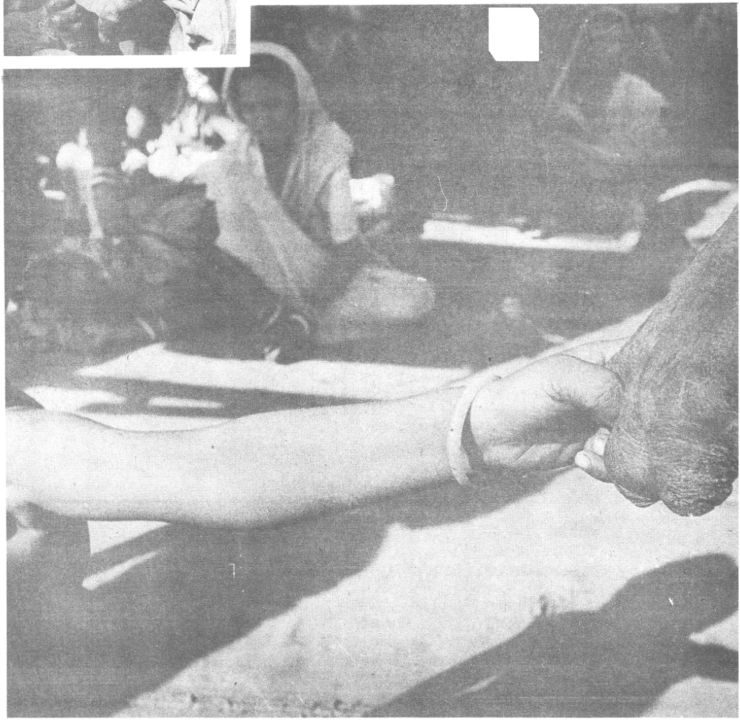
অরুণ আইন

কুষ্ঠ ছোঁয়াচে নয়, চাই



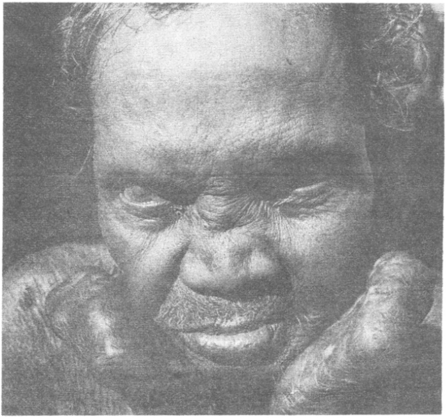
কুষ্ঠ রোগ ছোঁয়াচে নয়। কিন্তু রোগীর কষ্টটা ছোঁয়াচে হওয়া উচিত। কাঠারডাঙা, দুর্গাপুরের প্রায় ২০০ জন কুষ্ঠরোগী শহর কলকাতায় আমরণ অনশন চালিয়ে যাচ্ছেন এই আশা নিয়ে। দাবি সরকারি সাহানুভূতি। সিধু কানু ডহরে সামিয়ানার নিচে ওঁরা পোস্টার লিখছেন আমরা কি তোমাদের ভাই বোন হতে পারি না'। প্রশ্নটা অস্বস্তিকর। পথচলতি মানুষের মন হয়তো কিছুক্ষণের জন্য হলেও অপরাধী হয়ে উঠতে পারে।

সমাজচ্যুত এতদিন কুষ্ঠরোগী প্রায় ৪0 বছর ধরে দুর্গাপুরের কাঠারডাঙায় বসবাস করে আসছিল। অবস্থাটা অসহনীয়। ১৯৭৭ সালে বামফ্রণ্ট ক্ষমতায় আসার পর তৎকালীন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ননী ভট্টাচার্যর কাছে তাঁরা পুনর্বাসনের দাবিতে স্মারকলিপিও দিয়েছিলেন। সরকারি প্রতিশ্রুতি পাওয়ার পরও '৮৫ সালে পুনর্বাসিনের বদলে তাঁদের

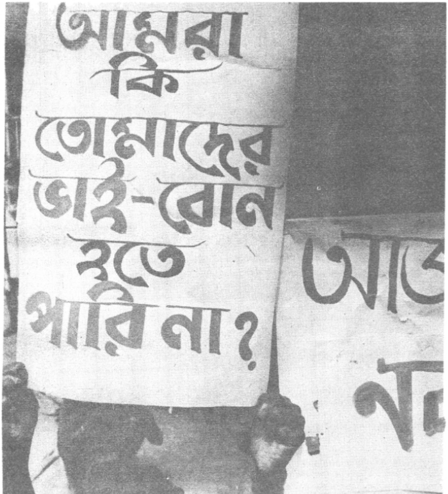


সহানুভূতি

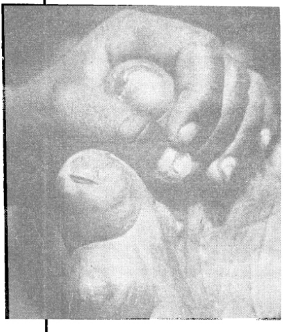
উংখাত করা হয় বেনাচিতির কাঠারডাঙা থেকে। সেদিন তাঁরা ছিলেন নিরুপায়। অভিযোগ, স্হানীয় প্রশাসন সেদিন ছিলেন নীরব দর্শকের ভূমিকায়। জোট বাঁধার শুরু সে সময় থেকেই। কয়েকটি সমাজকল্যাণমূলক সংস্হার সহযোগিতায় ছিন্নমূল কুষ্ঠরোগীদের দীর্ঘস্হায়ী আন্দোলনের ফলে বর্ধমান জেলা পরিষদ ৮৬-র ডিসেম্বরে এক চিঠিতে জানান, **৮৫টি কুষ্ঠ পরিবারের পুনর্বাসনের জন্য মোট**







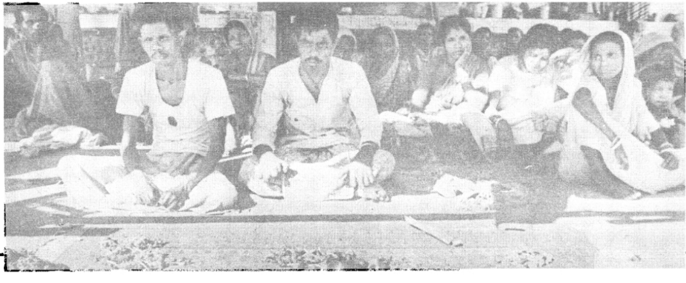




৮ লক্ষ ১৪হাজার টাকার মঞ্জুর করা হয়েছে। প্রসংগত এই টাকা আই ওয়াই এস এইচ প্রোগ্রাম খাতে মঞ্জুরীকৃত হয়। অথচ খবরে প্রকাশ, সরকার নাকি ওই টাকার অন্য খাতে খরচ করে ফেলেছেন। সে জন্যেই কুষ্ঠরোগীদের এই অবস্থান ও আমরণ অনশনের সিদ্ধান্ত। তাই এরা সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছেন, সেই মঞ্জুরীকৃত টাকা যেন সরকার অন্য খাতে ব্যয় না করে। মূল এই দাবির সংগে অন্যান্য দাবিগুলো হল, সমস্ত হাসপাতালে কুষ্ঠ ওয়ার্ড চালু করতে হবে। কুষ্ঠরোগমুক্ত রোগীদের জন্য চাকরির ব্যবস্থা ও ২000 সালের মধ্যে 'সবার জন্য স্বাস্থ্য' প্রকল্প কুষ্ঠরোগীদের মধ্যেও চালু করার প্রতিশ্রুতি দিতে হবে।

কথা হচ্ছিল কুষ্ঠরোগীদের আন্দোলনের পথ দেখিয়েছেন যে সংস্থা সেই লিবারেল অ্যাসসিয়েশনে ফর মুভমেন্ট অব পিপল বা ল্যাম্প (LAMP)-এর এক তরুণ কর্মীর সংগে। প্রশ্ন ছিল, কুষ্ঠরোগীদের মধ্যে আপনারা ঠিক কী কী কাজ করেন? জানা গেল, এদের স্বনির্ভর করে তোলাটাই এদের লক্ষ্য। এর জন্য প্রথমেই প্রয়োজন অসহায় এইসব মানুষদের সংগে সহানুভূতি এবং ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপন। কুষ্ঠরোগীদের মানসিক দীনতা কাটানোর একমাত্র উপায় সমাজের মূল স্রোতের সংগে এদের মিশিয়ে দেওয়া। বোঝানো দরকার যে তুমি ঘৃণ্য নও। তোমার জন্য আছে চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত। তবেই একজন কুষ্ঠরোগী স্বনির্ভর হয়ে উঠতে পারে। বলতে পারে 'ভিক্ষা নয় কাজ চাই।'

লেখা ও ছবি ঃ
সৌগত রায় বর্মন



আধুনিক জীববিজ্ঞানে বায়ো-টেকনোলজি কতখানি সফল?

আধুনিক জীববিজ্ঞানে বায়ো-টেকনোলজির প্রয়োগ এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে এটি কতখানি কার্যকর হবে তা নিয়ে বিজ্ঞানীসমাজ চিন্তিত। মূলত বার্গ, এসবার, গিলবার্ট এবং স্মিথের নোবেলপ্রাপ্তির পরেই জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এবং বায়ো-টেকনোলজি স্বীকৃতি পায়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এবং বায়ো-টেকনোলজি এক ব্যাপার নয়। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বলতে বোঝায় 'রি-কমবিনেন্ট ডি এন এ টেকনিক, অর্থাৎ কৃত্রিম পরিবেশে কোষের বাইরে জীবনের মূল উপাদান এবং স্বরূপ নির্ধারণকারী জেনেটিক কোড বা জিনের ভাষাসজ্জার স্থানান্তকরণ অথবা আংশিক বিয়োজন বা অন্য উৎসের জিনের আংশিক বা পূর্ণ সংযোজন। এই রিকমবিনেন্ট ডি এন এ-কে বৃহৎ পরিসরে বাণিজ্যিকভাবে প্রয়োগের জন্য যে কৌশল ও পদ্ধতি – সেটাই বায়ো-টেকনোলজি। সংক্ষেপে বায়ো-টেকনোলজি, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ব্যবহারগত বৃহত্তর রূপ। কাজের মূল মাধ্যম জীব কোষ। ডি এন এ-কে যথোপযুক্ত রেস্ট্রিকশন এনজাইম দিয়ে ভেঙে প্রয়োজন-মত সংযোজন বিয়োজন অথবা সজ্জা স্থানান্তকরণের পর ভেঙে যাওয়া ডি এন এ-কে লাইগেজ দিয়ে জোড়া লাগানো হয়। এর পরেই এক বৃহৎ পরিসরে বাণিজ্যিকভাবে কাজে লাগানোর প্রয়াস শুরু হয়।

জীববিজ্ঞানে বায়ো-টেকনোলজির প্রভাব সুফল দেবে কিনা এই নিয়ে বিজ্ঞানীরা মতানৈক্যে রয়েছেন। পরিবেশ বিজ্ঞানীরা মনে করছেন, কৃত্রিম পদ্ধতিতে বায়ো-টেকনোলজির সাহায্যে সৃষ্ট জীবাণুসমূহের বাধাহীন প্রবেশ পরিবেশকে দূষিত করে তুলতে পারে। সুতরাং পরিবেশে জীবাণুর অনুপ্রবেশ বন্ধ করার উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে। ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক এ চক্রবর্তী কিছুদিন আগে ভারতে এসেছিলেন। ঐ সময়ে এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন, বায়ো-টেকনোলজির পরিবেশগত এই সমস্যা নিয়ে আমেরিকা এখন চূড়ান্ত বিতর্কের সম্মুখীন, উপযুক্ত কোন সিদ্ধান্তে আজও পৌঁছানো যায়নি। তথ্যানুসন্ধান আরও ব্যাপক না হলে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হবে না বলে তিনি জানান।

পরিবেশ বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, বায়ো-টেকনোলজির সাহায্যে যে কৃত্রিম জীবাণুসমূহ উৎপন্ন হবে, সেগুলি বিভিন্ন রোগ বহন করে মারাত্মক বিপর্যয়ের সূচনা করবে। সেক্ষেত্রে বায়ো-টেকনোলজির ব্যাপক ব্যবহার পরিবেশগত বিপর্যয় ডেকে আনবে।

বর্তমানে উদ্ভিদকোষ এবং ব্যাকটিরিয়া-কোষ নিয়ে ব্যাপক গবেষণা চলছে। প্রাণী-কোষ নিয়ে এখনও তেমন কোন কাজ হচ্ছে না। ভারতে কয়েকটি উদ্ভিদকোষ নিয়ে কিছু কিছু কাজ হচ্ছে, তবে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে এখনও কাজ শুরু হয়নি। কারণ আমাদের দেশে এখনও বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সহযোগিতার অভাব যথেষ্ট। ফলে গবেষণার কাজে যেমন আর্থিক নিশ্চয়তার ব্যাপারটা থাকছে না, তেমনি গবেষণালব্ধ তথ্যকেও ব্যাপকভাবে শিল্পে ব্যবহার করা যাচ্ছে না। জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ বিজ্ঞান সম্পর্কিত শাখা বর্তমানে ডি এন এ টেকনোলজির সাহায্যে গাছের মধ্যে নাইট্রোজেন অনুপ্রবেশক্ষম জিন উদ্ভাবনের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। ভারতীয় বিজ্ঞানীরা এখন বায়ো-টেকনোলজির আহৃত তথ্য নিয়ে কিভাবে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করা যায়, সেই নিয়েই ভাবনাচিন্তা করে চলেছে। বর্তমানে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে বায়ো-টেকনোলজির প্রভাব সফল হবে কিনা, তাই নিয়েই চলছে গবেষণা।

সন্দেহ নেই, জিনগত এই প্রযুক্তিবিদ্যা আধুনিক জীববিজ্ঞানের জগতে নিয়ে এসেছে অনেক নতুন বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূত্র, বিশেষভাবে চিকিৎসা বিজ্ঞানে এই প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে এখন অনেক জটিল রোগ সারানো সম্ভব হচ্ছে। জিনের সুপরিকল্পিত ব্যবহার এবং ইমিউনিটি বা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পর্কে লব্ধ উন্নততর জ্ঞান প্রতিরোধী শস্য বীজ উৎপাদনে এক নতুন যুগের সূচনা করেছে।

ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং সাম্প্রতিক এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছে, বায়ো-টেকনোলজির মাধ্যম আগামী দশ বছরের মধ্যে ম্যালেরিয়া, কুষ্ঠ এবং যেকোন সংক্রামক রোগের আরও কার্যকর প্রতিষেধক আবিষ্কৃত হবে। কাউন্সিল আরও জানিয়েছে যে, মলিকুলার বায়োলজি এবং জেনেটিক্স সম্পর্কিত নতুন জ্ঞান ও তথ্যাদির সাহায্যে যে উপাদান জীবের মধ্যে রোগের সূচনা করে তাকে আলাদাভাবে কাজে লাগিয়ে বিজ্ঞানীরা এক ধরনের প্রতিরোধকারী বীজ তৈরি করেছেন, যেগুলির কার্যকারিতা অনেক বেশি।

মলিকুলার বায়োলজি প্রসঙ্গেই বাধা এলো পরিবেশ বিজ্ঞানীদের গবেষণাগার থেকে। আণবিক জীববিজ্ঞানে যে অপরিকল্পিত এবং অনাকাঙ্খিত নতুন জীবাণুসমূহের সৃষ্টি হবে সেগুলিকে প্রতিরোধ করার উপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকলে পরিবেশে এদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাবে, এবং এরা বহন করে নিয়ে আসবে ভয়াবহ রোগ। প্রকৃতিতে এমন সব ভাইরাস বা ব্যাক্টিরিয়া সৃষ্টি হবে, যা জীবজগতে মারাত্মক ব্যাধির সূচনা করতে পারে। সম্প্রতি প্যারিসে পাস্তুর ইনস্টিটিউটে বায়ো-টেকনোলজি নিয়ে গবেষণারত পাঁচজন বিজ্ঞানী দুরারোগ্য ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছেন। সম্ভবত জীন সংক্রান্ত গবেষণা করতে গিয়েই এই পাঁচ বিজ্ঞানী ক্যান্সারে আক্রান্ত হলেন। অনুমান যদি সত্যি হয় তবে জিন সংক্রান্ত এই গবেষণা কতদূর এগোবে সেই সম্পর্কে চিন্তার অবকাশ রয়েছে। শুধু তাই নয়, জিন প্রযুক্তির এই ক্ষমতাকে কাজে লাগানোর কথা যদি রাষ্ট্রনায়কেরা তাঁদের সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য ভাবেন তবে আগামী দিনের পৃথিবীতে বায়ো-টেকনোলজি নিয়ে আসবে বিকলাঙ্গ, বিকৃত শিশুদের। বায়ো-টেকনোলজির সাফল্য তাই এখনও ব্যাপক গবেষণা ও সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভরশীল। □

পুলক রঞ্জন চক্রবর্তী

বলুহাটি গ্রামের গর্ব বিকাশ পাঁজি

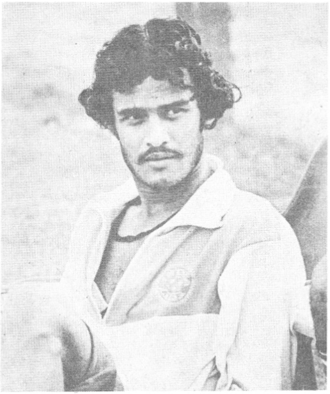
হাওড়া স্টেশন থেকে মাত্র এক ঘন্টা সময় হাতে নিয়ে বলুহাটি গ্রামে পৌঁছানো যায়। হাওড়া জেলাতেই এই গ্রাম। সালকিয়া বেনারস রোড, বেলগাছিয়া, কোনা, একসরা, জগদীশপুর হয়ে বলুহাটি যাওয়া যায়। বলুহাটির মিনি কিংবা সাতান্নর-এ বেসরকারি বাসও যায় তবে সেটা ভায়া ডোমজুড় হওয়া চাই, কেননা এই বাস জগদীশপুর থেকে দু'টি রুটে আলাদা আলাদা পথ দিয়ে বিভক্ত। একটি ভায়া ডোমজুড়, অপরটি ভায়া চন্ডীতলা।

বলুহাটিকে গ্রাম বললে হয়তো ভুলই হবে। যদি শহুরে গ্রাম বলা হয়, তাতে ব্যাকরণগত কোন ভুল হবে না।

চারদিকে সবুজ শ্যামলিমা গাছ-গাছালিতে ভরা এই গ্রাম। মাটির বাড়ি নেই বললেই চলে, যা-ও দু একটা চোখে পড়ে তাতে মাটির প্রলেপ অল্প, শান বাঁধানো মেঝে, ঘরে বিদ্যুতের আলো। জগদীশপুর থেকে এই গ্রামে আসতে গেলে মাইলখানেক পাকা পিচের রাস্তা পড়বে। তারপর সবই কাঁচা। কিন্তু বেশ ভাল রাস্তা। পরিবেশ শান্ত। সুশীতল ছায়া ঘেরা পল্লী প্রকৃতির মধ্য এঁকেবেঁকে গেছে সরস্বতী নদী। সরুভাবে।

এই ছোট গ্রামটার আনুমানিক লোকসংখ্যা হাজার সাতেক। দুখানা স্কুল। একটা প্রাথমিক বিদ্যালয় নতুন তৈরি হয়েছে, সেখানে ক্লাসও শুরু হয়ে গেছে বলে জানা গেল। একটি স্কুল বালিকাদের জন্য। নাম বলুহাটি বালিকা বিদ্যালয়। মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়ানো নয়। অপর স্কুলটি হল বলুহাটি উচ্চ বিদ্যালয়। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত এর শিক্ষা-গন্ডি। ছাত্র-ছাত্রীর সংমিশ্রণ। উচ্চ বিদ্যালয়ের কয়েকজন ছাত্র নজির সৃষ্টি করে গেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ভারতীয় ফুটবল দলের মিডফিল্ডার বিকাশ পাঁজি। এছাড়াও আছেন কয়েকজন কৃতী ছাত্র যাঁরা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে সরকারি সম্মানে সম্মানিত। তবু দুঃখের সঙ্গেই বলতে হচ্ছে, এ গ্রামে শিক্ষার প্রসারতা তেমন নেই। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পড়াশুনোর ব্যাপারে কোন প্রশ্ন করলেই তাদের স্পষ্ট জবাব, 'পড়াশুনো করে কী হবে! মা-বাবা তো বলে, কাজ করলে টাকা পাবি কিন্তু পড়াশুনো করলে তো খরচ।'

নানা রঙের ফ্রক পরা কতর্কগুলো মেয়ে টোপা কুল কুড়োচ্ছিল। তাদের কাছে গিয়ে প্রশ্ন করে একই জবাব পেলাম। বাবা নাকি বলেন, 'বিয়ে হয়ে গেলে শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে ঘরকন্না করবি, পড়াশুনো করে কী হবে?'' তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে ফিরে আসতে হল 'শিক্ষা' শব্দটাকে, অন্ধকারের মধ্যে ঠেলে দিয়ে। তবু কেউ কেউ পড়াশুনো করে বাড়িতে বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয় পড়ে, অনেকে স্কুলেও যায়, যতদিন না পর্যন্ত বাড়িতে কাজের চাপ সৃষ্টি হয়।



ফটো : পারমিতা রায় চৌধুরী

বিকাশ পাঁজি, বলুহাটির গর্ব

দশ হাজার নানা বিষয়ের বই নিয়ে 'বলুহাটি পাবলিক লাইব্রেরি'। এখানে স্কুল-পাঠ্য বইও কিছু আছে। প্রভাতী সাংবাদপত্রও রাখা হয়। গ্রামের ঐতিহ্যকে সকলের সামনে উজ্জ্বল করেছে এখানকার বি এস এ ক্লাব। বলুহাটি স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশন। ফুটবল খেলা প্রশিক্ষণে সারা হাওড়া জেলায় বিখ্যাত। ক্লাবটির সভাপতি এবং প্রতিষ্ঠাতা শৈলেন মান্না ক্লাব প্রসঙ্গে জানতে চাইলে এ্যম্বক সমাদ্দার নামের এক যুবক জানালেন, 'আপনি বিকাশ পাঁজির নামের চেয়ে 'লালু' নামের একজন গ্রামের পরিচিত খেলোয়াড়কে পাবেন। লালুই বিকাশ পাঁজি। আমরা লালু বলেই তাঁকে জানতাম। শুধু লালু কেন, গ্রামের সব ছেলেরাই খেলাধুলো নিয়ে বেশ আগ্রহী। বি এস এ ক্লাবে সাতজন খেলোয়াড় আছেন, যাঁরা কলকাতার প্রথম ডিভিশন-এ ফুটবল খেলেন। হীরা, অজয়, অতুল, লালু সবাই খেলেন, আপনি হয়তো শুনলে অবাক হবেন যে, কোন এক সময় বলুহাটিকে কেউই চিনত না, এমনকি পাশের গ্রামের লোকরাও আমাদের গ্রামের লোকদের অবহেলার চোখে দেখতেন। আর এখন তো সবাই এই গ্রামে এসে গল্প গুজব করার জন্য বিকাল হলেই সাইকেলে করে চলে আসেন, লালুর কাছে সবাই ঋণী। এমন কি বলুহাটি উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও। লালু এই স্কুলে বিশেষ পড়াশুনো না করলেও বহু পুরস্কার এনে খেলাধুলোর দিক দিয়ে স্কুলটিকে অনেক এগিয়ে দিয়েছেন। সত্যিই, ওঁর জন্য গর্বিত। বলুহাটি গ্রামের গর্ব বিকাশ পাঁজি।'

গ্রামে একখানা দড়ির কারখানা আছে। জাহাজ বাঁধার দড়ি তৈরি হয়। একজন অবাঙালি ভদ্রলোক মালিক। নাম দীনেশবাবু। দু'শো শ্রমিকের তিনি ভগবান। শ্রমিকদের কাছে তাঁর শোষণের কথা বলাটাই পাপ। কারণ অভাবের সংসারে তিনিই একমাত্র অন্নদাতা। নাম প্রকাশের অনিচ্ছুক একজন কর্মচারী জানালেন, 'আমরা যারা মিস্ত্রি আছি তারা আঠারো টাকা হারে রোজ কাজ করি। আবার আমাদের সহকারীরা পায় বার টাকা। বাচ্চারাও কাজ করে, তারা পাঁচ-ছ'টাকা পেলেই খুশি। তবে আমরা সাত ঘন্টার বেশি কাজ করি না। একঘন্টা বিশ্রাম। সেই সময় বাড়িতে গিয়ে ভাত খেয়ে আসি।'

বলুহাটি একটি শিল্পপ্রধান গ্রাম, এখানে নানারকম লোহার কারখানা আছে, আছে ইঁটখোলা, আর আছে ছোট ছোট কারখানা। একটা প্রেসও আছে।

চাষবাসে বিশেষ উন্নত নয় এ গ্রাম। পাশের গ্রামে অর্থাৎ ঘোষপাড়ার চাষীদের ফসল এখানে বিক্রি হয়। বলুহাটির চাষীরা কলা, নারকেল এসবের চাষ করেন, মরশুমি আনাজের চাষও করেন। সপ্তাহের দুদিন মঙ্গল এবং শনিবারে বিরাট হাট বসে জগদীশপুরের মোড়ে, ভোর থেকে রাত্রি পর্যন্ত নানান জিনিস বিক্রি হয়, আনাজ থেকে শুরু করে পোশাক-পরিচ্ছদ, আসবাবপত্র সবই।

গ্রাম সম্পর্কে বিশেষ তথ্য জানার জন্য বলুহাটি গ্রামের বাসিন্দা এবং হাওড়া জেলা পরিষদের সভাপতি দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে গিয়ে ফিরে আসতে হল, তিনি অন্যত্র ব্যস্ত ছিলেন। ফেরার পথে চোখে পড়ল একটা মন্দির। মোটা করে লেখা 'ভুবনেশ্বরী মন্দির'। মন্দিরের প্রাঙ্গণেই দেখা গৃহবধূ শঙ্করী পালের সঙ্গে। শঙ্করীদেবী ছোট থেকে এ গ্রামেই মানুষ। কথা প্রসঙ্গে তিনি জানালেন, 'ভাই এই মায়ের মন্দির পাঁচশো বছরের পুরনো। এর ইতিহাস কেউ জানেন না। মায়ের বাবা, তাঁর বাবা, এবং তাঁদের বাবারাও বলেছেন যে, এ নাকি ভগবানের লীলা খেলা। কবে উৎপত্তি কেউ জানেন না। সবই ইতিহাস, ভগবানের খেলা। আমি তো মায়ের কাছে গল্প শুনে মাঝে মাঝে চমকে উঠি আর বিস্ময়ে ভাবি কী করে এই মন্দির তৈরি হল! তবে শোন এটা আগে জরাজীর্ণ ছিল, এখন সকলের উদ্যোগে পাকা করা হয়েছে। প্রতিদিন পুজো হয়। বলি পর্যন্ত হয়। সারা ভারতবর্ষের দু'জায়গায় ভুবনেশ্বরী মন্দির আছে। একটি ভুবনেশ্বরে, অপরটি এই গ্রামে।' মন্দির থেকে বেরিয়ে আসবার সময় মনোরমা মন্ডলের সঙ্গে দেখা হল। গলায় আঁচল দিয়ে মন্দিরে পুজো সেরে বাড়ি ফিরছিলেন। তিনি জানালেন: চৈত্র মাসে এখানে রক্ষাকালী পুজো হয়। রাত্রি বেলায় মূর্তি আনা হয় আর পুজোর পর সেই রাত্রেই প্রতিমা বিসর্জন দিয়ে দেওয়া হয়।

দোলের আগেরদিন থেকে শুরু করে

চারদিন অব্দি পুজোর ঘনঘটা থাকে। সেই সময় এই মেলা গ্রামকে রং, আলো আর আনন্দের বন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে যায়। নাটক, গান, আবৃত্তি প্রতিযোগিতা, সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রভৃতি হয়। রক্ষাকালী পুজো, ভুবনেশ্বরী পুজো ছাড়াও দুর্গা পুজো, কালী পুজো সর্বজনীন সহায়তায় হয়ে থাকে।

দশ হাজার গ্রামবাসীর জন্য মাত্র দুজন ডাক্তার। একজন শ্যামল ব্যানার্জি, অপরজন পরেশ ডাক্তার। শ্যামলবাবু বয়সে তরুণ অথচ সুচিকিৎসক। গ্রামবাসীরা তো তাই বলেন। অন্যদিকে পরেশ ডাক্তার সম্পর্কে অনেকের একটু ভ্রান্ত ধারণা আছে সেহেতু তিনি হাতুড়ে অ্যালোপাথ। কোন সরকারি প্রশংসাপত্র তাঁর নেই। তবে তিনি রোগ নিরাময়ে সাফল্য দেখিয়েছেন অনেক।

প্রসূতি মহিলাদের বিশেষ অসুবিধেয় পড়তে হয় হাসপাতাল না থাকার জন্য। সংকটাপন্ন রোগীদের নিয়ে যাবার মত ভাল রাস্তা নেই। জরুরি চিকিৎসার অভাবে অনেক রোগী মারা গেছেন বলে গ্রামবাসীদের অভিযোগ। নিরুপায় হয়ে রোগীদের কোনা হাসপাতাল অথবা হাওড়া জেলা হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়। ডোমজুড়ে একটি নার্সিং হোম আছে। পয়সার অভাবে সকলে সেখানে যেতে পারেন না। গ্রামের নানান জায়গায় ঘুরে সকলের কাছে থেকে একই ক্ষোভ শুনতে পাওয়া গেল হাসপাতালের ব্যাপারে। তবে গ্রামবাসীরা এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সিকে নাকি জানিয়েছেন বলে শোনা গেল।

বর্তমানে অবশ্য একটি হাসপাতাল তৈরি হয়েছে, বেশ সুন্দর। জায়গাটাও প্রশস্ত। চার ধারে ফুল গাছ। রঙিন। গোলাপ থেকে নানা প্রকার বাহারি গাছের মেলা। স্বাস্থ্যপ্রদ আবহাওয়া। হাসপাতালটির নাম বলুহাটি রুরাল ডেভলপমেন্ট চ্যারিটেবল ট্রাস্ট। কলকাতার এক অবাঙালি প্রতিষ্ঠান (গুজরাটি রিলিফ সোসাইটি) এটি পরিচালনা করে। এটি মূলত চক্ষুরোগের হাসপাতাল। ডাক্তার সপ্তাহে আসেন একদিন। প্রখ্যাত চক্ষু-চিকিৎসক ডাঃ আই এস রায় প্রথম অপারেশন করেন। এ গ্রামেরই পূর্ববাসিন্দা ডাঃ সুশান্ত চক্রবর্তী এখানে অপারেশন করেছেন। এক টাকার বিনিময়ে কার্ড করতে হয়। বিশেষ প্রয়োজনে রোগীকে ভর্তি রাখারও সুব্যবস্থা আছে। কিন্তু সিমেন্টের মেঝেতে রোগীদের শুতে হয়।

মূলত চক্ষু হাসপাতাল হলেও এখানে নাক, কান, গলা, হৃৎপিন্ডের চিকিৎসাও হয়। পোলিও ভ্যাক্সিন, টি-অ্যানটিজেন দেওয়া হয়। স্ত্রী রোগ, মানসিক রোগ সহ সাধারণ চিকিৎসাও করা হয়। বিভিন্ন ধরনের অস্ত্রোপ্রচারও হয়ে থাকে।

হাসপাতালের নানা জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছিল। অবশেষে এক চায়ের দোকানে নিয়ে জলখাবার খেতে গিয়ে চমকে উঠতে হল। জলের গ্লাসে চুমুক দিতে গিয়ে দেখি, দোচালা দোকানের ভেতর জোনাকির মত টিপটিপ করে কী যেন জ্বলছে। কৌতূহল নিয়ে গোপনে জানতে পারলাম, এখানেও কলকাতা থেকে কিনে এনে হেরোইন বিক্রি হয়। সর্বনাশ! যুবশক্তির সর্বনাশের পথ এখানেও উন্মুক্ত! শুধু তাই নয়, ইঁট খোলার পাশে মাটির দেশি মদের দোকান আর দুজন মাতালের মাতলামি দেখে বিষণ্ণ মনে ফিরে আসি। □

অশোক সেন

সংসারের অভাব যাঁদের জলে নামিয়েছে

সূর্য যখন পাটে বসে, রাখাল যখন গরু নিয়ে রাস্তায় একরাশ ধুলো উড়িয়ে ঘরে ফেরে, ঠিক তখনই আধভেজা কাপড়, মাথায় খালুই ও ডানহাতে ছাঁকনি জাল নিয়ে একদল মহিলা পাড়ায় পাড়ায় 'মাছ লেবে গো মাছ' বলে হাঁক দিতে দিতে মাছ বিক্রি করতে থাকেন। এই চিত্র রোজই দেখা যাবে হুগলি জেলার সিকড়ে চাপতা প্রভৃতি গ্রামগুলিতে।

এই সমস্ত গ্রামের কয়েক শো অধিবাসীর নুন আনতে পান্তা ফুরনোর অবস্থা। দিনমজুরিতে সংসার চলেনা। তাই বাধ্য হয়েই বাড়ির মেয়েরা ছাঁকনি জাল হাতে গ্রামের খাল-বিল, নদী-নালায় মাছ ধরেন। একটি মাত্র ছাঁকনি জাল আর একটি খালুই এদের সম্বল। মাছ ধরে তা স্থানীয় বাজার কিংবা পাড়ায় পাড়ায় ফেরি করে বিক্রি করেন। এই মাছ বিক্রি করে যা পান তাদিয়েই চাল, ডাল কিনে আনেন। কিন্তু সমস্যা হয় গ্রীষ্মকালে যখন খাল বিলের জল শেষ হয়ে যায়, নদী-নালার জল মরে যায় তখন এঁদের অবস্থা চরমে ওঠে। তখন মাছ পাওয়া যায় না, দিন-মজুরির কাজও থাকেনা। ফলে অর্ধাহারে অনাহারে দিন কাটাতে হয় পরিবারের লোকেদের। আসলে বৃত্তিতে ওঁরা জেলে নন, তবু গ্রামের লোকের ঘরে ওঁরা মেছুনি বা জেলেনি নামেই পরিচিত।

এ ব্যাপারে কথা হচ্ছিল হুগলির বেলুন গ্রামের অণিমা ধাড়া, লক্ষ্মী সামন্ত, অর্চনা বর্মনের সঙ্গে। দুপুর গড়িয়ে তখন বিকেল হচ্ছে। কনকনে উত্তরে হাওয়া বইছে। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে ওঁরা মাথায় খালুই আর ছাঁকনি জাল নিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন। অণিমা দেবী জানালেন, 'বাড়ির কর্তা যা উপায় করেন তাতে করে সংসারের চারটি লোকের পেট ভরে না। তাই সকালে সংসারের রান্নাবাড়া, গরুর খাওয়ার ব্যবস্থা করে দুপুরে বেরিয়ে পড়ি। দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মাছ ধরে পরে পাড়ায় পাড়ায় বিক্রি করে আসি। তাতেই কোনক্রমে তেল নুনটা হয়ে যায়। তাছাড়া বুঝতেই তো পারছেন, এটা একেবারে পাড়াগাঁ, সবাই নগদ পয়সা দিয়ে অনেক সময় মাছ কিনতে পারেন না, তখন পয়সার বদলে দু-তিন পোয়া চালও দিয়ে দেন।'

একই চিত্র দেখলাম সিকড়ে চাপতা গ্রামেও। পথে দেখা হল পার্বতী মাঝির সঙ্গে। শ্রীমতী মাঝি মাছ ধরে ফিরছিলেন, পরিচয় দিতে বললেন, 'আমাদের কথা জেনে আর কী হবে। দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মাছ ধরি। সাতশো-আটশো গ্রাম থেকে এক-দেড় কেজি মাছ পাই। পুঁটি, পাবদা, ল্যাটা, চ্যাং ইত্যাদি ছোট মাছই বেশি পাই। রুই কাতলা খুব কমই পড়ে। বিকেলে পাড়ায় যাই। মাছ বিক্রি করে ৮-১০ টাকার বেশি হয় না। আবার সবদিন নগদে বিক্রিও হয় না। ধারেই বিক্রি করে দিতে হয়। কখনও বা বিনিময়ে কেউ চাল কিংবা কাঁচা আনাজও দেন।'

শুধু লক্ষ্মী, অণিমা কিংবা পার্বতী দেবীই নন। একই অবস্থা রাণী দলুই-এরও। রাণী দেবী বললেন, 'আমাদের গ্রামের খাল বিল, নদী নালাই একমাত্র ভরসা। গ্রীষ্মকালে যখন সবকিছু শুকিয়ে যায় তখন আমাদের অবস্থা চরমে ওঠে। কোন উপায় থাকে না। তাছাড়া একদিকে ঘরের কাজ অসুখ-বিসুখ এসবের জন্য মাসের বেশির ভাগ দিনই মাছ ধরতে যাওয়া যায় না। সর্দি-কাশি আমাদের নিত্য সঙ্গী, কিন্তু পয়সার অভাবে ডাক্তার দেখানো সম্ভব হয় না। এ বছর মাঠের কাজ যেমন নেই তেমনি গ্রামের খাল বিলগুলি সব শুকিয়ে যাওয়ায় মাছও পাওয়া যাচ্ছে না। এ গ্রাম সে গ্রাম ঘুরে কিছু মাছ মিললেও তা বিক্রি করে দিতে হয় পেটের দায়ে। বাড়ির ছোট ছোট ছেলেগুলো মাছ খেতে পায় না অনেকদিন।'

জিগ্যেস করলাম, 'আপনারা, সরকার থেকে ব্যবসা করার জন্য কোন ঋণ পাননি ?

উত্তরে রাণী দেবী জানান, 'না, আমাদের মাছের ব্যবসার জন্য কোন ঋণ আমরা পাইনি, আসলে এটাকে ঠিক মাছ ব্যবসা বললে ভুল হবে। তবে চাষাবাদের জন্য পঞ্চায়েত থেকে ঋণ দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু আমাদের তো জমি জায়গা নেই। তাই আমরা কৃষি ঋণও পাইনা। তবে অনেকে আই আর ডি পি-র মাধ্যমে ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য ঋণ অবশ্য পেয়েছেন'।

এ ব্যাপারে পঞ্চায়েত সমিতিগুলির সঙ্গে কথা বললে, তাঁরা জানান, এই সমস্ত ক্ষুদে মৎস্য ব্যবসায়ীদের জন্য আমরা এই মুহূর্তে কিছু করতে পারিনি। দিন আনা দিন খাওয়া মানুষের উন্নতিকল্পে, রাস্তা ঘাট উন্নয়নের জন্য যে শ্রমের প্রয়োজন হয় সে ব্যাপারে আমরা ওঁদের কাজে লাগিয়েছি।'

বললাম, 'হুগলি নদীমাতৃক দেশ। যদি মৎস্য বিভাগ ও আপনারা যৌথভাবে উদ্যোগ নিয়ে ঐ খালবিলগুলিকে আরও গভীরভাবে খনন করে জল ধরে রাখেন, এবং এই সমস্ত হা-ভাতে লোকগুলোকে ডিমপোনা ও আর্থিক সাহায্য দিয়ে মাছ চাষে অনুপ্রেণা জোগান তাহলে, সংসারের অভাবে যাঁরা জলে নেমেছেন, তাঁরা যেমন প্রকৃত আর্থিক-স্বনির্ভর হতে পারবেন, তেমনি ঐ সমস্ত খাল-বিলে ডিমপোনা বা মাছচাষ করলে রাজ্যের মৎস্য-সমস্যার ঘাটতির কিছুটা সুরাহা হবে।'

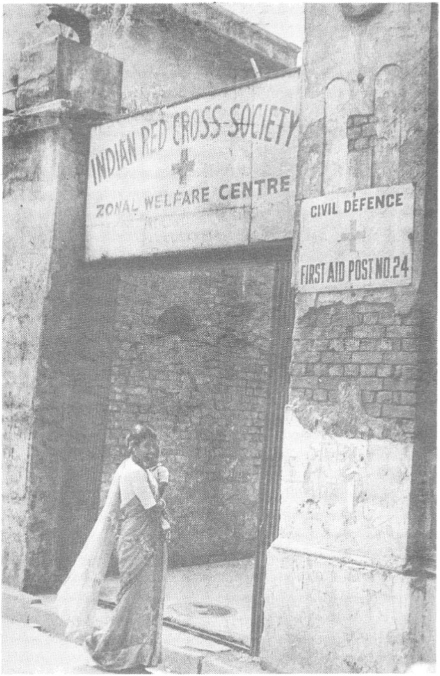
এ ব্যাপারে পঞ্চায়েত সমিতিগুলি জানালেন, 'আপনার মতামত সত্যিই যুক্তিসঙ্গত। নির্বাচনের পর আমরা এ বিষয়ে উদ্যোগ নেব।'

সরকার যদি সত্যিই এব্যাপারে উদ্যোগ নেয়, তাহলে হুগলি জেলার কয়েক হাজার গরিব মানুষ ফিরে পাবেন তাঁদের অর্থনৈতিক বনিয়াদ ও পায়ের তলার মাটি। □

শিবরাম চক্রবর্তী

রেড ক্রসে সেবা ও দুর্নীতির সহাবস্থান

রেড ক্রস। সাদা পটভূমিতে লাল ক্রস শোভিত আন্তর্জাতিক প্রতীক। এ প্রতীক আর্ত, পীড়িত ও দুঃস্থ মানুষের বেঁচে ওঠার সাহসী অবলম্বন। বিশ্বের সব দেশেই এর বিস্তৃতি। ১২৫ বছরের এই সংগঠনটি ধর্ম বর্ণভেদে সব মানুষের অত্যন্ত প্রিয়। পশ্চিমবঙ্গেও রয়েছে রেড ক্রসের বিশাল প্রশাখা। প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও রাজনৈতিক ঝঞ্ঝায় পীড়িত মানুষের সেবায় পশ্চিমবঙ্গ রেড ক্রসের রয়েছে মহান ঐতিহ্য। এই ঐতিহ্য নিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা গর্বিত হতেই পারেন। তবে এর পাশাপাশি রয়েছে অনিয়ম ও অর্থ নয়-ছয়ের দুর্ভাগ্যজনক ইতিহাস। পরিবর্তন নিউজ ব্যুরো রেড ক্রসের সেই অপ্রত্যাশিত 'কালো দাগ'-এর সন্ধান পেয়েছে। সঙ্গে কিছু প্রামাণিক নথি। তাই নিয়ে এই প্রতিবেদন।



১৯৭১ সাল। বাংলাদেশে শুরু হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ। লক্ষ লক্ষ বাংলাদেশি ইয়াহিয়ার খান সেনাদের অত্যাচারে টিকতে না পেরে আশ্রয় নিচ্ছেন ভারতে। প্রতিদিন হাজার হাজার শরণার্থীকে জায়গা করে দিতে হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ, মেঘালয় ও ত্রিপুরার নানা শিবিরে। শুধু শিবিরে ঠাঁই দিলেই হবে না। তাদের চাই খাবার, পোশাক। চাই শীতের অবলম্বন কম্বল। বিশ্বের অন্যতম মর্মান্তিক এই মানবিক বিপর্যয়ে আন্তর্জাতিক রেড ক্রস তার পূর্ব ঐতিহ্য বহাল রেখে শরণার্থীদের ত্রাণের জন্য সাহায্যের হাত বাড়ায়। সংস্থার এশিয়া জোনের এক পদস্থ অফিসার কলকাতায় আসেন 'ত্রাণের অধিকর্তা'

হিসেবে। শুরু হয় শরণার্থীদের মধ্যে খাদ্য, বস্ত্র, ওষুধসহ নানা ত্রাণসামগ্রীর দ্রুত বন্টন।

ওই সময় শরণার্থীদের মধ্যে কম্বল বন্টনের জন্য রেড ক্রস কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নেন। ঠিক হয় কম্বল কলকাতা বাজার থেকে কেনা হবে। কম্বল কেনা ও বন্টন দু-ই সম্পন্ন হয়। কিন্তু এই 'কেনা' নিয়ে নানা অভিযোগের সদুত্তর কর্তৃপক্ষ দিতে পারেননি। রাজভবন (পূর্ব) চত্বরে রেড ক্রসের অস্থায়ী অফিসে আয়োজিত এক সাংবাদিক বৈঠকে সংস্থার তৎকালীন অধিকর্তা সদুত্তর দিতে না পারায় অস্বস্তিতে পড়েছিলেন। উপস্থিত সাংবাদিকরা জানতে চেয়েছিলেন, কলকাতার বাজার থেকে যে সংখ্যক কম্বল কেনা হয়েছে তার কতটা সিঙ্গল, কতটা ডাবল। পশমি বা সুতির সংখ্যাই বা কত? সাংবাদিকদের জেরার মুখে ত্রাণ অধিকর্তা জানান, সিংগল-ডাবল, পশমি-সুতি সবরকম কম্বলই আছে। তবে কোনটার সংখ্যা কত তা বলা সম্ভব নয়।

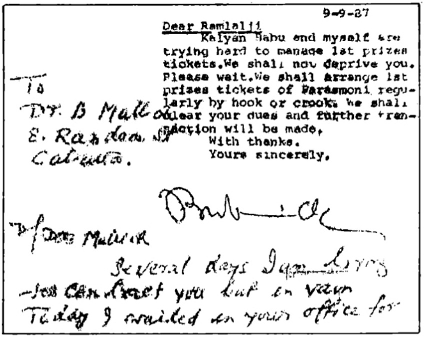
রেড ক্রসের লাল প্রতীকে 'কালো দাগের' অশুভ উপস্থিতির এটা একটা নমুনা। সিংগল সুতির কম্বলের সংগে পশমের ডাবল কম্বলের দামের তফাৎ প্রায় ২০ গুণের। সরবরাহকারী ও গুদাম রক্ষকের মধ্যে বন্দোবস্ত থাকলে যেকোন ধরনের হেরফের অতি সহজেই সম্পন্ন করা যায়। বাংলাদেশের শরণার্থীদের ত্রাণের জন্য ওই সময় বিদেশ থেকে কোটি কোটি টাকার ত্রাণ সামগ্রী এদেশে এসেছে। মালদার জাতীয় সড়কে ৫/৭টি কম্বল বোঝাই ট্রাক ওইসময় উধাও হয়ে যাবার মত ঘটনাও ঘটেছে। ঘটেছে ত্রাণ সামগ্রী বন্টন নিয়ে হরেক অনিয়ম।

আর্তত্রাণের প্রাণপুরুষ হেনরি ডুন ১৮৬৩ সালে আন্তর্জাতিক রেড ক্রস প্রতিষ্ঠা করেন। অবিভক্ত বাংলায় ১৯২১-এ রেড ক্রস স্থাপিত হয়। সেই থেকে দৈব-দুর্বিপাক ও যুদ্ধ-ঝঞ্ঝার দিনে আর্ত মানুষের সেবায় রেড ক্রস অপরিহার্য এক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। রেড ক্রস একটি প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠান চালান রক্তে মাংসে গড়া একদল মানুষ। তাঁরা নির্লোভ সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী নন। আর্ত মানুষের সেবা তাঁদের নেশা না পেশা, সে প্রশ্ন ভিন্ন। তবে সেবাকার্য পরিচালনায় অনিয়ম ও ত্রুটির যেসব অভিযোগ ওঠে, তার দায় থেকে তাঁরা মুক্তি পান না। অভিযোগের খড়্গ স্বাভাবিক নিয়মেই তাঁদের কাঁধে এসে আছড়ে পড়ে।

লটারি কার স্বার্থে?

রেড ক্রস তহবিল সংগ্রহের জন্য 'লাকি ব্যাগ' লটারি চালু করে পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি। তারপরে এর নাম হয় 'রেড ক্রস হসপিটাল সুইপ'। দেশ জুড়ে নানা রাজ্য লটারির লোভনীয় পুরস্কারের দাপটে হসপিটাল সুইপ লটারি বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৮৫





9-9-87

Dear Ramlalji

Kalyan Babu and myself are trying hard to manage 1st prizes tickets. We shall not deprive you. Please wait. We shall arrange 1st prizes tickets of Parasmoni regularly by hook or crook. We shall clear your dues and further transaction will be made.

With thanks.

Yours sincerely.

To
Dr. B Mallick
E. Ra[illegible] St
Calcutta.

D/ Dr Mallick
Several days I [illegible]
you can meet you but in vain
Today I awaited in your office for

পুরস্কারের অর্থ নিয়ে যে নয়ছয় চলছে তার প্রমাণ সম্বলিত একটি চিঠি

সালে আবার চালু হয় লটারি। পাক্ষিক ওই লটারির নাম ছিল 'বংগ কল্যাণ'। বর্তমানে এর অস্তিত্ব নেই। এখন রেড ক্রস পরিচালিত সাপ্তাহিক লটারির নাম 'পরশমণি'।

'বংগ কল্যাণ' লটারি যখন চালু হয় তখন তার এজেন্ট ও সংগঠক হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয় জে দত্ত. কোম্পানিকে। হাই কোর্টের বিচারপতি চন্দনকুমার ব্যানার্জির নেতৃত্বে গঠিত কমিটি মেসার্স জে দত্তকে ওই নিযুক্তি দেন। এই লটারি পরিচালনার জন্য রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দপ্তর থেকে অনুমতি নেওয়া হয়। 'বংগ কল্যাণ' লটারি কিছুদিন চালাবার পর মেসার্স জে দত্ত সরে দাঁড়ান। এরপর 'পরশমণি' সাপ্তাহিক লটারির প্রবর্তন করা হয় এবং তার সংগঠনের দায়িত্ব পায় এস এস কোম্পানি। পশ্চিমবংগ রেড ক্রসের বার বার লটারির নাম ও এজেন্ট পরিবর্তনের পেছনে যে কোন রহস্য নেই তা বলা মুশকিল। তবে এই লটারির পুরস্কারের টাকা নিয়ে যে সব কান্ড হচ্ছে, তা পুরোটা প্রকাশিত হলে জনমনে রেড ক্রস সম্পর্কে শ্রদ্ধার ধারণাটাই বদলে যাবে।

রেড ক্রসকে লটারি পরিচালনার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল যাতে জনসেবার প্রয়োজনে তার তহবিল গড়ে ওঠে। অর্থাৎ লটারির লভ্যাংশের টাকা তার তহবিলে জমা পড়ে। মেসার্স জে দত্তের সংগে যে চুক্তি করা হয়েছিল তাতে উল্লেখ ছিল বিক্রিত টিকিটের ১৫ শতাংশ মূল্য রেড ক্রস পাবে। এছাড়া প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কারের টাকা রেড ক্রসের কাছে অগ্রিম জমা দেবে এজেন্ট। বিজ্ঞাপন তথা প্রচারের খরচও এজেন্ট জোগাবে।

পরশমণি লটারির জন্য নতুন যে চুক্তি করা হয়েছে তাতে ওই ১৫ শতাংশ থেকেই বিজ্ঞাপন ও টিকিট ছাপা খরচ এবং প্রথম ও দ্বিতীয় পুরস্কারের টাকা মেটাতে হচ্ছে। ফলে রেড ক্রসের তহবিলে উল্লেখযোগ্য কোন অঙ্ক জমা পড়ছে না। পশ্চিমবংগ রেড ক্রসের

বর্তমান সাধারণ সম্পাদক কল্যাণকুমার রায় জানিয়েছেন, পরশমণির এজেন্ট এস এস কোম্পানি প্রতি ড্র-এর জন্য রেড ক্রসকে ৩ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা দেয়। এ টাকা থেকে টিকিট ছাপা, বিজ্ঞাপন এবং প্রথম ও দ্বিতীয় পুরস্কারের টাকা মিটিয়ে রেড ক্রসের তহবিলে হাজার পঞ্চাশ টাকা থাকে।

পরশমণি লটারির প্রথম ও দ্বিতীয় পুরস্কার প্রাপকদের প্রাপ্য টাকা দেওয়া নিয়েও নানা অভিযোগ উঠেছে। স্বয়ং কল্যাণবাবুই স্বীকার করেছেন, বহু ক্ষেত্রে একই পুরস্কারের জন্য একাধিক দাবিদার এসে হাজির হচ্ছেন। এর দায়িত্ব কার ? রেড ক্রসের না এস এস কোম্পানির ?

৪৬তম 'ড্র'-এর প্রথম পুরস্কারের দাবিদার মেদিনীপুর চন্দ্রকোণা রোডের শ্রীমতী ছায়া পাল আজও পুরস্কারের টাকা পাননি। তাঁকে বলা হয়েছে ওই পুরস্কারের অন্য দাবিদার আছে। শ্রীমতী পাল তাঁর টিকিট ইউনাইটেড ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার সাত বাঁকুড়া ব্রাঞ্চে জমা দিয়েছেন। ব্যাংকের ম্যানেজার টিকিটের পুরস্কারের মূল্যের জন্য রেড ক্রসের সাধারণ সম্পাদককে অফিসিয়াল চিঠিও দিয়েছিলেন।

ছায়া পালের এই ঘটনাটি রেড ক্রস পরিচালিত লটারির অভ্যন্তরীণ চেহারা বোঝাতে যথেষ্ট নয়। এরকম ডজন ডজন ছায়া পালকে পুরস্কারের অর্থ থেকে বঞ্চিত হতে হচ্ছে প্রতিনিয়ত।

পুরস্কারের অর্থ নিয়ে যে নয়ছয় চলছে তার প্রমাণ সম্বলিত একটি চিঠির ফটো আমাদের হাতে এসেছে। এতে দেখা যাচ্ছে রেড ক্রসের অন্যতম কর্মকর্তা এবং লটারি সাব কমিটির সদস্য ডাঃ বিরল মল্লিককে জনৈক রামলালজী প্রথম পুরস্কারের টিকিট জোগাড় করতে বলেছেন। তিনি বিরলবাবুকে যে প্রচুর টাকা দিয়েছেন সে কথাও চিঠিতে উল্লেখ রয়েছে।

বিরলবাবু রামলালজীকে লিখিতভাবে জানিয়েছেন, সম্পাদক কল্যাণ রায় এবং তিনি নিজে প্রথম পুরস্কারের টিকিট জোগাড়ের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছেন। চিঠিতে রামলালজীকে অনুগ্রহ করে ধৈর্য ধরতে বলেছেন।

অভিযোগে প্রকাশ পরশমণি লটারির ড্র হয়ে যাবার পর মাঝেমধ্যেই প্রথম পুরস্কারের টিকিট 'অবিক্রিত' দেখিয়ে পুরস্কারের টাকা এজেন্টকে দিয়ে দেওয়া হয়। পরে যদি ওই নম্বরের কোন দাবিদার আসেন, তা হলে তাকে ভদ্রভাষায় করা হয় বঞ্চিত। পরশমণি টিকিটের পেছনে আট নম্বর শর্তে স্পষ্ট লেখা আছে, যে কোন বিরোধে রেড ক্রসের ম্যানেজিং বডির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। সুতরাং শ্রীমতী ছায়া পালদের চিরকাল টিকিট কেটেই যেতে হবে। পুরস্কারের টাকা পাওয়া যাবে না।

পুরস্কারের টাকা পাননি ডি এল শা-ও। ১৯৮৬-র ২ নভেম্বর অনুষ্ঠিত বাম্পার ড্র-তে তিনি ১ লক্ষ টাকার দ্বিতীয় পুরস্কার পেয়েছিলেন। টাকা আজও হাতে পাননি। বার বার চিঠি দিয়েছেন। সাধারণ সম্পাদকের সংগে দেখাও করেছেন। কাজ কিছু হয়নি।

অনেক রাজ্য লটারিতেই পুরস্কারপ্রাপ্ত লটারির একই নম্বরের একাধিক দাবিদার এসে হাজির হন। এ ঘটনা জাল টিকিটের অস্তিত্বকেই প্রমাণ করে। পরশমণি লটারি আর পাঁচটি লটারি থেকে স্বতন্ত্র এই কারণে যে, এর পরিচালক রেড ক্রসের মত একটি আন্তর্জাতিক সেবা প্রতিষ্ঠানের পশ্চিমবংগ শাখা। এখানে জাল টিকিটের অস্তিত্ব থাকা দুর্ভাগ্যজনক।

বাকিটাকার পরিমাণ কত ?

লটারি এজেন্টের কাছে রেড ক্রস কত টাকা পাবে এবং পুরস্কার প্রাপকরাই বা রেড ক্রসের কাছে কত টাকা পাবে তার কোন হিসাব রেড ক্রস সম্পাদক দিতে পারেন নি। তবে ১৯৮৬-র আয়ব্যয়ের অননুমোদিত হিসাবে দেখা যায় এজেন্টের কাছে পাওনা রয়েছে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা এবং পুরস্কার প্রাপকরা পাবে ৭ লক্ষ টাকার বেশি। ওয়াকিবহাল মহলের মতে ১৯৮৭ সালের শেষে এজেন্টের কাছে পাওনা হয়েছে প্রায় এক কোটি টাকা। পুরস্কার প্রাপকরা কত পাবেন তা বলা না গেলেও প্রতিদিন একাধিক ব্যক্তি রেড ক্রস অফিসে এসে তাগাদা দেন, ঘুরে যান।

প্রাক্তন এজেন্ট বিচারপ্রার্থী

মাত্র ছ'মাস রেড ক্রসের হয়ে বংগকল্যাণ লটারি পরিচালনা করেই জে দত্ত অ্যান্ড কোম্পানিকে বিদায় নিতে হয়েছে। কোম্পানির মালিক জয়দেব দত্ত অবশ্য নিজেই রেড ক্রসের সংগে কারবার বন্ধ কতে চেয়েছিলেন। আর তাকে হারাতে হয়েছে ইউনাইটেড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাংকে গচ্ছিত ৫,৪১৯৫০ টাকা। এজন্য তিনি কলকাতা হাইকোর্টে একটি মামলা দায়ের করেন। ১৯৮৬-র ৭ এপ্রিল। বিচারপতির কাছে হলফনামায় তিনি বলেছেন, সরকারি অনুমতি (৭-৬-৮৫) অনুসারে ২৭ জুন ১৯৮৫ রেড ক্রসের সংগে বংগকল্যাণ লটারির একমাত্র এজেন্ট হবার চুক্তি করেন। চুক্তি ছ'মাস অর্থাৎ ১২টি লটারি অনুষ্ঠান পর্যন্ত কার্যকর থাকবার কথা। শর্ত ছিল এক টাকা দামের প্রায় ১১ লক্ষ টিকিট রেড ক্রস ছাপিয়ে দেবে। তার জন্য রেড ক্রসকে জনকল্যাণে, বিজ্ঞাপন ও প্রথম তিনটি পুরস্কার বাবদ দু' দফায় ৩ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা দিতে হবে। রেড ক্রস কর্তৃপক্ষ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের ৮টি দৈনিক পত্রিকায় প্রতি পনের দিনে দু বার বিজ্ঞাপন দেবে। কিন্তু ১০টি ড্র-এর (পাঁচ মাস) পর কোম্পানি লক্ষ্য করে রেড ক্রস চুক্তিমত বিভিন্ন পত্রিকায়

রেডক্রস সম্পাদকের মতে....

পশ্চিমবংগ রেডক্রসের বর্তমান সাধারণ সম্পাদক কল্যাণকুমার রায় অন্যতম পুরনো কর্মী। সহ-সম্পাদক ও জনসংযোগের দায়িত্ব পালন করার মধ্য দিয়ে তিনি যথেষ্ট অভিজ্ঞতাও সঞ্চয় করেছেন। রেডক্রসের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে তাঁর মতামত অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, রাজ্য রেডক্রসে বার্ষিক সদস্য আছেন ৭ হাজার এবং আজীবন সদস্য সংখ্যা প্রায় ১০ হাজার। এখন বার্ষিক চাঁদা ১৫ টাকা এবং আজীবন সদস্যপদের চাঁদা এককালীন ২৫০ টাকা। সংস্থার বর্তমান কাজকর্মের বিবরণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন, ১৯৮২-র পরবর্তী কালে অর্থাভাবে কাজকর্ম প্রায় অচল হয়ে গিয়েছিল। ওই সময় রাজ্যসরকারের সুপারিশমত তখনকার রাজ্যপাল ডাঃ ননী গুহকে চেয়ারম্যান মনোনীত করেন। তার পরে কাজকর্ম স্বাভাবিক করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। ১৯৭৮-র ১ আগস্ট বেশ কয়েক বছর পর বার্ষিক সাধারণ সভাও অনুষ্ঠিত হয়েছে। আর এখনও ডাঃ গুহই চেয়ারম্যান আছেন।

তিনি বলেন, রাজ্যের ৭টি জেলার চিকিৎসা সুযোগ বঞ্চিত ৭টি অঞ্চলে রেডক্রসের ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা কেন্দ্র কাজ করছে। সেখানকার ডাক্তার কর্মী ও চিকিৎসাবাবদ ব্যয় রেডক্রস বহন করে। এছাড়া বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর ও জলপাইগুড়িতে ৪টি রেডক্রস গুদাম রয়েছে। এগুলিতে প্রয়োজনীয় ত্রাণ সামগ্রী মজুদ রাখা হয়।

কলকাতার কাজের বিবরণ দিতে গিয়ে শ্রীরায় বলেন, ৬টি কেন্দ্র থেকে মাতৃসদন, শিশু কল্যাণ ও পরিবার পরিকল্পনার কাজ পরিচালিত হয়। লেডি ডাক্তার ক্লিনিক্যাল এ্যাসিস্ট্যান্ট, এক্সটেনশন অফিসার, লেডি হেল্থ ভিজিটর, ওষুধপত্র সব কিছুর ব্যয়ই রেডক্রস বহন করে। প্রতিদিন, প্রতিকেন্দ্রে গড়ে ১০০ শিশুকে দুধ-রুটি দেওয়া হয়। কেন্দ্রগুলিতে টীকা দেবার ব্যবস্থাও আছে।

তিনি বলেন, রেডক্রস মাস উদ্‌যাপন, 'রেডক্রস বল'। 'ফ্ল্যাগ ডে', 'বেবি শো', 'কার ডিস্ক' প্রভৃতি অর্থসংগ্রহকারী ব্যবস্থা কয়েক বছর বন্ধ ছিল। ক্রমে সেগুলি চালু হচ্ছে। এবছর বিশ্ব রেডক্রস দিবস (মে মাসে) থেকে আবার সদস্য সংগ্রহ অভিযানও শুরু করা হবে বলে তিনি জানান। ১৯৮৬-৮৭-তে উন্নত চিকিৎসার সুযোগ দেবার জন্য ৬ জনকে ৪০ হাজার টাকা অর্থ সাহায্য করা হয়েছে বলে তিনি জানান। ক্যান্সার হাসপাতালে ১০টি শয্যার ব্যয় ভারও রেডক্রস বহন করে থাকে। □

নিজস্ব প্রতিনিধি

বিভিন্ন কেন্দ্রের হাল

রেডক্রস পরিচালিত চিকিৎসা কেন্দ্রগুলি কেমন চলছে তা দেখার জন্য গিয়েছিলাম গোকুল বড়াল স্ট্রিটে জোনাল সেন্টারে। আগে এই কেন্দ্রটি ছিল দক্ষিণ কলকাতার হরিশ মুখার্জি রোডে। সেন্টারের বর্তমান বাড়িটির ঢোকার মুখেই রেডক্রসের যে সাইবোর্ড রয়েছে তা এতই জরাজীর্ণ দেখলে বোঝা যাবে না এখানে কোন চিকিৎসা বা জনকল্যাণমূলক কাজ হয়ে থাকে। বাড়ির মধ্যের অবস্থা দেখলে মনে হবে ষোড়শ বা সপ্তদশ শতাব্দীর কোন এক ঐতিহাসিক ভবনে এসে দাঁড়িয়েছি। ওই কেন্দ্রের একজন কর্মী বললেন, 'কদিন আগে এলে দেখতে পেতেন আসল অবস্থাটা। যে কোন সময় ভেঙে পড়তে পারত। অনেক বলা কওয়ার পর খাপছাড়া গোছের কিছু মেরামত করা হয়েছে।'

গোকুল বড়াল স্ট্রিটের এই কেন্দ্রে প্রসূতি পরিচর্যা জনকল্যাণ এবং পরিবার পরিকল্পনার কাজ হয়ে থাকে। এছাড়া এখানে একটি স্কুলও চালানো হয়। এছাড়া সেলাই শেখানোরও ব্যবস্থা রয়েছে এখানে, যে সকল শিশু এখানে পড়তে আসে তাদের দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পড়ানো হয়। ছাত্রদের বিনা পয়সায় বই এবং কিছু টিফিনও দেওয়া হয়। কল্যাণ কেন্দ্রের প্রধান শ্রীমতী তৃপ্তি দাস বলেন, 'যেহেতু আশেপাশে অনেক ভাল স্কুল হয়ে গেছে, তাই এখানে আর বেশি ছাত্র আসে না।'

শুধুমাত্র যে ছাত্ররা আসছে না, তাই নয় এই কেন্দ্রের পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের অনেকেও কাজ ছেড়ে চলে গেছেন। এর কারণ বলতে গিয়ে জনৈকা কর্মী জানালেন, ১৯৬৫ সালে রেডক্রসের এই পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ খোলা হয়। কথা ছিল রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্যবিভাগ-এর দায়িত্ব নেওয়ার পরেও প্রথম ছয় মাস রেডক্রস বেতন দেবে। কিন্তু ওরা কথা রাখলেন না। বেতন চাইলেই সরকারকে দেখিয়ে দেয়। অথচ মজার ব্যাপার দেখুন সরকার থেকে টাকা আসছে রেডক্রসের হেড অফিসে। ওরা আমাদের ঘোরায়। গেলেই বলে টাকা আসেনি, চেক ভাঙানো হয়নি আরও কত কি! একবার এক অফিসার এল এম ও-র লেডি মেডিক্যাল টাকা তুলতে যেতে দেরি হওয়ায় তাকে বলা হয়, তার টাকা বন্যাত্রাণে খরচা হয়ে গেছে। তিনি জানালেন, এখনও তাঁদের তিনমাসের বেতন বাকি। কবে পাবেন জানেন না। অথচ তাঁদের নব কাজই করতে হচ্ছে। এমনকি ২৩ ফেব্রুয়ারির 'শিশু প্রদর্শনী'-তেও কর্মীদের পেটে ভাত না থাকলেও মুখে হাসি ফুটিয়ে কাজ করতে হয়েছে।

'চেয়ারম্যান আসেন কিনা' – এই প্রশ্ন করতেই একজন বললেন, সাত-আট বছর হল উনি এই পদে আছেন কিন্তু একদিনও ওনার মুখ দেখিনি। এমন কি হেড অফিসে গিয়ে ওনার সংগে দেখা করতে চাইলে ওঁরা কিছুতেই রাজি হন না। নানা ছুতোয় আমাদের ফিরিয়ে দেয়। তবে একটা জিনিস আছে। তা হল আমাদেরও একজন ডেপুটি সেক্রেটারি আছেন তিনি নিয়মিত এসে 'লেট মার্ক', 'অ্যাবসেন্ট' লিখে দিয়ে যাচ্ছেন। অথচ মাইনের কথা জিজ্ঞেস করলে তিনি ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন।



গোকুল বড়াল স্ট্রিটে জোনাল সেন্টার

বরানগর হাসপাতাল

কলকাতার অদূরে বরানগরে রেডক্রসের একটি মাতৃ ও শিশুকল্যাণ কেন্দ্র আছে। ১৯৮৬-র হিসাবে দেখা যায় – ওখানে ওষুধপত্রে কোন খরচ হয়নি। অর্থাৎ হাসপাতালটি অচল তবে কর্মী আছেন, আছেন ডাক্তার ইত্যাদি। এ বাবদে খরচ হয়েছে ৪১,৫৮৬ টাকা। হাসপাতাল সচল আজও হয়নি। স্বয়ং স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে দিয়ে গত বছর আগস্টে নতুন ভবনের উদ্বোধন হয়েছে। কিন্তু, অবস্থার পরিবর্তন হয়নি।

ডাফ স্ট্রিটে রেডক্রসের একটি মাতৃ ও শিশুকল্যাণ কেন্দ্র আছে। সেখানে দৈনিক ২00 শিশুকে দুধ-রুটি দেওয়ার কথা। জানা গেছে দুধ রুটির বদলে সেখানে খিচুরি দেওয়া হয় অল্প সংখ্যক শিশুকে। কর্মীরাও মধ্যাহ্ন আহার তাতেই সারেন।

এরপর আসা যাক রেড রোড শরৎ বসু কেন্দ্রের কথা। এখানে অবশ্য রেডক্রস সোসাইটির অন্যতম সদস্যা শ্রীমতী ভবানী গুপ্ত রায় বলেন, আমাদের এই কেন্দ্র ভালই চলছে। তবে জনগণের আরও সাহায্য দরকার।

এই কেন্দ্রে অন্যান্য কাজের সংগে নিউট্রিশন প্রোগ্রামও রয়েছে। এই প্রোগ্রাম অনুযায়ী প্রায় দুশো শিশুকে রোজ চার পিস করে রুটি দেওয়া হয় বলে এই কেন্দ্রের এল এম ও ডাঃ নূপুর চক্রবর্তী জানান।

কেন্দ্র থেকে বেরিয়ে আসছি তখন একজন বললেন, কি বলব, আগে শিশুদের দুধ দেওয়া হত এখন তাও দেয় না। প্রায় তিন বছর হল বন্ধ করে দিয়েছে। রেডক্রস-র কর্মকর্তারা দেখেও দেখছেন না। অথচ শিশুদের পুষ্টি সম্পর্কে সবাই গালভরা কথা বলেন। □

নিজস্ব প্রতিনিধি

বিজ্ঞাপন দিচ্ছে না। এছাড়া সময় মত টিকিটও ছাপিয়ে দিচ্ছে না। ফলে বংগকল্যাণ লটারিতে লোকসান বাড়তে থাকে। কোম্পানি অবিক্রিত টিকিটের জন্য জমা টাকা এবং অন্যান্য পাওনা থেকে হিসাব মিটিয়ে নিতে রেড ক্রসকে অনুরোধ করে। কিন্তু রেড ক্রস গচ্ছিত টাকা 'আত্মসাৎ' করেছে এই অভিযোগ তুলে মামলা করা হয়েছে আদালতে। সেই সংগে একথাও বলা হয়েছে, সরকারি অনুমতির শর্ত ভেঙে নতুন সংস্থাকে নতুন পরশমণি লটারির একমাত্র এজেন্ট নিয়োগ করা হয়েছে।

সরকারি নির্দেশের বয়ান

১৯৮৫-র ৭জুন পশ্চিমবংগ সরকারের স্বরাষ্ট্র (পুলিশ) দপ্তরের সহকারী সচিব জে সি দাস রেড ক্রসের 'অবৈতনিক' সাধারণ সম্পাদককে ৪৫৫৫ – পি এল/পি ই/৬-এল–৩/৮৪ নং চিঠিতে লটারি অনুষ্ঠানের অনুমতি দেন। চিঠিতে নির্দিষ্ট শর্তগুলি হল – টিকিট বিক্রির অন্তত ৪৫ শতাংশ পুরস্কার দিতে হবে। কমিশন ইত্যাদির জন্য ৪০ শতাংশের বেশি ব্যয় করা যাবে না। জনকল্যাণমূলক কাজে ১৫ শতাংশ ব্যয় করতে হবে।

জে দত্ত কোম্পানির অভিযোগ এই শর্ত অমান্য করে পুরস্কারের পরিমাণ ৩৪.৫ শতাংশ নামিয়ে আনা হয়েছে। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন জনসাধারণ।



খাজনার চেয়ে বাজনা বেশি

১৯৮৫-র আয়-ব্যয়ের হিসাব ১৯৮৭-র সাধারণ সভায় গৃহীত হয়েছে। তাতে দেখা যায় ওই বছর ম্যাটারনিটি ও চাইল্ড ওয়েল ফেয়ার সেণ্টারগুলির কর্মীদের বেতন দিতে খরচ হয়েছে ১ লক্ষ ১৪ হাজার ৯৫৮ টাকা। তাদের পি এফ বাবদ আরও দেওয়া হয়েছে ৬,২০৫ টাকা। সেই সংগে ঘরভাড়া, গাড়িভাড়া, টেলিফোন, স্টেশনারি ও অন্যান্য খরচ আরও হাজার পঞ্চাশেক। সব মিলিয়ে খরচ প্রায় ২ লক্ষ টাকা। অন্যদিকে রোগীদের ওষুধ ও পুষ্টিকর খাদ্য বাবদে ব্যয় করা হয়েছে যথাক্রমে ৭ হাজার ৪১ ও ৪ হাজার ১৭৫ টাকা। ডায়মন্ডহারবার কেন্দ্রে ১৯০০ টাকার ওষুধপত্র ব্যবহার করে দুঃস্থদের সেবার নামে প্রশাসনিক ব্যয় দেখানো হয়েছে প্রায় এক লক্ষ টাকা।

হেড অফিস-কেন্দ্রিক মেডিকেল সার্ভিস ও ট্রান্সপোর্ট সার্ভিসের অবস্থা আরও জটিল। এখানে বেতন ভাতা মিলিয়ে কর্মীদের জন্য খরচ প্রায় ৫০ হাজার টাকা। জনগণের জন্য দাতব্য খাতে ব্যয় মাত্র এক হাজার টাকা। অন্যদিকে রেড ক্রসের কর্মীদের চিকিৎসা খাতে ব্যয় হয়েছে ২৩ হাজার ৭২৪ টাকা।

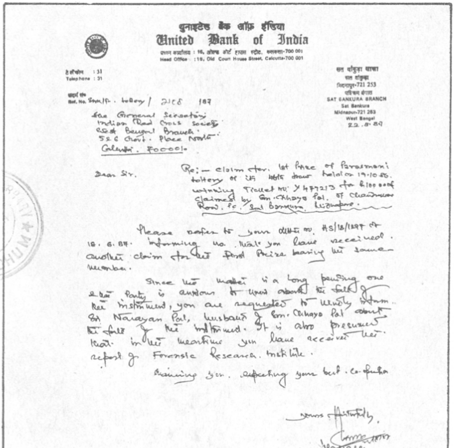
১৯৮৫-র হিসাবের খাতাতেই দেখা যাচ্ছে কয়েকজন রেড ক্রস থেকে আগাম টাকা তুলে নিয়ে হিসেব দেননি। তার পরিমাণও প্রায় এক লক্ষ টাকা। এঁদের মধ্যে আছেন কমলা মুখার্জি – ১১,৪০৪, অজিত মিত্র – ৮,২৪৬, সুকুমার দে – ১৬,৯২০, হরি সিং – ১০,৭৭১, শচীন চক্রবর্তী – ৭০০০, পি নায়ার – ১,১১০ টাকা।

ট্রেনিং-এর জন্য টাকা আদায়

রেড ক্রসের অন্যতম কাজ হল প্রাথমিক চিকিৎসা ও ধাত্রীবিদ্যা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া। ১৯৮৬ ও ১৯৮৭ সালে উত্তর ২৪ পরগনার বিভিন্ন বিদ্যালয়ে প্রাথমিক চিকিৎসার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। অভিযোগ, রেড ক্রসের প্রশিক্ষক সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয় থেকে অর্থ আদায় করেছেন। ১৯৮৬-তে বনগাঁ ও বাগদা থানার ২৯টি স্কুল থেকে আদায় করা হয়েছে ২১ হাজার টাকা। ১৯৮৭-তে ওখানকার আরও ৪টি স্কুল থেকে আদায় হয়েছে ৫ হাজার টাকা। গাড়াপোতা হাইস্কুলের ৯০ জনের কাছ থেকে আদায় করা হয়েছে ১০ টাকা করে। রামচন্দ্রপুর হাইস্কুলে ২৫ জনের কাছ থেকে মাথাপিছু ১৬ টাকা। ঠাকুরনগর হাইস্কুলে ৮০ জন দিয়েছে মাথাপিছু ২৪ টাকা। অথচ এই টাকা রাজ্য রেড ক্রস তহবিলে জমা পড়েনি।

দ্রব্য সামগ্রী বণ্টন প্রসংগ

রেড ক্রসের দ্রব্য সামগ্রী বিভিন্ন সেণ্টারের মাধ্যমে বিলি বণ্টন হয়ে থাকে। এই বিলি বণ্টন নিয়েও নানা অভিযোগ শোনা যায়। রেড ক্রসের অন্যতম কর্মকর্তা ডাঃ বিরল মল্লিকের শশীভূষণ দে স্ট্রিটে একটি বাবসায়িক পরিবার কল্যাণকেন্দ্র রয়েছে। ওই কেন্দ্রে রেড ক্রসের মালপত্র কেন সরবরাহ করা হয় তা নিয়ে নানা মহলে নানা সংগত জিজ্ঞাসা রয়েছে। ১৯৮৫ সালের ২৫৪৯৩ নম্বর চালানে দেখা যাচ্ছে, রেড ক্রস ওই বছর বিরলবাবুকে ১২০০ কেজি মাখন, ১৫০০ কেজি রেপসিড তেল ও ৪০০ কেজি বিস্কুট সরবরাহ করেছে। বিরলবাবু রেড ক্রস থেকে এরকম আরও অনেক সামগ্রী পেয়ে থাকেন দুস্থ 'মানবতার সেবার' নামে। এইসব সামগ্রী যথাস্থানে সুষ্ঠুভাবে বণ্টন হয় কিনা তা একমাত্র রেড ক্রস কর্তৃপক্ষই বলতে পারেন।



ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া
United Bank of India
প্রধান কার্যালয় : ১৬, ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রীট, কলকাতা-700 001
Head Office : 16, Old Court House Street, Calcutta-700 001

টেলিফোন : 31
Telephone : 31

Ref. No. Svn/P. lottery/ 2108 /87

সাত বাঁকুড়া শাখা
সাত বাঁকুড়া
মেদিনীপুর-721 253
পশ্চিম বাংলা
SAT BANKURA BRANCH
Sat Bankura
Midnapur-721 253
West Bengal
22.8.87

The General Secretary
Indian Red Cross Society
West Bengal Branch.
5 & 6 Govt. Place North.
Calcutta. 700001.

Dear Sir,

Re:— claim for 1st Prize of Parasmoni lottery of [illegible] draw held on 19.10.86. winning Ticket no. Y 477213 for Rs100000 claimed by Sm. Chhaya Pal. of [illegible] Road. P.O. Sat Bankura. Midnapore.

Please refer to your letter no. HS/18/1297 dt 18.6.87. informing us that you have received another claim for the First Prize having the same number.

Since the matter is a long pending one & the Party is anxious to know about the fate of the instrument, you are requested to kindly inform Sri Narayan Pal, husband of Sm. Chhaya Pal about the fate of the instrument. It is also presumed that in the meantime you have received the report of Forensic Research Institute.

Thanking you. expecting your best co-operation

Yours faithfully,
[illegible]
Manager.

"बैंक हिन्दी में भी पत्राचार का स्वागत करता है।"

ফটো : অচিন্ত্য রায়

হাওড়া রেডক্রসেরই সেবার প্রয়োজন

সারা বিশ্ব জুড়ে রেডক্রসের যে অগ্রগতি, তা বোধহয় হাওড়ায় এসে থমকে দাঁড়িয়েছে। অভাবী, দরিদ্র, সহায়-সম্বলহীন মানুষের সেবার আদর্শ নিয়ে যে আন্তর্জাতিক রেডক্রসের পত্তন হয়েছিল, হাওড়ায় সেই রেডক্রসেরই এখন চরম দুরবস্থা। হাওড়া জেলা রেড ক্রস কর্তৃপক্ষের মধ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, ক্ষমতা দখলের লড়াই, অকর্মণ্যতা, সব মিলিয়ে হাওড়া জেলা শাখাটি ক্রমশই দুর্বল হয়ে পড়ছে। মানুষের সেবার চেয়েও এই অবস্থায় রেডক্রসের নিজের সেবাই এখন বেশি প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে।

অন্যান্য জায়গার মত হাওড়াতেও বেশ কয়েক বছর আগে রেডক্রসের শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তখন জেলা শাখাটি বিভিন্ন সেবামূলক কাজকর্ম করত। কিন্তু আস্তে আস্তে শাখাটি তার আসল লক্ষ্য থেকে সরে আসে। বর্তমানে হাওড়া জেলায় রেডক্রসের যে সীমিত কাজকর্ম চলছে তা তার অতীতের ভূমিকার ঠিক উল্টো ছবি। অবস্থাটা যেন – ঢাল নেই তরোয়াল নেই নিধিরাম সর্দারের মত। নানা অব্যবস্থায় সংস্থাটি আজ জর্জরিত।

হাওড়া জেলার রেডক্রসের নিজস্ব কোন বাড়ি নেই। সত্তরের দশকের শেষ থেকে জেলা রেড ক্রস কর্তৃপক্ষ নিজস্ব বাড়ি তৈরি করার কথা চিন্তা করতে শুরু করেন। রাজ্য সরকারের কাছে কর্তৃপক্ষ হাওড়ায় বাড়ি তৈরির জন্য একখন্ড জমি চেয়ে আবেদন করেন। রাজ্য সরকার চার্চ রোডে চার কাঠা সরকারি খাস জমি দেবার ব্যবস্থা করেন। '৮০ সালে তৎকালীন পূর ও নগর উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী প্রশান্ত শূর চার্চ রোডে রেডক্রসের প্রস্তাবিত বাড়ির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। কিন্তু এর কিছুদিন বাদে হঠাৎ সেন্ট থমাস স্কুল কর্তৃপক্ষ আদালতে গিয়ে ঐ জমির উপর ইনজাংশন জারি করার আবেদন করেন। তাঁদের দাবি ছিল যে, জমিটি সরকারি খাস জমি নয়, জমিটির মালিক স্কুল কর্তৃপক্ষ। আদালত স্কুল কর্তৃপক্ষের আবেদন মত জমিটিতে বাড়ি তৈরি না করার জন্য রায় দেন। সেই থেকে জমিটি এমনিই পড়ে আছে। এরপর হাওড়া রেড ক্রস কর্তৃপক্ষ আবার জেলা প্রশাসনের কাছে অন্য একটি জমি দেবার আবেদন করেন। জেলা প্রশাসন হাওড়া সমবায়িকার কাছে আর একটি জমি রেড ক্রসকে বাড়ি তৈরির জন্য বেশ কয়েক বছর আগে দেন। জমি তো হল, কিন্তু বাড়ি তৈরির টাকা কোথায়? হাওড়ার তৎকালীন জেলাশাসক সুমন্ত্র চৌধুরী রেডক্রসের বাড়ি তৈরির জন্য প্রায় ৭ – ৮ লাখ টাকা তুলে দেন। যে সমস্ত ব্যক্তিকে বাসের পারমিট দেওয়া হয় তাদের থেকে ডোনেশান নিয়ে ঐ বিপুল পরিমাণ টাকা জোগাড় করে দেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও আজও জেলা রেডক্রসের বাড়ি তৈরি হল না। জানা গেছে বাড়ি তৈরির জন্য পাওয়া ঐ টাকা ব্যাংকে রাখা হয়েছে। এখন বনবিহারী বসু রোডে কলকাতা পুরসভার একটি বাড়িতে জেলা রেডক্রসের কাজকর্ম চলেছে।

বিগত '৭৮ সালের বন্যার পর জেলার কৃষকদের কৃষিকাজে সহায়তা করার জন্য জাপান সরকার রেডক্রসের মাধ্যমে চারটি পাওয়ার-টিলার হাওড়ায় পাঠান। খবর নিয়ে জানা গেছে, সেই পাওয়ার টিলারগুলি আজ পর্যন্ত কোন কাজে লাগান হয়নি। জানা গেছে, দীর্ঘদিন পড়ে থাকার পর পাওয়ার টিলারগুলির আর কোন হদিস পাওয়া যায়নি। এমনকি অডিট রিপোর্টেও পাওয়ার-টিলারগুলির কোন উল্লেখ নেই।

হাওড়ার বাউড়িয়ার দেউলটিতে দিল্লির কেন্দ্রীয় রেড ক্রস দ্বারা পরিচালিত একটি হাসপাতাল রয়েছে। কয়েক বছর হল হাসপাতালটি কাজ করছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত হাসপাতালটির ইনডোর বিভাগ চালু হয়নি। অথচ হাসপাতালটিতে প্রতিদিন প্রচুর রুগী আসেন। হাসপাতালটিতে একজন ডাক্তারসহ ৩/৪ জন অন্যান্য কর্মী রয়েছেন। জানা গেছে, হাসপাতালের কর্মীরা দীর্ঘদিন ধরে মাইনে পাচ্ছেন না। যে বাড়িতে হাসপাতাল, সেই বাড়িটির অবস্থাও খারাপ। যে কোন সময়ে ভেঙে পড়তে পারে বলে অনেকে আশংকা প্রকাশ করেছেন। '৮৩ – '৮৪ সালে হাসপাতালটি সারানর ব্যবস্থা করা হয়। সারানর কনট্রাক্ট পায় জেলা রেডক্রসের এক কর্মকর্তার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। বিভিন্ন মানুষ অভিযোগ করেছেন যে সিমেন্টের বদলে মাটি দিয়ে হাসপাতালটি সারান হয়েছিল। জেলা রেড ক্রস কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে প্রকৃত ঘটনা জানবার জন্য অনুসন্ধান করার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু অনুসন্ধানের কাজ কোন এক অজ্ঞাত কারণে এগোয়নি।

আগে হাওড়ার ২২টি কেন্দ্রে রেড ক্রস কর্তৃপক্ষ বাচ্চা ও মায়েদের দুধ দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন। বেশ কিছুদিন ঐসব কেন্দ্র থেকে দুধ বণ্টন করা হত। কিন্তু কয়েক বছর হল দুধ বণ্টনও বন্ধ হয়ে গেছে।

কেন হাওড়া রেড ক্রসের এই চরম দুরবস্থা? এক কথায় বলা যায়, কর্মকর্তাদের মধ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ফলেই জেলা রেড ক্রসের আজ এ অবস্থা। হাওড়া জেলা রেড ক্রসের বর্তমান সম্পাদক মাজেদ আলি মোল্লা। মাজেদ সাহেব হাওড়া জেলা পরিষদের সি পি এম সদস্য। অপরদিকে আছেন রেডক্রসের হাওড়া সদরের সম্পাদক ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ দত্ত। শ্রীদত্ত কিছুদিন আগে সি পি এম-এর কর্মী ছিলেন। কিন্তু স্পষ্টভাষী হবার অপরাধে, কয়েক বছর আগে 'পার্টি বিরোধী' কাজকর্ম করার অজুহাত দেখিয়ে তাঁকে দল থেকে বিতাড়িত করা হয়। '৮৭ সালে জেলা কমিটি নির্বাচনের সময় ঠিক করা হয় শ্রীদত্তকে রেড ক্রসের জেলা সম্পাদক পদে প্রার্থী করা হবে। কিন্তু শেষে এক অজ্ঞাত কারণে শ্রীদত্তকে সরিয়ে মাজেদ মোল্লাকে প্রার্থী করা হয়। অনেকে অভিযোগ করেছেন, যথেষ্ট যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র সি পি এমের মনপসন্দ প্রার্থী না হবার জন্যই শ্রীদত্তকে সরিয়ে দেওয়া হয়। শ্রীদত্ত যেহেতু সদর সম্পাদক, তাই তাঁকে অবজ্ঞা করার জন্য মাজেদ সাহেব নিজের খুশিমত কাজকর্ম চালাচ্ছেন, এ অভিযোগ অনেকেরই। এমন কি বিগত বন্যার সময় হাওড়ায় রেড ক্রস থেকে যে ত্রাণ পাঠান হয় তা মাজেদ সাহেব নিজের খুশিমত বিলি করার ব্যবস্থা করেন। অভিযোগ, এ ব্যাপারে তিনি সদর সম্পাদকের সংগে কোন আলোচনা পর্যন্ত করেননি। মাজেদ সাহেব ও তাঁর অনুগামীদের জন্যই হাওড়া রেড ক্রসের আজ এই অবস্থা বলে অনেকের ধারণা।

তবে, এর মধ্যেই হাওড়া জেলা রেড ক্রসের সদর শাখা সীমিত ক্ষমতার মধ্যে কাজ করে চলেছে। সদর শাখার এক মুখপাত্র জানান তাঁরা বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে 'ফার্স্ট-এড ক্যাম্প' করছেন। জুনিয়র রেড ক্রসকে দিয়ে কিভাবে আরও ভাল কাজকর্ম করান যায় তার চেষ্টা চালাচ্ছেন। এছাড়া '৮৬ সালে জেলা রেড ক্রসের সদর শাখার উদ্যোগে 'গ্রীন হাওড়া – ক্লিন হাওড়া' শীর্ষক একটি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। বিভিন্ন স্কুলের বাচ্চাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থাও করেছেন রেড ক্রসের সদর শাখার কর্মীরা। সদর শাখার এক মুখপাত্র জানান, আয় বলতে তাঁদের কিছুই নেই। জেলা প্রশাসনের সক্রিয় সহযোগিতায় তারা কিছু কিছু টাকা সাহায্য হিসাবে বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে পাচ্ছেন। তবে তার পরিমাণ অতি সামান্য। এছাড়া সদর শাখার কর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে লোকের থেকে চাঁদা তুলেও তহবিল বাড়ানর চেষ্টা করছেন।

অথচ এরই মধ্যে কোন কাজ না করেই জেলা রেড ক্রসের এক কর্মকর্তা এবার দিল্লিতে গিয়ে রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে 'ভাল কাজ করার' সার্টিফিকেট নিয়ে এলেন। তাই জেলা রেড ক্রসের অনেক সাধারণ কর্মী প্রশ্ন তুলেছেন, যেখানে জেলা রেড ক্রসের এই অন্তঃসারহীন অবস্থা, সেখানে কেন আজকাল কর্মকর্তারা পুরস্কার নিতে দিল্লি যান? আর পুরস্কারের জন্য এঁরা মনোনীতই বা হন কিভাবে? স্থানীয় লোকজন এখন বলাবলি করছেন, 'সত্যিই খাজনার চেয়ে বাজনা বেশি হাওড়া রেড ক্রসের।' □

নিজস্ব প্রতিনিধি

সর্বোদয় সম্মেলনে রাজীব নেতৃত্বের সমালোচনা



অসহযোগ আন্দোলনের সেই দুই সহযোদ্ধা নৃপেন চৌধুরী, উমাশংকর যোশী

গত বছরের ২৭ থেকে ২৯ ডিসেম্বর বোম্বাইয়ের বোরিভলিতে গান্ধীবাদীদের এক সম্মেলন হয়। কোনো মন্ত্রী বা রাজনৈতিক নেতা এই সম্মেলনে আমন্ত্রিত না হওয়ায় এই রকম একটা সম্মেলন সংবাদপত্রে অবহেলিত থেকে গেছে। অথচ গুরুত্বের দিক থেকে এই সম্মেলন আদৌ অবহেলার যোগ্য ছিল না। সারা ভারত থেকে পাঁচ হাজারের মত প্রতিনিধি নিজেদের খরচে এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। কন্যাকুমারী থেকে হিমালয়ের গাড়োয়াল, এমনকি মণিপুর অরুনাচলের মত এলাকা থেকেও কম বেশি প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। দেশের ক্রমবর্ধমান বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রতিবছর এই ধরনের সম্মেলনের গুরুত্ব অনেক।

গান্ধীজীর গঠনমূলক কাজের সংগে যুক্ত কর্মী ও নেতাদের সংগে গুজরাতী লেখক এবং বিশ্বভারতীর প্রাক্তন আচার্য উমাশংকর যোশী, চিপকো আন্দোলনখ্যাত সুন্দরলাল বহুগুণা, চম্বলের ডাকাতদের মধ্যে কাজের জন্য বিখ্যাত সুব্বারাও, পারমাণবিক বিদ্যুতের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত সর্বোদয় নেতা নারায়ণ দেশাই, শান্তিনিকেতন ও সেবাগ্রামের প্রাক্তন শিক্ষয়িত্রী ও লেখিকা মার্জারি সাইকস, কাশী বিদ্যাপীঠের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ৯৮ বছরের বিচিত্র নারায়ণজীও সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছেন। সম্মেলনে পশ্চিমবংগ থেকে হাজির ছিলেন বৃদ্ধ নৃপেন চৌধুরী, যিনি ১৯২১ সালে আমেদাবাদ কংগ্রেসে গান্ধীজীর প্রস্তাবের এবং পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষে ৬ ভোটদাতার একজন ছিলেন। সম্মেলনে যেসব বিদেশী গান্ধীবাদী বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে ছিলেন জাপানের কৃষি-বিজ্ঞানী মাসানোবু ফুকুওকা, ইন্দোনেশিয়ার চার প্রতিনিধিদলের নেত্রী শ্রীমতী গেদঙ বাগায়েস ওকো, নেপালের গান্ধীবাদী নৈতা তুলসী মেহরাজী ও রুদ্রলালজী।

১৯২১ সালে খিলাফৎ অসহযোগ আন্দোলনের অংশ হিসাবে বোম্বাই শহর থেকে ৬০ কিলোমিটার দূরে বোরিভলি গ্রামে 'শেরি কেন্দ্র' নামে গান্ধী আশ্রমের প্রতিষ্ঠা হয়। বর্তমানে বোরিভলি বোম্বাই শহরের অন্তর্ভুক্ত এবং বহুতল বাড়ি পরিবেষ্টিত শেরি কেন্দ্রের পরিবেশ এখনও গ্রামের মত। অন্যান্য গান্ধীবাদী অর্থনৈতিক কার্যক্রম ছাড়া এখানে বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট নিয়ে গবেষণা ছিল। তিনদিনের সর্বোদয় সম্মেলন শুরুর আগে কিছু গান্ধীবাদী গোষ্ঠী চারদিন দেশের বিভিন্ন সমস্যা এবং একদিন বিশেষ করে যুবকদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন।

বেশিরভাগ প্রতিনিধি এসেছিলেন গ্রামাঞ্চল থেকে। তাই শ্রীমতী মণিবেন লালাবতীর স্বাগত ভাষণে গ্রামের সমস্যা মুখ্য হয়ে দেখা দেয়। তিনি বলেন, শহরে নতুন নতুন বড় বড় হাসপাতাল হচ্ছে, কিন্তু গ্রামের রোগীরা সামান্য ওষুধও পায় না। সারা দেশে আকাল চলছে, পানীয় জল ও খাদ্যের অভাবে গৃহপালিত জন্তু মরে সাবাড় হয়ে যাচ্ছে, মানুষও যাযাবরে পরিণত হচ্ছে। ফলে গ্রামাঞ্চলে চাষবাস চালু রাখা যাবে কিনা, তাই নিয়ে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। সম্মেলনের মূল লক্ষ্য ধরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, ১৯৭৪-৭৫ সালের বিহার ছাত্র আন্দোলনের এক নেত্রী জানকী (পরবর্তীকালে জয়প্রকাশ নারায়ণের পালিতা কন্যা) বিহার আন্দোলনের জনপ্রিয় গান 'মানবসে মুক্তি চাহিয়ে' গানের মধ্য দিয়ে।

শ্রীউমাশংকর যোশী বলেন, গান্ধীজীর মৃত্যুর পর বিনোবা ভাবে লোকশক্তিকে জাগ্রত করার চেষ্টা করেন আর জয়প্রকাশ নারায়ণ গান্ধীবাদী আন্দোলনকে সর্বাত্মক বিপ্লবের দিকে নিয়ে গিয়েছেন। গান্ধীবাদীদের স্থানীয় পর্যায়ে কাজ করলেও তাদের বিশ্ব-সমস্যা নিয়ে ভাবতে হবে। চের্নোবিলের মারাত্মক দুর্ঘটনার পরেও এদেশে পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র বাড়ানোর কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে, এদেশে চের্নোবিলের মত ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঠেকানোর জন্য জোরদার আন্দোলন করতে হবে। সুন্দরলাল বহুগুণা বলেন, অরণ্য রক্ষা ও অরণ্য বৃদ্ধির কর্মসূচীকে সারা দেশে ছড়িয়ে দিতে হবে। কিসের জন্য এবং কাদের জন্য উন্নয়ন প্রশ্ন তুলে উন্নয়নের ধারার পুনর্বিন্যাস করতে হবে, পাঞ্জাব ও হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান এবং নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কারের জন্য সচেষ্ট হতে হবে। তিনি বলেন, দেশের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনগুলিকে সংবাদ মাধ্যম যথেষ্ট গুরুত্ব না দেওয়ায় দেশে হিংসার মনোভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুন্দরলাল বহুগুণার মতে, বর্তমানে মানবজাতির সামনে তিনটি সমস্যা – জনসংখ্যা, গরিবী ও পরিবেশ।

সম্মেলনে বিভিন্ন আলোচনায় কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি এবং প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী সবচেয়ে বেশি সমালোচিত হন। সর্বোদয়ীরা এক সময়ে জয়প্রকাশের আন্দোলনের মূল সংগঠন ছিল। এখনও তাঁরা সংকটের কথা বলছেন। তবে সম্মেলনে একজনও জনতা পার্টি বা চন্দ্রশেখরের নাম উল্লেখ করেননি। বরং কোন কোন শর্তে ভি পি সিংকে দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলনের নেতা হিসেবে স্বীকার করা হবে, তাই নিয়ে দীর্ঘ বিতর্ক চলে। তবে সম্মেলনের প্রতিটি দিন বয়স্ক গান্ধীবাদী নেতাদের সংগে তরুণ নেতাদের মতান্তর সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। রাজনৈতিকভাবে ছাত্র-যুব সংঘর্ষ বাহিনী দেশের বিভিন্ন এলাকায় গরিবদের নিয়ে আন্দোলন করছেন এবং তাঁরা অভিযোগ করলেন, বয়স্ক নেতৃত্বের জন্য তাঁরা ব্যাপকভাবে গরিবদের আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে পারছেন না।

যুবা গান্ধীবাদীরা যেভাবে সম্মেলনে গান্ধী আন্দোলন এবং সম্মেলন পরিচালনা সম্পর্কে বিক্ষোভ প্রকাশ করলেন, তাতে মনে হল আগামীবারের সর্বোদয় সম্মেলন হয়ত অন্যরকম হবে। একসময়ে কংগ্রেস ও সোসালিস্টদের বার্ষিক সম্মেলনে সারা দেশের প্রতিনিধিরা বিভিন্ন রাজ্যের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতেন। জাতীয় ঐক্য বজায় রাখার ব্যাপারে এটি একটি বড় সোপান ছিল। সুখের বিষয়, গান্ধীবাদীরা জাতীয় ঐক্য বজায় রাখার সেই ধারাকে এখনও গতিশীল রেখেছেন। □

নিরঞ্জন হালদার

ফটো : গৌতম দাস



'যতদিন বেঁচে থাকব কাজ করে যাব' : কমলা মুখার্জি

'বৃটিশ পুলিশ কোনদিন আমাকে ধরতে পারেনি।' কথাগুলো বলার সময় দৃঢ় প্রত্যয় জেগে উঠেছিল ৭৪ বছর বয়সী কমলা মুখার্জির কণ্ঠস্বরে।

কমলা মুখার্জিকে শুধু প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী বললে ভুল হবে, দেশের স্বাধীনতার পর তিনি কখনো ছুটে গিয়েছেন আদিবাসী সমাজের ডাকে, কখনো মেয়েদের অধিকার বোধ জাগিয়ে তোলার কাজে। হাজং আন্দোলনের সংগে তাঁর ছিল অন্তরের টান। তাই বাংলাদেশের চাকমা উদ্বাস্তুদের সমস্যা এখনও তাঁকে প্রবলভাবে নাড়া দেয়।

হিমালয়ের সংগে তাঁর গভীর সম্পর্ক। সুযোগ পেলেই টগবগিয়ে ছুটে যান হিমালয়ের কোলে। আর সতেজে জানিয়ে দেন 'যত দিন বাঁচব কাজ করে যাব।'

কমলা মুখার্জির শিয়ালদহের বাড়িতে যেতেই তিনি যেন কিছুটা বিব্রত হয়ে পড়লেন। 'ঐ চেয়ারটায় বসুন।' সত্যি কথা বলতে কী চেয়ারের খানিকটা অংশ ছাড়া ঘরে আর কোথাও বসার জায়গা ছিল না। চারিদিকে শুধু বই, এমনকি ওঁর বিছানার দুপাশেও। আমি সেদিকে তাকাতেই বললেন, 'রাত্রে পড়ি তো।'

জানতে চাইলাম–কিভাবে স্বাধীনতা আন্দোলনে এলেন? চকিত জবাব এল, 'স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিতে হবে বলেই তো জানতাম।' উত্তরটা শুনে বেশ কিছুটা ঘাবড়ে গেলাম। উনি বোধহয় বুঝলেন। তারপর ধীরে ধীরে বলতে শুরু করলেন, 'আমার জন্ম হয়েছিল দামোদরের তীরে। বাবাকে মনে পড়ে না। আমার জন্মের পরেই বাবা প্রমথনাথ চ্যাটার্জি , মানবেন্দ্রনাথ রায়ের সংগে জার্মানিতে পালিয়ে যান। মা আমাকে, দাদাকে আর দিদিকে নিয়ে থাকতেন। একবার দামোদরের বন্যায় আমাদের ঘর ভেঙে যায়। বাবার সহকর্মীরা আমাদের মৈমনসিং-এ নিয়ে যান। মা পড়াশোনা জানতেন। একটা স্কুলে কাজ জুটে যায়। আমরা বিপ্লবীদের মধ্যেই বড় হয়েছি।'

বললাম–জানতে ইচ্ছে করে, এখন আপনি কোন কোন সংগঠনের সংগে যুক্ত। একটু হেসে বললেন, 'পশ্চিমবংগ মহিলা সমিতির সংগে আমি দীর্ঘদিন ধরে যুক্ত। এছাড়া জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটি, হিমালয় সমীক্ষা পরিষদের সংগেও আমার যোগ রয়েছে। মৈমনসিং বিদ্যাময়ী স্কুলে আমি পড়তাম। ঐ স্কুলের প্রাক্তন ছাত্রীদের একটা সংগঠন রয়েছে এখানে, সেখানে যুক্ত রয়েছি।'

আমি আমার পরের কৌতূহল প্রকাশ করলাম–আপনি দীর্ঘদিন বিভিন্ন সংগঠনে কাজ করছেন। ক্লান্তি বা হতাশা কি আপনাকে স্পর্শ করে না? উনি বোধহয় একটু বিরক্ত হলেন, বললেন, 'ক্লান্তি, হতাশা এগুলো আবার কী? এত তাড়াতাড়ি সব কিছু হয়ে যাবে তা তো হয় না। যে। কাজ গুলো হাতে রয়েছে তা শেষ না করে বিশ্রাম নেবার অবকাশ কোথায় বলুন?'

জানতে চাইলাম, আপনাদের সময়কার রাজনৈতিক আন্দোলনের সংগে আজকের রাজনৈতিক আন্দোলনের কোন পার্থক্য কি আপনার নজরে আসে না? এবার একটু গম্ভীর হলেন তিনি। 'হ্যাঁ, আমরা যখন রাজনীতির জগতে আসি তখন রাজনীতি করা বা রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেওয়া অনেকের কাছেই ভয়ের ব্যাপার ছিল। কারণ রাজনীতি করলে পুলিশ ধরে নিয়ে যেত। নির্যাতন করত। আজকাল অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। এখন রাজনীতি বা রাজনৈতিক আন্দোলন কোন ভয়ের বিষয় নয়। তাই এখন বহু মানুষ রাজনীতি করছে। এ ছাড়া রাজনীতি এখন অনেকের কাছেই কিছুটা লাভজনক পেশা হয়ে গিয়েছে।'

কমলা মুখার্জি এদেশের গোবা, নাগা ও বাংলাদেশের চাকমা উদ্বাস্তুদের মধ্যে কাজ করেছেন। সুতরাং তাঁর কাছে আদিবাসী সমস্যার কথা জানতে চাইলাম। প্রশ্ন করি, এখন যেভাবে ঝাড়খন্ড আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে এর কারণ কী? তিনি একটু উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। জবাব দিলেন, আমরা দীর্ঘকাল ধরে আদিবাসীদের জমি, এমনকি তাদের মেয়েরাও ছিল গ্রামের মহাজনদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। এখন তারা পুরনো শোষণ ব্যবস্থাকে মানতে চাইছে না। এছাড়া জাতপাতের ব্যাপারটা এখনও গ্রামে রয়ে গিয়েছে। স্বভাবতই আদিবাসীরা এর থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে। আমাদের দেশের কমিউনিস্টরাও এদিকে তেমন নজর দেয়নি। বলা যায় তারা 'ক্ল্যাস' জিনিসটাকে দেখেছে, কিন্তু 'কাস্ট' দেখেনি।'

–কিন্তু এ ধরনের সমস্যা সমাধানের উপায় কী? জবাব দিতে তিনি একটু সময় নিলেন না। মনে হল উত্তরটা তাঁর অনেক আগেই তৈরি ছিল। বললেন, 'যেমন করে রাশিয়া তার উপজাতি সমস্যা সমাধান করেছে পথ সেটাই, ওদের দেশে তো অনেক উপজাতি আছে, কই তারা তো আন্দোলন করছে না। আমাদের দেশের আদিবাসীরাও যদি বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সুযোগ সুবিধা পায় তবে তারা এ ধরনের আন্দোলনে যাবে না। আমাদের দেশের আদিবাসীদের জন্য যে টাকা পয়সা সরকার দেয় তার সুষ্ঠু ব্যবহারও আমরা করি না'।

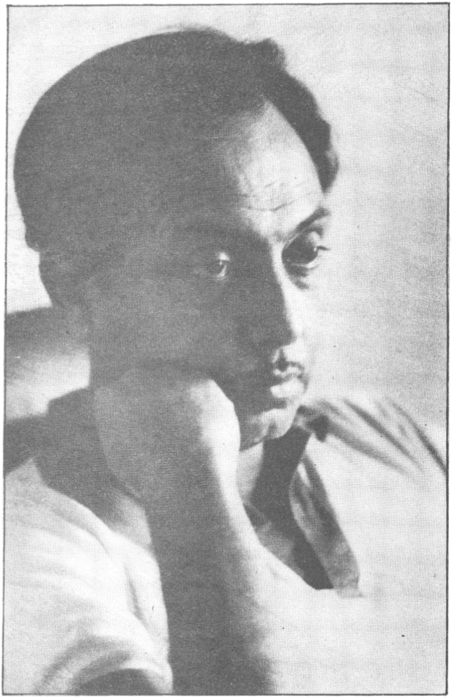
পরিবেশটা একটু গম্ভীর হয়ে ওঠে। প্রসংগ পাল্টানোর জন্য জিজ্ঞাসা করি–স্বাধীনতা আন্দোলনের উপর কিছু লিখছেন কি? উনি বললেন, 'হ্যাঁ, স্বাধীনতা সংগ্রামের ঘটনার উপর আমরা কাজ করছি। চ্যালেঞ্জ এ স্টেজ অব ইন্ডিয়ানস্ স্ট্রাগল ফর ফ্রিডাম নামে একটা বই প্রকাশ করেছি। এই বইতে ১৮৭২ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন ঘটনা তুলে ধরা হয়েছে। বিপ্লবী বাঘাযতীন ও যদুগোপাল মুখার্জিকে নিয়ে একটা বই করেছি। এ বিষয়ে রিসার্চের প্রয়োজনে আমাদের কাছে আসেন। তাঁদের সাহায্য করি।' জিজ্ঞাসা করলাম, পশ্চিমবংগ সরকার এ বিষয়ে আপনার কোন সাহায্য নেয় কিনা। বললেন,'হ্যাঁ, যেমন ননীবালা দেবী ছিলেন প্রথম মহিলা রাজবন্দী। সেই ১৯০৫-১৯০৬ সালের কথা। সরকার তাঁর সম্পর্কে জানাতে বলেছেন।'

দেশের নারী আন্দোলনের সংগে কমলা মুখার্জির দীর্ঘদিনের যোগ।

প্রশ্ন করি আমাদের দেশের মেয়েরা আজও সামাজিক বিভিন্ন বাধানিষেধের গন্ডি ভেঙে বেরিয়ে আসতে পারছে না কেন? কেনই বা রূপ কানোয়ারের সতী হওয়ার মত লজ্জাজনক ঘটনা আজও ঘটে? উত্তর দেবার গতি এবার একটু কমে এল। ধীরে ধীরে বললেন, আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় অনেক মেয়েরাই তো ঘরের বাইরে এসেছিল। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁদের দান সমাজ অস্বীকার করেনি। কিন্তু আজও সমাজের বেশ কিছুটা সামন্ততান্ত্রিক কাঠামো রয়ে গেছে। এই সমাজতান্ত্রিক কাঠামোর বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই করতে হবে।'

জিজ্ঞাসা করি, কখনও কি নিজেকে একলা মনে হয়? এবার প্রাণখোলা হাসি। বললেলন আমি একলাই থাকি। বোম্বেতে ছেলে চাকরি করে। সেখানেই ছেলে আর বউ থাকে। ১৯৬১ সাল থেকে হিমালয়ের বিভিন্ন চূড়ায় উঠছি। এ বছরটাও তো বাইরে বাইরেই ঘুরলাম। অরুণাচলে গিয়েছিলাম। স্বাধীনতার ৪০ বছর উপলক্ষে সরকার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের রেলের পাশ দিয়েছিল। আমিও বস্তার, অন্ধ্র, পুনা ঘুরে এলাম। কিছুদিনের মধ্যে মণিপুরে যাব। কলকাতায় থাকলেও বাড়িতে থাকার সময় পাই কোথায়? বিভিন্ন সংগঠনের কাজে ব্যস্ত থাকি কাজেই একলা হবার ফুরসৎ মেলে না।' □

রাহুল গোস্বামী



'নথি' – এই সময়েরই দলিল চিত্র

কাহিনী-চিত্রের পাশাপাশি তথ্যচিত্র নির্মাণের বয়সও অনেক হল। কিন্তু তথ্যচিত্রের আকারে কাহিনীচিত্র নির্মাণের উদাহরণ বোধহয় খুব বেশি দেওয়া যাবে না। ফিচার না কাহিনীচিত্রের মেজাজে তথ্যচিত্র নির্মাণে পরিচালকের যে মুন্সিয়ানা থাকা দরকার, তা না থাকলে কাহিনী অথবা তথ্য কোনটাই দর্শকের মনে ভিত গড়তে পারে না।

সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান ফিল্ম লেবরেটরির প্রোজেকশন থিয়েটারে স্বল্প সংখ্যক দর্শকের উপস্থিতিতে প্রদর্শিত হল একটি কাহিনীমূলক তথ্যচিত্র – 'নথি'। নথি অর্থাৎ দলিল। নথি অর্থাৎ প্রমাণ। মূল ঘটনা হল : এক অশান্ত যুবক, যে পুলিশের চাকরি পেয়েছিল এবং চাকরি করতে করতেই মুখোমুখি হয়েছিল করাপসনের। কিন্তু সে কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি সেসব। ফলে তাকে একসময় ট্রান্সফার করা হল। এবং সে পদত্যাগ করল। আর এই সময় ছেলেটি পেল পুলিশ মেডেল।

ছবির প্রয়োজনে অভিনেতার আয়োজন থাকলেও, স্থিরচিত্রগুলি উপস্থাপনার প্রয়োগে হয়েছে জীবন্ত। মনে হয় শ্যামল ঘোষাল বা কল্যাণ চ্যাটার্জি নন, মূল অভিনেতা সংবাদপত্রের উদ্ধৃতাংশ ও স্থির চিত্র। – মুন্সিয়ানার সঙ্গে এমন প্রয়োগ সচরাচর দেখা যায় না। চল্লিশ মিনিটের ছবি 'নথি'। তোলা হয়েছে ১৬ মিমি ক্যামেরায়। পরে ব্লো-আপ করা হবে। কথা আছে দূরদর্শনে দেখানর।

ছবির শুরুতেই পরিচালক বলে দিয়েছেন, ছবির ঘটনাবলী বিভিন্ন কেস হিস্ট্রি থেকে নেওয়া। শুধু চরিত্র ও স্থান কল্পনাশ্রিত। ব্যারাকপুর ট্রেনিং কলেজ, টিটাগড়, খড়দহ, বিধাননগর, যাদবপুর, ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ড – এইসব পরিচিত এলাকাগুলি ছবিতে চিত্রিত হয়েছে।

ছবিটি মূলত চারটি ভাগে ভাগ করা যায়। (ক) অশান্ত যুবকের অস্থির চলাফেরা, (খ) ব্যারাকপুরে পুলিশ ট্রেনিং, (গ) টিটাগড়, খড়দহ, বিধান নগর ও যাদবপুর থানার কার্যকলাপ, (ঘ) পদত্যাগ পর্ব ও পুলিশ মেডেল দেওয়ার অনুষ্ঠান।

ছবি থেকে আমাদের জেনে নেওয়ার মত তথ্যগুলি হল : (১) কলকাতা পুলিশের ইনভেস্টিগেশন বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় চলে। ডাক পাক বা না পাক। ফুট প্রিন্ট বা ফিংগার প্রিন্ট এ সব মনে করিয়ে দেয়। (২) পুলিশের কাছে দেওয়া স্বীকারোক্তি কোর্টে গ্রাহ্য নয়। (৩) কুকুরের ঘ্রাণশক্তির সাহায্যে দোষীকে ধরার ব্যাপারটাও কোর্টে গ্রাহ্য হয় না।

ছবিতে এমন কিছু দৃশ্যের সংযোজন আছে যা আমাদের মগজকে ঝাঁকিয়ে দেয়। দৃশ্যগুলি হল : পুলিশ ট্রেনিং স্কুলে একটি ঘোড়া ফাঁকা

মাঠে ছুটতে ছুটতে ঘরের ভেতর ঢুকে গেল। থানায় মস্তানদের উপদ্রব। পণপ্রথাকে কেন্দ্র করে এবং তার সুযোগ সে সম্ব্যবহার করে মস্তানদের থানা ঘেরাও। রাজনৈতিক নেতাদের থানা অফিসারের ওপর চাপ সৃষ্টি। হাসপাতালে রোগীর অস্বাস্থ্যকর নালা। রোগীর বিছানার নিচ দিয়ে বেড়াল চলে যাওয়া। স্কুলে মেয়েদের হয়রানি। যাদবপুর থানায় ড্রাগ। রাজনৈতিক চাপে থানার অফিসাররা কতদূর নিরপেক্ষ থাকতে পারেন। একজন পুলিশ অফিসারকে কোন জায়গাতে উপযুক্ত প্রমাণ না করতে পারায় হোমগার্ডে প্রেরণ। শুধুমাত্র পুলিশ অফিসার নিজেকে এবং পুলিশ প্রশাসনকে ধিক্কার দেবার জন্যই পদত্যাগপত্রে নিজের খামের নিচে লেখে 'হোমগার্ড'। আহা, কী তীব্র ব্যঞ্জনা! পুলিশ মেডেল পাওয়ার দৃশ্য।

ছবিতে একটি অংশে মহাভারত থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে : 'যদি কোন মহিলা অলংকার পরিহিতা, নির্ভয়ে রাজপথে চলাফেলা করিতে সক্ষম হয়, তখনই রাজার শাসন ও শৃংখলার গুণগান করা যাইতে পারে।' – একি শুধু মহাভারতের কথা না শুধু পরিচালকের? এখানেই 'নথি' ছবিটি সময়ের গন্ডি পার হতে পেরেছে। আর এ কারণেই বলা যেতে পারে মাত্র চল্লিশ মিনিটের বিশাল ছবি 'নথি' শ্যামল ঘোষাল দক্ষ হাতে পূর্ণ যোগ্যতায় তথ্যচিত্রটি নির্মাণ করেছেন। ছবির চিত্রগ্রাহক গৌর কর্মকার ও সম্পাদক শক্তি দত্ত-ও পরিচালকের পাশাপাশি যোগ্য সুনামের অধিকারী। □

গৌতম সেনগুপ্ত

সুরের বাঁধনে গংগা ভোলগা

কথায় বলে যে মানুষ গান, ফুল ও শিশু ভালবাসে না সে এক মূর্তিমান শয়তান। তাই গান শুধু মানুষকে মনুষ্যত্বই দান করে না দূরকে যেন কাছে আনে তেমনি অন্তরের নিবিড় সম্পর্ককে আরও প্রগাঢ় করে তোলে।

১৫ ফেব্রুয়ারি সোনা মাখা রোদ্দুরের ভোরে এমন এক গান শোনার, গান ভাল লাগার আসর বসিয়েছিল সংগীত জগতে বহু পরিচিত নাম এইচ এম ভি। যাদের এই আসরের মূল উদ্দেশ্য ছিল গানের তরী বেয়ে সোভিয়েত সংগীতপ্রেমীদের হাত ধরা। আবার অন্যদিকে ওদেরও উদ্দেশ্য ছিল রুশী সুরের মাধ্যমে ভারতের সংগীত মূর্ছনাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাওয়া। শুধু তাই নয়, এরই মাধ্যমে উভয় দেশের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক যাতে আরও উন্নত হয় তার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা।

সেদিনের অর্থাৎ সোমবারের ওই ভোরে কলকাতা তথ্যকেন্দ্রে সংগীতার্ণব থেকে কয়েকটি আকর অর্থাৎ ক্যাসেট ও রেকর্ড মিলিয়ে ১৪৮টি গানের কথা তুলে দেওয়া হল সুধী শ্রোতৃবৃন্দের হাতে। এবার যার যেটা পছন্দ সেটা তুলে নেওয়ার পালা। প্রসংগত, ১৯৭৮ সাল থেকে এইচ এম ভি রুশ সংস্থা মেঝদুনারোদশায়ার সংগে এই দেয়া-নেয়ার হাট বসিয়ে যাচ্ছে।

এই দেয়া নেয়ার হাটের উদ্বোধন করে কলকাতার মেয়র কমল বসু বলেন, 'উভয় দেশের সংস্কৃতিগত ভাবধারা বিনিময়ের ক্ষেত্র হয়ত বা ততটা সম্প্রসারিত হয়নি কিন্তু যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।' আর এই একই সম্ভাবনার সুর বেজে ওঠে কলকাতায় সোভিয়েত দূতাবাসের প্রধান সারগেই এম কোসিকান এবং অন্যান্যদের কণ্ঠেও।

যখন বেরিয়ে আসছিলাম তখন এক না-জানা গানের সুর মনকে কেমন যেন উদাস করে তুলেছিল যার রেশ কাটতে বেশ কিছুটা সময় লেগেছিল। আর তখনই ইংরেজ কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের একটি কবিতার দু'টি লাইন মনে পড়ে গেল "The music in my heart I bore/Long after it was heard no more." □

দেবাশিস চট্টোপাধ্যায়

কলকাতার আসল মুখ

দূরদর্শনের রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে কলকাতা নিয়ে সিরিয়াল তৈরি করা হবে। ৫২টি পর্বে ভাগ করে এই সিরিয়াল তৈরি করার প্রাথমিক কাজ এখন প্রায় শেষ হতে চলেছে। তবে এখনও চিত্রনাট্য তৈরি হয়নি। কলকাতা সম্বন্ধে নানান তথ্য সংগ্রহ করার কাজ পূর্ণ উদ্যোগে চলেছে। বিশিষ্ট কলকাতা গবেষক নিশীথরঞ্জন রায় এই তথ্য দিয়ে জানালেন, কলকাতা সিরিয়ালে এখনও পর্যন্ত কোন খসড়া তৈরি করা হয়নি। তথ্য সংগ্রহের কাজ শেষ হবার পরেই বিশিষ্ট চিত্রপরিচালকের মতামত নিয়ে এই খসড়া রচনা করা হবে।

শ্রীরায় জানান, জোব চার্নক এখানে এসেছিলেন ১৬৯০ সালের ১৬ আগস্ট, তার আগেও কলকাতা সংলগ্ন এলাকাগুলিতে রমরমা অবস্থা ছিল। কিন্তু জোব চার্নক আসার আগে কলকাতার অবস্থা ঠিক কেমন ছিল, তার হদিশ খুঁজে পাওয়া কঠিন। কেননা সে সময়ের কলকাতা সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য পাওয়া গিয়েছে ইংরেজদের কাছ থেকে। তাদের তৈরি করা ম্যাপ দেখে অনুমান করতে হয় তৎকালীন কলকাতার গতিপ্রকৃতি পর্তুগিজদের ম্যাপে পাওয়া যায়নি। পেলে কলকাতা সম্পর্কে একটা বস্তুনিষ্ঠ ছবি খুঁজে পাওয়া যেত।

নিশীথবাবু জানান, যদিও ইংরেজ আসার আগে কলকাতার অবস্থা রমরমা ছিল, কিন্তু পর্তুগিজদের তৈরি করা কোন ম্যাপ বা তথ্যভিত্তিক লেখার কোন হদিশ পাওয়া যায়নি। তাই সেই অবস্থার পুংখানুপুংখ বিবরণ আমাদের হাতে নেই। 'কলকাতা সম্বন্ধে কোন ডকুমেন্টেশন নেই। আমরা চাই তা করা হোক। আমরা কলকাতা সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য লন্ডন ও এখান থেকে সংগ্রহ করে তা দেশবাসীকে দেখাতে চাই।'

সিরিয়াল সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করলে নিশীথবাবু জানান, এই ধরনের সিরিয়াল করতে গেলে দরকার তখনকার দিনের পোশাক-আশাক। সেই সময়ের পারিপার্শ্বিক অবস্থার কিছু ছবি, যা না হলে সেই যুগের প্রকৃত চিত্র ফুটে উঠবে না। তবে এ সবকিছুই নির্ভর করছে টেকনিক্যাল এক্সপার্টসের ওপর। এই ধরনের সিরিয়ালের পরিচালক কে হবেন, প্রশ্ন করলে নিশীথবাবু বলেন, আমরা চাই ছায়াছবির সংগে যুক্ত সমস্ত মানুষের সহযোগিতার। সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন থেকে শুরু করে সমস্ত নামী দামী চিত্র পরিচালকদের সংগে কথা হয়েছে। তাঁরা প্রত্যেকে এক একটা পর্ব পরিচালনা করতে আগ্রহী। তবে এখনও কোন কিছুর ফয়সালা হয়নি। আলোচনা চলছে। □

স্বপন বসু

দমদম সংগীত পরিষদের সংগীত আসর

গত ২১ ফেব্রুয়ারি দমদম মতি ঝিল কলেজ হল-এ দমদম সংগীত পরিষদ আয়োজিত শাস্ত্রীয় সংগীতের এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান হয়। অংশগ্রহণকারী শিল্পীরা মূলত স্থানীয় হলেও অনেকেই খ্যাতিমান। শিল্পীদের মধ্যে কল্পনা গোস্বামী (মারু বেহাগ), বিশ্বনাথ দাস (বেহাগ) ও শক্তি চট্টোপাধ্যায় (পূরিয়া) শ্রোতাদের প্রশংসা কুড়িয়েছেন। মালকোষ রাগে শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়ের সরোদ বেশ প্রশংসনীয়। কিন্তু সব চেয়ে বেশি প্রশংসা প্রাপ্য দমদম সংগীত পরিষদের, যাঁরা সামান্য সামর্থ্য নিয়ে এই ধরনের একটি উঁচু দরের সার্থক অনুষ্ঠান পরিচালনা করেছেন।

বিশেষ প্রতিনিধি

প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি



চন্ডালিকার একটি দৃশ্য

'পূর্ব কলিকাতা সাংস্কৃতিক চক্রে'র দ্বিতীয় বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান কলামন্দির বেসমেন্টে আরম্ভ হয় নির্দিষ্ট সময়ের মিনিট-পঁয়তাল্লিশ পর। এই সান্ধ্য অনুষ্ঠানে বিশেষ কারণে উপস্থিত থাকতে পারেননি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অজিতকুমার পাঁজা এবং অনুপস্থিত ছিলেন অনুষ্ঠান-সভাপতি বিচারক ভগবতীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। অবশেষে অনুষ্ঠান-সূচনা 'উদ্বোধনী নৃত্য' দিয়ে। আবহসংগীতে পন্ডিত রবিশংকরের নাম থাকায় কৌতূহল ছিল। ক্ষীণ সুরে বেজে উঠল : 'স্বাগতম'। অর্থাৎ দিল্লি এশিয়াডের উদ্বোধন উপলক্ষে প্রস্তুত রবিশংকরের সুরারোপিত গানটি, সেই সংগে অতি সাধারণ মানের নৃত্য। মঞ্চের একপাশে তখন বেশ কয়েকটি মাইক জায়গা জুড়ে রয়েছে। এরই মধ্যে পিছনের পর্দায় সংস্থার নাম ইত্যাদি দেখা গেছে। বক্তব্য রাখলেন সংস্থা-সভাপতি গৌতম তালুকদার, উপদেষ্টা সুব্রত ঘোষ, ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন সম্পাদক আশিস সাহা। জানা গেল বিভিন্ন সাংগঠনিক কার্যে সংস্থার আন্তরিক প্রয়াসের কথা।

এরপর সম্মেলক সংগীত যেখানে এসেছে জাতীয় সংহতির কথা, অমর শহীদদের প্রসংগ। শোনা গেছে : 'ধনধান্যে পুষ্পে ভরা', 'ভারতবর্ষ সূর্যের এক নাম', 'মুক্তির মন্দির সোপান তলে', 'সারে যাঁহা সে আচ্ছা' গানগুলি, যার মধ্যে শেষোক্ত গান দুটি একটা মান বজায় রেখেছে। এরপর মানিক সাহার দুটি গান যার প্রথমটি রবীন্দ্রসংগীত। শ্রী সাহার কন্ঠের আওয়াজটি ভাল কিন্তু তার সপ্তকে তিনি অস্বচ্ছন্দ। সব মিলিয়ে তিনি প্রত্যাশা পূরণ করেন না।

শেষ অনুষ্ঠান রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্য 'চন্ডালিকা'। নৃত্যনাট্যর দুর্বলতম অংশ হল শিল্পীদের গান। তারই মধ্যে লিপিকা বন্দ্যোপাধ্যায় (প্রকৃতি) কিছুটা স্বস্তি দেন। কোন কোন মূহুর্তে কৃষ্ণা মুখোপাধ্যায় (মা) সপ্রতিভ। তুলনায় নৃত্যাংশ অনেক বেশি স্বচ্ছন্দ। নৃত্য পরিচালক রীণা ঘোষাল কয়েকটি ক্ষেত্রে প্রশংসা পাবেন যদিও সম্মেলক নৃত্য অধিক অনুশীলনের দাবি রাখে। রীণা ঘোষাল 'মা'-র নৃত্যাংশে অনেক ক্ষেত্রেই দৃষ্টিনন্দন। নবনীতা ঘোষাল (প্রকৃতি) যথেষ্ট প্রতিশ্রুতিময়। তপন পাল (দইওয়ালা), সঞ্জিত সামন্ত (চুড়িওয়ালা), যথাযথ কিন্তু সঞ্চয়ন গঙ্গোপাধ্যায় (আনন্দ) বেশ আড়ষ্ট। অনুচরদ্বয়কে নিয়ে হাস্যরসের প্রচেষ্টা কেন ? যন্ত্রানুষংগে ডলি চন্দ, রবীন মজুমদার, হিমাংশু অধিকারী আন্তরিক ছিলেন। প্রসংশা পাবেন ঘনশ্যাম পাইন আবহসংগীত পরিচালনা ক্ষেত্রে যদিও তাঁর নামটি সংগীত পরিচালক রূপেও যুক্ত। শান্তি বিশ্বাসের আলোসম্পাতে কয়েকটি ক্ষেত্রে প্রশংসার দাবি রাখে। পর্দায় শিল্পীদের নাম, রাজবাড়ি ইত্যাদি দেখানো নৃত্যনাট্যে কোনও বিশেষ মাত্রা যোগ করেনি।

সুমিত মজুমদার

ফটো : গৌতম মুখার্জি

সংস্কৃতি : বাইরে দূরে

রামকৃষ্ণ জন্মোৎসব : দুটি অনুষ্ঠান

সম্প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সেবা সংঘের উদ্যোগে রানাঘাট পাল চৌধুরী উচ্চ বিদ্যালয়ে যুগাবতার পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের স্মরণ উৎসব পালিত হয় ভাবগম্ভীর পরিবেশে। দুদিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানে রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের জীবন ও দর্শন নিয়ে আলোচনাচক্রে অংশগ্রহণ করে স্থানীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা। অনুষ্ঠানে রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের বিভিন্ন দিক নিয়ে সুচিন্তিত বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক প্রেমবল্লভ সেন, রুচিরা শ্যাম, ডাঃ সচ্চিদানন্দ ধর। সংগীত সহযোগে কথামৃত পাঠ করেন স্বামী দেব দেবানন্দ মহারাজ। ভক্তি সংগীত পরিবেশন করেন সুগত ঘোষ, অণিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, রত্না নাগ, নিবেদিতা পাত্র, শিবানী বন্দ্যোপাধ্যায়, নমিতা কুন্ডু, অমল ব্যানার্জি প্রমুখ শিল্পীবৃন্দ।

বঙ্কিমনগর রামকৃষ্ণ আশ্রমে রামকৃষ্ণের ১৫৩তম শুভ জন্ম উৎসব সুন্দরভাবে পালিত হয়। রামকৃষ্ণের জীবন সম্পর্কে আলোচনা করেন স্বামী ধ্যানেশানন্দ মহারাজ, নবনীহরণ মুখোপাধ্যায়, বীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী প্রমুখ। ভক্তি সংগীত পরিবেশন করেন অশোক মুখোপাধ্যায় ও অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়। রামকৃষ্ণ গীতি আলেখ্য পরিবেশন করেন ব্যারাকপুর আনন্দতীর্থ সম্প্রদায়। অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন তুষার চট্টোপাধ্যায়। □

প্রীতম দে চৌধুরী



রেখার এখন আদিত্য

নতুন নতুন ছেলে ধরতে রেখার জুড়ি নেই। তবে যে সে ছেলে হলে চলবে না। তাকে হতে হবে 'হ্যান্ডসাম' ও 'ম্যানলি'। আর রেখার থেকে বয়সে সে ছোট হলে তো কথাই নেই। সব মিলিয়ে সোনায় সোহাগা। কিরণকুমার, বিনোদ মেহেরা, সঞ্জয় দত্ত, শাহেনশা বচ্চন কাকে রেখা ওর ঝুলিতে পোরেননি। এবার রেখার নয়া পসন্দ আদিত্য পাঞ্চোলি। আদিত্য জারিনাওহাবের স্বামী। রেখা ও জারিনার থেকে আদিত্য বয়সেও ছোট। ছ' ফুটের ওপর লম্বা হ্যান্ডসাম ছেলে আদিত্য। আদিত্যর সংগে রেখার ঘনিষ্ঠতা বাড়ছে। সব দেখে শুনে বেচারি জারিনা মরমে মরে যাচ্ছেন। একেই জারিনার হাতে তেমন কোন কাজ নেই। তার ওপর আদিত্য হাতছাড়া হলে জারিনার দিন কাটবে কী করে?



নবাগতার পোশাক

নবাগতা নায়িকাদের মধ্যে চলতি বছরের সবচেয়ে আলোচিত নাম যার তার বয়স ষোল ছুঁই ছুঁই। পাঁচ ফুট ছয় ইঞ্চি লম্বা স্কুলে পড়ুয়া মেয়েটি আর কেউ নয় রাজা মুরাদের ভাগনি সুন্দরী সোনম। ফিল্মে শরীর দেখানোর ব্যাপারে প্রথমটা ওর একটু কিন্তু কিন্তু ছিল। রাজা মুরাদের স্ত্রী বিখ্যাত ড্রেস ডিজাইনার শাহিরা-ই অনেক বুঝিয়ে সোনামের মাথা থেকে ওই চিন্তাটা দূর করেছেন। বুদ্ধি দিয়েছেন নাম করতে গেলে পোশাক খুলতে হবে। প্রথম দিকের সাক্ষাৎকারগুলিতে সোনম বলত, স্বল্পবস্ত্রে ফিল্মে অভিনয়ে ওর আপত্তি নেই। তবে রাম তেরী গংগা মইলি'তে মন্দাকিনী যেভাবে শরীর দেখিয়েছে তা ও পারবে না। আর এখন মামী শাহিরার দেওয়া বুদ্ধি ও সাহসে সেই সোনম যেকোনভাবেই শরীর দেখাতে চটজলদি রাজি হয়ে যাচ্ছে। 'আখরী আদালত' ছবিতে জ্যাকির সংগে সোনমের গরমাগরম দৃশ্যগুলি দেখে কিমি, মন্দাকিনী পর্যন্ত চোখ ঢাকছেন। শাহিরার মগজ ধোলাইয়ের কাজটা জব্বর হয়েছে।

কোটে এলার্জি

কিমি কাতকার ওর ফিল্মের নায়কদের কোট পরে অভিনয় করাটাকে তেমন পছন্দ করেন না। এতে নাকি অন্তরংগ মুহূর্তে নায়কের সংগে কিমির জমাটি অভিনয়টাই একেবারে মাটি হয়ে যায়। শুটিং স্পটে কিমি অভিনীত একটা ফিল্মে অনিল কাপুরকে দেখে প্রথমটায় কিমি বেজায় গোঁসা করেছিলেন। ব্যাপারটা কী তা একটু তলিয়ে দেখতেই পরিষ্কার হয়ে গেল পরিচালকের। অনিলের পরনে ছিল কোট। আর সিনটাও যে সে নয়, কিমি-অনিলের এক অন্তরংগ মুহূর্তের শট। যাই হোক পরিচালকের নির্দেশে অনিল কোট খুলে ফেলতেই কিমির মুখে চাঁদপানা হাসি ফুটে উঠল। লোকেশনের খবর, শটটা খুব জমেছিল আর কিমিও চুটিয়ে অভিনয় করেছেন।

সুমন গুপ্ত



শাসক দল কংগ্রেস যদি মনে করে যে আমি এই চেয়ারের (রাজ্যসভার চেয়ারম্যানের পদ) উপযুক্ত নই, তবে তাঁদের জোড় হাতে নমস্কার জানিয়ে বিদায় নেব।
ডঃ শংকরদয়াল শর্মা

শাহেনশা জিতবেই।
গুলাম নবি আজাদ (অমিতাভ বচ্চন সম্পর্কে এ আই সি সি (ই)-র সাধারণ সম্পাদক)

অন্তবর্তী নির্বাচন লড়ার মত তাকত তো ওদের (কংগ্রেস-ই) মধ্যে দেখতেই পাচ্ছি না।
বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং

* *



ভি পি সিং যদি ভেবে থাকেন, নির্বাচকমণ্ডলীর রায় মেনে নেওয়ার মত সাহস প্রধানমন্ত্রীর নেই, তবে তাঁর উচিত হবে প্রথমে অমিতাভ বচ্চনের বিরুদ্ধে ভোটে দাঁড়িয়ে নিজের সাহসটা দেখানো।
সন্ত বক্স সিং (উত্তরপ্রদেশ কংগ্রেস-ই নেতা এবং ভি পি সিংয়ের বড় দাদা)

* *

গোর্বাচেভের সংগে সহজেই লেনিনের তুলনা করা যায়।
রোনাল্ড রেগন (আসন্ন মস্কো বৈঠকে নিরস্ত্রীকরণ চুক্তি স্বাক্ষরের সম্ভাবনা প্রসংগে)

* *

খুব শিগগির ভারত থেকে এই আর্ট (হিন্দুস্থানি ক্ল্যাসিকাল সংগীত) ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যাবে। কারণ, ওখানে মুসলমান শিল্পীদের কোন সম্মানই নেই।
ওস্তাদ রইস খান (পাকিস্তানি নাগরিকত্ব নেওয়ার প্রাক্কালে)



* *

ফিল্মে যেসব অভিনেতারা ব্যর্থ, তারাই রাজনীতির দিকে ছুটছে। আবার ওখান থেকে ধাক্কা খেয়ে ফিল্মে ভিড় বাড়াচ্ছে।
কমল হাসান (চিত্রাভিনেতা)

* *

ওদের (নতুন গায়কদের) গলা ভাল, শুনতেও কিশোর কুমারের মত। কিন্তু ওঁরা কখনই নিজেদের গলাকে অমিতাভ বচ্চন কিংবা দেব আনন্দ কিংবা গোবিন্দের গলা করে তুলতে পারে না, যেটা কিশোর পারতেন।
বাপি লাহিড়ি

* *

আগে কখনও দেশের মাটিতে আমি সফল হইনি, আজ অন্যরকম হয়েছে – দারুণ লাগছে। বিশ্বের প্রথম আটটি দেশের অন্যতম হওয়াটা দারুণ অনুভূতি।
প্রকাশ পাড়ুকোন (টমাস কাপে জেতার পর)

পরিবর্তন

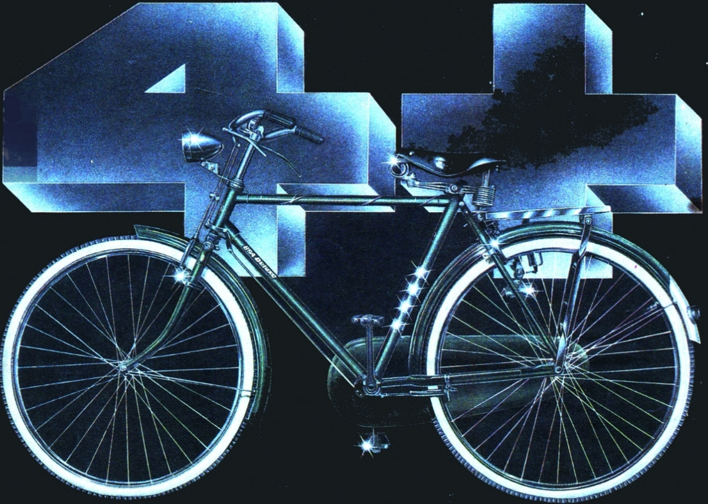
সংযুক্ত সম্পাদক : ঊষা ভৌমিক
শিল্প-উপদেষ্টা : নিতাই ঘোষ
চিফ এগজিকিউটিভ,
বিপণন, বিজ্ঞাপন ও জনসংযোগ:
সি এইচ বসু, কলকাতা
সার্কুলেশন কন্ট্রোলার : প্রসাদ চন্দ্র দত্ত
সম্পাদকীয় দফতর ও রেজি: অফিস :
৩৩ বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিট (পুরাতন প্রিন্সেপ স্ট্রিট), কলকাতা-৭০০ ০৭২, ফোন : ২৭-২১৬৯, ২৭-৯২৯২, ২৭-৯৩১১, ২৬-১৬৮০, ২৬-১৬৮১
Telex 021-5092 IPPL-IN
বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি : (কলকাতা ও পূর্বাঞ্চল)
অ্যাডিমেক্স মিডিয়া মার্কেটিং সার্ভিস
পি ৫৬৪, লেক রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৯
ফোন : ৪৬-১৫৫৮
দিল্লি অফিস :
বিশেষ সংবাদদাতা : প্রসেনজিৎ গাংগুলী
সূর্যকিরণ বিল্ডিংস, ফ্ল্যাট ১২১২, ১৯ কস্তুরবা গান্ধী মার্গ, নিউ দিল্লি-১১০ ০০১, ফোন : ৩৩১-৭০২৪
জোনাল ম্যানেজার, নর্দার্ন জোন :
ওয়াই এ শেঠি, দিল্লি
জনসংযোগ অফিসার :
শ্রীমতী গায়ত্রী রায়, দিল্লি
বোম্বাই বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি : ভি সত্যমূর্তি
বোম্বাই অফিস :
বিশাল বিজনেস সেণ্টার, ওয়ারডেন হাউস, দ্বিতল, স্যার পি এম রোড, ফোর্ট, বোম্বাই-৪০০ ০০১
Gram VIBICENT
Telex 001-5726 AMSL-IN.
ফোন : ২৮-৭২২৯৫, ২৮-৭২৩৩৪, ২৮-৭১৩৫৮
বাংগালোর প্রতিনিধি : সি আর ভরত
১৫৯ এন জি ই এফ কলোনি
রাজামহল বিলাস, এক্সটেনশন II স্টেজ
বাংগালোর-৫৬০ ০২৪
হায়দ্রাবাদ প্রতিনিধি : এস শংকরনারায়ণ
ফ্ল্যাট সি ২, দামোদর কৃপা, ১-১-৫০৮/সি ২, বাকারাম হায়দ্রাবাদ-৫০০ ৩৮০, ফোন : ৬৫-৭০০
মাদ্রাজ প্রতিনিধি : পি এস রামমূর্তি
৩৭ পেরুমল স্ট্রিট, পুরসাওয়াকম্, ফ্লাওয়ার্স রোড পোস্ট মাদ্রাজ-৮৪, ফোন : ৬৬-৪৭২১

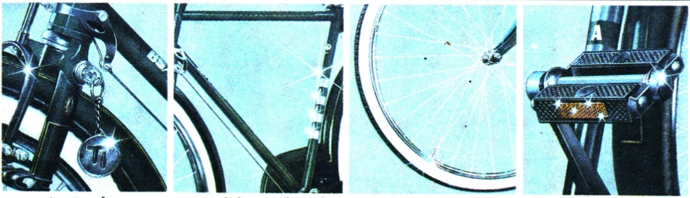
মুদ্রাকর ও প্রকাশক দেবকুমার ব্যানার্জি কর্তৃক ইত্যাদি প্রকাশনী লিমিটেড প্রেস, ৭৭/২/১ লেনিন সরণি, কলকাতা-৭০০ ০১৩ (ফোন : ২৪-০১৯৯) থেকে মুদ্রিত ও ইত্যাদি প্রকাশনী লিমিটেড, ৩৩ বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭২ থেকে প্রকাশিত।

PARIBARTAN 9–15 March
Postal Regn. No.

নতুন বিএসএ ডিলাক্স

অন্য আর কোন্ সাইকেলে পাবেন, এত বিশেষত্ব?





1+ ফর্ক লক—অধিক নিরাপত্তার জন্যে

2+ অ্যাক্রিলিক পেন্ট—বহুদিন ঝকঝকে থাকার জন্যে

3+ সাদা সাইডওয়াল টায়ার—দারুণভাবে আকর্ষণীয়

4+ রিফ্লেক্টর প্যাড্‌ল—রাতে নিরাপদে চলাচলের জন্যে

নিজেই দেখে নিন ঃ

এখন বি.এস.এ ডিলাক্স-এ যে ৪টি অনন্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তা অন্য আর কোনো সাইকেলেই খুঁজে পাবেন না।

১। নতুন ফর্ক লক
সাইকেল লক করার এক একেবারে নতুন উপায়।

২। দেখতে ঝলমলে উজ্জ্বল ক'রে তোলার জন্যে অ্যাক্রিলিক পেন্ট।

৩। তকতকে মসৃণ সাদা সাইড-ওয়াল টায়ার

৪। রাতে নিরাপদে সফর করার জন্যে অনুপম রিফ্লেক্টর প্যাড্‌ল

তার সঙ্গে
- ক্রোমপ্লেটেড স্পোক্‌স
- ব্রুক স্যাড্‌ল
- ডানলপ রিম
- উন্নত এক ব্রেকিং সিস্টেম

নতুন বিএসএ ডিলাক্স
এর চেয়েও কম কি নিতে চাইবেন?

BSA Deluxe